কর্ডেট ভ্রূণবিদ্যা

গাজী এস এম আসমত

কর্ডেট ভ্রূণবিদ্যা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

গাজী এস. এম. আসমত

BANSDOC library
Dhaka

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০১
জুন ১৯৯৪

বাএ ৩০৪২

মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

পাণ্ডুলিপি
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ
জীকৃচি ১৯১

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম

মূল্য
সত্তর টাকা

CHORDATE BHRUNABYDDYA (Chordate Embryology) by Ghazi S. M. Asmat, Published by Gholam Moyenuddin, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First edition : June, 1994, Price : Taka 70·00 only

ISBN 984-07-2969-2

BANSDOC Library

ভূমিকা

আক্ষরিক অর্থে 'ভ্রূণবিদ্যা' বলতে ভ্রূণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভকে বোঝায়। ভ্রূণ থাকে ডিমের আবরণীর মধ্যে কিংবা মায়ের জরায়ুতে। এ অর্থে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে গেলে বা ভূমিষ্ঠ হলেও তা আর ভ্রূণবিদ্যার আওতার মধ্যে পড়ছে না। ভূমিষ্ঠ হওয়া বা ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা প্রাণীর জীবনে একটি গুরুত্ববহ ঘটনা ঠিকই, কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, ডিম ফুটে বের হওয়ার ঠিক আগের আর পরের মুহূর্তের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান নেই, বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের বেলায়। তাই শুধু ডিম বা জরায়ুর মধ্যে অবস্থানকালীন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এ কারণে ব্যালিনস্কি (Balinsky, ১৯৮১)-র ভাষায় ভ্রূণবিদ্যা হচ্ছে প্রাণীর পরিস্ফুটন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ।

পরিস্ফুটন নিয়ে আবার ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, তাই এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। জীববিজ্ঞানে পরিস্ফুটনের দুটি অর্থ আছে। একটি হচ্ছে ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন (Ontogenic development) অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় নিষিক্ত ডিম্বাণু বা মাতৃদেহের কোন অংশ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সৃষ্টি হয়, অন্যটি হচ্ছে জাতিজনিক পরিস্ফুটন (Phylogenetic development) অর্থাৎ প্রজাতির ইতিহাসসমৃদ্ধ পরিস্ফুটন। একে অনেক সময় বিবর্তনিক পরিস্ফুটন (Evolutionary development) বা সরল অর্থে বিবর্তনও বলা হয়। অতএব ভ্রূণবিদ্যাকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে: ভ্রূণবিদ্যা হচ্ছে জীবের ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন সম্বন্ধে অধ্যয়ন।

ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন বর্ণনা করতে গেলে সাধারণত যৌন জননকক্ষ বহু-কোষীদের বিবরণই চলে আসে। অথচ অনেক প্রাণী-প্রজাতি অযৌন জননের ভিতর দিয়ে নতুন বংশধর সৃষ্টি করে। এতে ভ্রূণ জননকোষ মিলনের বদলে মাতৃদেহের দেহকোষে গঠিত হয়। এটি হচ্ছে পরিস্ফুটনের এক বিশেষ ধরন। ব্যালিনস্কি (Balinsky, ১৯৮১) এ দু'ধরনের ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটনকে দুটি ভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। ডিম্বাণু থেকে পরিস্ফুটন হচ্ছে এমব্রায়োজেনেসিস (Embryogenesis) আর অযৌন জননের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটন হচ্ছে ব্লাস্টোজেনেসিস (Blastogenesis)। এই গ্রন্থের প্রায় সবটুকুই এমব্রায়োজেনেসিসের বর্ণনা, তবে পুনরুৎপত্তি অধ্যায়ে অযৌন জননের বিষয়টি সামান্য হলেও বোঝা যাবে।

বইটি প্রণয়নের সময় আমাকে অনেক দেশী বিদেশী বই-পত্র এবং সাময়িকীর সাহায্য নিতে হয়েছে। আমি এইসব বইয়ের রচয়িতাদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। একই সাথে স্বীকার করছি তাঁদের প্রতি আমার অকুণ্ঠ ঋণ। পরিশেষে যাদের জন্য লেখা, বইটি তাদের প্রয়োজনে লাগলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। বইটি প্রকাশ করার জন্য বাংলা একাডেমীকে আমার ধন্যবাদ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

গাজী এস. এম. আসমত

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ বৃদ্ধি ও বিভেদন ১-৯

কোষ প্রজনন ও বিভেদন ২ ; বৃদ্ধি ২ ; কোষীয় ও শারীরিক বৃদ্ধি ৩ ; বিভেদন ৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মরফোজেনেটিক প্রক্রিয়া ১০-১৭

রূপান্তর ১০ ; রূপান্তরের সময় গাঠনিক পরিবর্তন ১১

তৃতীয় অধ্যায় ঃ পুনরুৎপত্তি ১৮-৩৬

পরিণত দেহে গতিশীলতা ১৮ ; পুনরুৎপত্তির বৈশিষ্ট্য ১৯ ; একটি আদর্শ উদাহরণ ১৯ ; পুনরুৎপত্তির প্রকারভেদ ২১ ; বিভিন্ন প্রাণীর পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা ২১ ; পুনরুৎপত্তির নিয়ামক ২৭ ; পুনরুৎপত্তিতে কলাস্থানিক প্রক্রিয়া ৩০ ; পুনরুৎপত্তির শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ৩২ ; পুনরুৎপত্তি ক্ষেত্র ও হেটারোমরফোসিস ৩৪

চতুর্থ অধ্যায় ঃ অ্যাসিডীয়দের পরিস্ফুটন ৩৭-৫৩

প্রজননতন্ত্র ৩৭ ; জননকোষ ৩৮ ; নিষেক ৪০ ; ভাগ্য-মানচিত্র ৪২ ; গ্যাস্ট্রুলেশন ৪২ ; টিউবুলেশন ৪৩ ; লার্ভা জীবন ৪৬ ; ধড় ৪৬ ; লেজ ৪৯ ; সাঁতারু জীবন ৫০ ; রূপান্তর ৫১ ; রূপান্তরকালীন পরিবর্তন ৫১ ট্যাডপোল লার্ভার গুরুত্ব ৫৩

পঞ্চম অধ্যায় ঃ অ্যাম্ফিঅক্সাসের পরিস্ফুটন ৫৫-৭৬

জননাঙ্গ ও জননকোষ ৫৪ ; ডিম্বাণুর পরিপক্কতা বিভাজন ৫৬ ; স্খলন ও নিষেক ৫৫ ; ডিম্বাণুর ভাগ্য-মানচিত্র ৫৮ ; ক্লিভেজ ৫৮ ; ব্লাস্টুলা ৫৯ ; গ্যাস্ট্রুলেশন ৬১ , মুখ্য অঙ্গঅঙ্কুর ৬৪ ; নিউরাল নল সৃষ্টি ৬৫ ; নটোকর্ড সৃষ্টি ৬৬ ; মেসোডার্মীয় খণ্ড বা সিলোমীয় থলি সৃষ্ট ৬৮ ; পৌষ্টিক নালীর সৃষ্টি ৭০ ; লার্ভার গঠন ৭২ ; লার্ভার পরিস্ফুটন ৭৩ ; লার্ভার অপ্রতিসমতা ৭৫ ; রূপান্তর ৭৬ ; পরিস্ফুটনের ক্রণতত্ত্বীয় গুরুত্ব ৭৬

ষষ্ঠ অধ্যায় : ব্যাঙের পরিস্ফুটন ৭৭-৯৯

উওগোনিয়া ৭৭; বৃদ্ধি ৭৭; ডিম্বপাত ৭৯; প্রথম পরিপক্কতা বিভাজন ৭৯; টারসিয়ারী ডিম্বঝিল্লি ৮১; ডিম প্রসব ৮১; নিষেক ৮৩; ক্লিভেজ ৮৭; ব্লাস্টুলা ৮৮; গ্যাস্ট্রুলেশন ৯০; ভ্রূণীয় স্তরের পরিস্ফুটন ৯৬

সপ্তম অধ্যায় : মুরগির পরিস্ফুটন ১০০-১২৬

উওগোনিয়া ১০০; উওগোনিয়ার বৃদ্ধিকাল ১০০; ডিম্বপাত ও মিয়োসিস ১০৪; নিষেক ও মিয়োসিস ১০৪; আবরণ সৃষ্টি ১০৪; ক্লিভেজ ১০৬; ভাগ্য-মানচিত্র ১১১; গ্যাস্ট্রুলেশন ১১২; প্রিমিটিভ স্ট্রিকের উৎপত্তি ১১৫; বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লির প্রকারভেদ ১১৭; বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লির পরিস্ফুটন ১১৮; বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লির কাজ ১২৪

অষ্টম অধ্যায় : খরগোসের পরিস্ফুটন ১২৬-১৩২

নিষেক ১২৭; ক্লিভেজ ১২৭; ব্লাস্টুলেশন ১২৮; গ্যাস্ট্রুলেশন ১২৯; সংস্থাপন ১৩০; অ্যামনিওন ও কোরিওন সৃষ্টি ১৩০; অ্যালানটয়েস সৃষ্টি ১৩১; প্রিমিটিভ স্ট্রিকের পরিস্ফুটন ১৩১

নবম অধ্যায় : অমরা ১৩৩-১৪৭

অমরার বিবর্তন ১৩৩; অমরার অনুপস্থিতি ১৩৪; আদি অমরা ১৩৪; কুসুম থলি অমরা ১৩৫; আদি অ্যালানটয়িক অমরা ১৩৬; অ্যালানটয়িক অমরা ১৩৬; অমরার প্রকারভেদ ১৩৭; অমরার শারীরবৃত্ত ১৪১; অমরার কাজ ১৪২; মানুষের অমরার পরিস্ফুটন ১৪৩

তথ্যপঞ্জি ১৪৮-১৫২

পরিভাষা : ইংরেজী-বাংলা ১৫৩-১৫৬

বাংলা-ইংরেজী ১৫৭-১৬০

প্রথম অধ্যায়

বৃদ্ধি ও বিভেদন

কর্ডেট ভ্রূণবিদ্যা (১ম খণ্ড) গ্রন্থের অঙ্গসৃষ্টি অধ্যায়ে আমরা ভ্রূণের সব বা অধিকাংশ অঙ্গকুঁড়ি সৃষ্টি হতে দেখেছি। প্রাণীর একটি অঙ্গসংস্থানগত রূপরেখা এতে গঠিত হলেও অঙ্গকুঁড়িগুলো এই পর্যায়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে পারে না, ফলে ভ্রূণও একটি স্বাধীন প্রাণীতে পরিণত হতে পারে না। কারণ তখন পর্যন্ত অঙ্গকুঁড়ির কোষগুলোতে সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অভিনব গঠনগুলো থাকে না। আরেকটি কারণ হচ্ছে, অঙ্গকুঁড়ি আসলে খুব ছোট গঠন, তা দিয়ে সমগ্র প্রাণিদেহের কাজ করাও সম্ভব না। তাই পরিস্ফুটনের এই পর্যায় পর্যন্ত অবস্থাকে প্রাক কার্যকর দশা (prefunctional stage) নামে অভিহিত করা যেতে পারে।

এরপরই শুরু হয় প্রাণীর কার্যকর দশা (functional stage)। কার্যকর দশায় যে দুটি প্রধান প্রক্রিয়া জড়িত থাকে তা হচ্ছে বৃদ্ধি (grow) ও বিভেদন বা পৃথকীভবন (segregation)। যেসব প্রাণী লার্ভা দশা পেরিয়ে বড় হয় তাদের দেহে পরেও কিছু নতুন অঙ্গ আবির্ভূত হয় এবং তাতে পুরানো অঙ্গে সামান্য বিন্যাসেরও দরকার হয়, তবে বৃদ্ধি ও বিভেদন প্রক্রিয়া কিন্তু সুস্পষ্টরূপেই ধরা দেয়।

একটি স্থির মাধ্যমে প্রাণিকোষ যথারীতি বড় হয় এবং নিয়ত বিরামে (interval) বিভক্ত হয়। কোষ আবাদ (tissue culture) করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, ১০—৩০ ঘন্টা পরপর কোষ বিভক্ত হয়। তরতাজা কালচার মাধ্যমের (culture media) সরবরাহ থাকলে কোষের বর্ধন ও সংখ্যাবৃদ্ধি অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে থাকে। বিজ্ঞানী ক্যারেল (Carrel) ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ এভাবে ফাইব্রোব্লাস্টের (fibroblast) একটি বংশকে ৩৪ বছর পর্যন্ত জীবিত রাখতে পেরেছিলেন। দেখা গেছে, দুটি মাইটোটিক বিভাজনের মধ্যবর্তী সময়ে কোষগুলো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং গুণগত (qualitatively) ও পরিমাণগতভাবে (quantitatively) মাতৃকোষের সমান হয়। এই প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বসহ ঘটে থাকে :

(১) ক্রোমোজোম মাতৃকোষের অবস্থানুরূপ হয়।

(২) সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসে আমিষের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়, যাতে তা মাতৃকোষের সমান হয়।

(৩) কোষের অন্যান্য উপাদান পুনঃস্থাপিত হয়।

কোষ প্রজনন ও বিভেদন

যৌন পদ্ধতি ও পরিবেশগত উপাদান উদ্ভূত কিছু বাধা ছাড়া এককোষী জীবের জনন মোটামুটি টিস্যু কালচারে বহুকোষী প্রাণী কোষের জননের মতো একইভাবে চলতে থাকে। অর্থাৎ অপত্যকোষ মাতৃকোষের অনুরূপই হয়। কিন্তু সমগ্র প্রাণিদেহে কোষগুলো প্রলম্বিত কোষ-বিভাজন কাল ও বৃদ্ধির সময় একরকম থাকে না বরং প্রারম্ভিক দশা থেকে এবং পরস্পর থেকেও পৃথক হয়। এই ঘটনার আলোকেই সমগ্র ব্যক্তিজনিত পরিস্ফুটনকে বিবেচনা করা উচিত যার শুরু ক্লিভেজ নামক কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, আর তা অব্যাহত থাকে ভ্রূণীয় স্তর ও অঙ্গকুঁড়ি সৃষ্টি পর্যন্ত।

নির্দিষ্ট অঙ্গকুঁড়িতে প্রায়ই প্রারম্ভিক কোষগুচ্ছ একটি অঙ্গ বা ভ্রূণের অংশ সৃষ্টির জন্য জমা থেকে মাইটোটিক বিভাজনের মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়। কিছু সময় পর বিভাজন থেমে যায় এবং অঙ্গকুঁড়ির কোষগুলো বিভেদিত হয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র, অগ্ন্যাশয় ও আরও অনেক অঙ্গকুঁড়ির পরিস্ফুটনের সময় এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অঙ্গকুঁড়ির কোষগুচ্ছের কিছু অংশ মাত্র বিভেদিত হয়, বাকি অবিভেদিত কোষগুলো বৃদ্ধি ও মাইটোসিসের মাধ্যমে তা প্রজননক্ষম থাকে। এভাবে বিভেদন প্রক্রিয়ায় নতুন কোষের সরবরাহ অব্যাহত থাকে। মেরুদণ্ডীর অস্থিতে অস্টিওসাইটগুলো (বিভেদিত কোষ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বিভক্ত হয় না, কিন্তু পেরিঅস্টিয়ামের কোষে বিভক্তি অব্যাহত থাকে এবং অস্থির অতিরিক্ত স্তরের জন্য কোষ সরবরাহ করে।

বৃদ্ধি

প্রোটোপ্লাজম বা অ্যাপোপ্লাজম্যাটিক দ্রব্য (Apoplasmatic substances) সংশ্লেষের ফলে জীবদেহ বা তার অংশগুলি আকারে বড় হলে তাকে বৃদ্ধি (growth) বলে। এই সংজ্ঞায় প্রোটোপ্লাজম বলতে কোষের সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। অ্যাপোপ্লাজম্যাটিক দ্রব্য হচ্ছে কোষগুলো যেসব বস্তু উৎপন্ন করে এবং যা জীবকলার উপাদানের অংশ গঠন করে, যেমন যোজক কলার তন্তু, অস্থি ও উপাস্থির মাতৃকা প্রভৃতি। তাই বলে গ্রন্থির নিঃসরণ বা মেদকলা কোষের সঞ্চিত তেলবিন্দু অ্যাপোপ্লাজম্যাটিক দ্রব্য নয়, কারণ এসব নিঃসরণ বা তেলবিন্দু কোন একসময় দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

অপচিতির চেয়ে উপচিতি বেশি হলেই কেবল জীবের বৃদ্ধি ঘটে। উভয়ের গতি যদি সমান তালে চলে তাহলেও কোন বৃদ্ধি ঘটে না। কোন কোন অবস্থায়

(যেমন—দীর্ঘকালীন খাদ্যাভাবজনিত অবসাদ) উপচিতির চেয়ে অপচিতি বেশি হয়। তখন অপচিতি প্রক্রিয়ায় (জারণ ইত্যাদি) ক্রমাগত জীবদেহে শক্তির সরবরাহ ঘটে। এক পর্যায়ে মেদকলায় সঞ্চিত সবটুকু অন্তঃস্থ খাদ্য ভাণ্ডার শেষ হয়ে যায়, তখন হাত পড়ে প্রোটোপ্লাজমের উপর। জীবের ওজন কমে যায়। এই অবস্থাকে অবৃদ্ধি (Degrowth) বলা যায় (Needham, ১৯৪২)।

কোষীয় ও শারীরিক বৃদ্ধি

বহুকোষী জীবদেহের বৃদ্ধির সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে প্রত্যেকটি একক কোষের বৃদ্ধি। এই কারণে কোষ বৃদ্ধির সংখ্যাগত বৈশিষ্ট্য জানা দরকার। কিন্তু কোষের অতি ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য কলার একেকটি স্বতন্ত্র কোষের বৃদ্ধি মাপা কষ্টকর। তবে টিস্যু কালচারের সময় কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির ছন্দ বেশ সহজেই বের করা যায়।

এককোষী প্রাণীর উপর গবেষণা করে দুটি মাইটোটিক বিভাজনের মধ্যবর্তী সময়ে একটি কোষের বৃদ্ধির পরিমাণ বের করা হয়েছে। ইনফিউজোরীয়দের দৈর্ঘ্য ও ***Actinophrys***-এ দেহের ব্যাস এভাবে মাপা যায়। অন্যদিকে, একেকটি কোষের বর্ধিত ওজন মাপা আরও কষ্টকর। তা সত্ত্বেও, সূক্ষ্ম কৌশল প্রয়োগ করে অ্যামিবার প্রত্যেকটি সদস্যকে জীবনচক্রের প্রতিটি অধ্যায়ে মাপা হয়েছে (Perscott, ১৯৫৭)। এসব পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, একটি বিভাজনের পর এককোষী সদস্যদের দ্রুত বৃদ্ধি এবং পরে তার গতি মন্থর হয়ে যায়। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, বহুকোষী জীবেও এই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বহুকোষী জীবের বৃদ্ধি আসলে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কোষের বৃদ্ধিরই সামগ্রিক ফল। তাই বলে কোষবৃদ্ধি আর শারীরিক বৃদ্ধির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক কোনমতেই সহজ-সরল নয়, বেশ জটিল। পরিবেশ যদি কোষের বৃদ্ধি ও জননের পক্ষে অনুকূল ও স্থির থাকে তাহলে নিয়ত ব্যবধানে কোষ বৃদ্ধি-লাভ করে এবং মাইটোসিসের মাধ্যমে বিভক্ত হয়। একটি বৃদ্ধিচক্র শেষে যদি প্রত্যেকটি কোষ দুটি করে কোষ উৎপন্ন করে তাহলে একটি চক্রের দৈর্ঘ্যের গড় সময়কালে সমগ্র কোষ-সংখ্যা দ্বিগুণ হবে। আসলে তা হয় না, কারণ পরিবেশ সবসময় অনুকূল ও ধ্রুব থাকে না। কোষ বৃদ্ধির সাথে বহুকোষী প্রাণীর বৃদ্ধি নিম্নবর্ণিত তিনটি মৌলিক পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

(১) অক্সেটিক বৃদ্ধি (Auxetic growth) : যখন প্রাণিদেহের আয়তন প্রতিটি স্বতন্ত্র কোষের বৃদ্ধির জন্য বেড়ে যায়, কিন্তু কোষের সংখ্যা বাড়ে না, তাকে অক্সেটিক

বৃদ্ধি বলে (Needham, ১৯৪২)। এই ধরনের বিরল ঘটনা নিমাটোড, রটিফার ও ইউরোকর্ডেট কিছু প্রাণীতে দেখা যায়।

নিমাটোডে অঙ্গসৃষ্টির প্রথম দিকেই কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। তাই ডিম থেকে বের হওয়া একটি তরুণ নিমাটোডে যে কয়টি কোষ থাকে একটি পূর্ণদেহী প্রাণীতেও সে কয়টিই থাকে (Hyman, ১৯৫১)। এই ধরনের পরিস্ফুটনে প্রত্যেকটি অঙ্গকুঁড়িতে কোষের সংখ্যা সুনির্দিষ্টভাবে ধ্রুব থাকে। যেমন, সমগ্র বেচনতন্ত্র মাত্র তিনটি কোষ নিয়ে গঠিত। কোষের সংখ্যা যেহেতু সীমিত থাকে, সে কারণে প্রত্যেকটি কোষের বৃদ্ধি বিরামহীন গতিতে চলতে থাকে, ফলে গাঠনিক কোষের সমানুপাতে দেহেরও বৃদ্ধি ঘটে।

(২) গুণাত্মক বৃদ্ধি (Multiplicative growth) : প্রাণিদেহের বৃদ্ধি যখন গাঠনিক কোষগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল, তখন তাকে গুণাত্মক বৃদ্ধি বলে (Huxley, ১৯৩২)। কোষগুলো মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়, কিন্তু কোষের তেমন বৃদ্ধি ঘটে না। গড় আকার সমান বা প্রায় সমানই থাকে। ভ্রূণের বৃদ্ধি এভাবেই ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়া উচ্চতর মেরুদণ্ডীদের জন্মপূর্বকালীন বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য। যদিও বলা হয়ে থাকে যে, কোষের তেমন বৃদ্ধি ঘটে না, আসলে ভ্রূণের পরিস্ফুটন চলার সময় এবং কলার বিভেদনের সময় কোষগুলো বা অনেক কোষ আকারে বৃদ্ধি পায়। তবে এই বৃদ্ধি এতই নগণ্য যে, তা দেহের সামগ্রিক আকার বৃদ্ধিতে তেমন অবদান রাখে না।

(৩) উপনিবেশীয় বৃদ্ধি (Accretionary growth) : প্রাণীর যে বৃদ্ধিতে বিশেষ কোষগুলোর কমবেশি সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে অর্থাৎ এই কোষগুলো মাইটোটিক কোষ বিভাজন গুণসম্পন্ন। অন্যদিকে অপরাপর কোষগুলো সম্পূর্ণভাবে এই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন সেই বৃদ্ধিকে উপনিবেশীয় বৃদ্ধি বলে (Huxley, ১৯৩২)। পরের কোষগুলো হচ্ছে দেহের বিভেদিত কোষ যারা প্রাণীর জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পাদন করে। অন্যদিকে আগের কোষগুলোকে বলে ভাণ্ডার কোষ। এসব কোষ বিভক্ত হয়ে নতুন নতুন কার্যক্ষম বিভেদিত কোষ সরবরাহ করে। এদের অবিভেদিত কোষও বলা হয়ে থাকে, কারণ এতে তেমন কোন নির্দিষ্ট অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় গুণাবলী থাকে না।

স্থলচর প্রাণীদের এপিডার্মিস এই ধরনের বৃদ্ধির একটি সুন্দর উদাহরণ। ত্বকের বহিঃস্তরীয় কোষগুলো বিভাজিত হয় না; বৃদ্ধি লাভও করে না। ওদের সাইটোপ্লাজম কেরাটিনময় হয়ে ত্বকের উপরতলে রক্ষামূলক স্তর সৃষ্টি করে।

পরে ধীরে ধীরে কর্মহীন হয়ে পড়ে, অবশেষে নির্মোচিত হয়। তখন কেরাটিনবিহীন ম্যালপিজীয় স্তর থেকে নতুন নতুন কোষ সৃষ্টি হয়ে কেরাটিনময় কোষের স্থান দখল করে নেয়। এগুলোও পরে কেরাটিনময় কোষে পরিণত হয়।

অঙ্গের সমানুপাতিক ও অসমান বৃদ্ধি : একটি ভ্রূণে কদাচ একই হারে বিভিন্ন অঙ্গ ও অংশের বৃদ্ধি ঘটে। নিয়মানুযায়ী কোনটি দ্রুত, আবার কোনটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি লাভ করে। ফলে বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাণীর অনুপাতও পরিবর্তিত হয়। মেরুদণ্ডীদের ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও সংবেদী অঙ্গগুলো ধীরগতিতে বৃদ্ধি লাভ করতে দেখা যায়। সমগ্র ভ্রূণীয় ও ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুটনের সময় এসব অঙ্গের আকারও তুলনামূলকভাবে ছোট হতে থাকে। একটি মুরগির ভ্রূণে প্রথম দিকে মাথাটি দেহের বাকি অংশের সমান বড় থাকে। মাথার অনেকাংশ জুড়ে থাকে দুটি বিশালাকার চোখ। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে দেখা যায় তার মাথার আকৃতি দেহের তুলনায় অনেক ছোট, পূর্ণাঙ্গ মোরগে আরও ছোট।

বিভেদন

বিভেদনকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—ব্যাপক বা সাধারণ অর্থে, আর সংকীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে বিভেদন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বোঝায় যাতে একটি জীবের কোষগুলি বা অন্যান্য অঙ্গ পরস্পর ভিন্ন রকম হয়ে যায়, তাদের আগের অবস্থাও পরিবর্তিত হয়। এই প্রসঙ্গে নিউরাল প্লেটের কথা উল্লেখ করা যায়। সমগ্র প্লেটটি আর্কেনটেরনের ছাদ কর্তৃক আবিষ্ট হয়। এর কোষগুলো ভাবী এপিডার্মিস ও ব্লাস্টোডার্মের অংশ থেকে ভিন্নতর হয়ে প্লেটটি গঠন করে।

সংকীর্ণ দৃষ্টিতে বিভেদনকে কলাতাত্ত্বিক বিভেদন (histological differentiation) বলা হয়। কলাতাত্ত্বিক বিভেদন হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার ফলে জীবদেহের অংশগুলো তাদের বিশেষ কাজে-কর্মে সক্ষম হয়ে উঠে। বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে অংশগুলো হচ্ছে কোষ ও কোষসমষ্টি। আর কোষের বিশেষ কাজগুলোর অর্থ কোষের মৌলিক কাজ ছাড়া এমন কোন কাজ সম্পাদন করা যা অন্য কোষ করে না। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে, প্রত্যেকটি কোষই বিপাকীয় কাজ যেমন—শ্বসন, সংশ্লেষণ ইত্যাদি সম্পন্ন করে, অ্যামিবয়েড চলনে কিছুটা সক্ষম ও উত্তেজিত হয় এবং বহিঃউদ্দীপনায় সাড়া দেয়। এসব কাজ বিভেদিত ও অবিভেদিত উভয় ধরনের কোষেই পাওয়া যায়। কিন্তু বিভেদিত কোষ কিছু বিশেষ কাজ সম্পাদনে সক্ষম, বা সেই কাজগুলো

এমনভাবে করে যা অন্যকোষগুলো সেভাবে করে না। যেমন স্নায়ুকোষ অনেক দূর পর্যন্ত অতি দ্রুত স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করে নিয়ে যায় বা যকৃতকোষ অন্যান্য কাজের পাশাপাশি পিত্ত নিঃসৃত করে। এগুলো হচ্ছে স্নায়ুকোষ ও যকৃত কোষের বিশেষ কাজ। ভ্রূণের প্রাথমিক দশায় যে নিউরাল প্লেটটি গঠিত হয় তা ভ্রূণের অন্যান্য অংশের চেয়ে আলাদা ধরনের হওয়ায় একে আমরা একটি বিভেদিত অংশ বলতে পারি। আসলে তখন পর্যন্ত অঙ্গটি কিন্তু কলাতাত্ত্বিকভাবে বিভেদিত হয় না। কারণ এর কোষগুলি তখনও স্নায়ুকোষ হিসেবে কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয়ে উঠে না।

বিভেদিত কোষে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির উপস্থিতির উপর বিশেষ কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা নির্ভরশীল। এই পদ্ধতিগুলো কখনও কোষের অঙ্গাণুরূপে (যেমন পেশী-কোষের পেশীতন্তু; ট্রাকিয়ার এপিথেলীয় কোষের সিলিয়া ইত্যাদি), আবার কখনও বা অন্তঃকোষীয় গঠনের কোষোদ্ভূত পদার্থরূপে [যেমন—যোজক কলার তন্তু; অস্থি ও উপাস্থির মাতৃকা; অমেরুদণ্ডী ত্বকের বহিঃতলে কিউটিকল (Cuticle) ইত্যাদি] আবির্ভূত হয়। কোন নিঃসরণও একটি কোষের বিশেষ কাজ হতে পারে।

কলাতাত্ত্বিকভাবে বিভেদিত কোষের কার্য পদ্ধতি হচ্ছে সাইটোপ্লাজমীয়। আর এসব পদ্ধতি সৃষ্টির জন্য নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের আয়তনের পরিবর্তন ঘটে। বিভেদিত কোষে সাইটোপ্লাজম বেড়ে যায়, কিন্তু নিউক্লিয়াস বেশি বাড়ে না, বাড়লেও সেই অনুপাতে নয়। বৃদ্ধির এই অনুপাত বিভেদন মাত্রার একটি সংখ্যাগত হিসেব দিতে পারে। যদি কোষের অঙ্গসংস্থানিক অংশের পরিবর্তে রাসায়নিক পদার্থকে গণ্য করা হয় তাহলে আরও সঠিক হিসেব করা যায়। এভাবে বিভেদনের সাথে প্রোটিন / ডিএনএ-র পরিবর্তন সরাসরি মাপা যায়।

বিভেদনের রাসায়নিক ভিত্তি (Chemical basis of differentiation) : কোষের বিভেদন যে ধরনেরই হোক না কেন তা কোষের রাসায়নিক গঠন উপাদানের উপরই নির্ভরশীল। কোষের প্রত্যেকটি কাজে জড়িয়ে আছে নির্দিষ্ট উৎসেচক বা উৎসেচকের নির্দিষ্ট সমন্বয়। যে কোষ যতো বেশি রকম পদার্থ সৃষ্টি করে সেই কোষে ততো বেশি ধরনের উৎসেচকীয় বিন্যাস দেখতে পাওয়া যায়। তাই বলা যায়—'বিভেদন হচ্ছে অনন্য উৎসেচকীয় নকশার ফল' (Spiegelman, ১৯৪৮)। অন্যদিকে সব উৎসেচকই হচ্ছে আমিষ। তাই একে ঘুরিয়ে বলা যায় 'বিভেদন হচ্ছে অনন্য প্রোটিন নকশার ফল'। কথাটি সর্বাংশে সত্যি নয়, কারণ উৎসেচকীয় গুণসম্পন্ন প্রোটিন ছাড়াও এতে এমন কিছু আমিষও অংশ নেয় যারা উৎসেচক

নয়। গাঠনিক প্রোটিন এধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন দল যারা কিছু কোষ ও কলার বিভেদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। কিছু গাঠনিক প্রোটিন স্থায়ীভাবে অন্তঃকোষীয়, যেমন—কেরাটিন। এই প্রোটিন স্থলচর মেরুদণ্ডীদের এপিডার্মাল কোষের ভিতরে থাকে। অন্যান্য গাঠনিক প্রোটিন কোষ থেকে উৎপন্নের পর বের হয়ে যায়, আন্তঃকোষীয় ফাঁকে জমা হয়; যেমন—কোলাজেন।

লিপিড ও কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি জৈব পদার্থ একা বা প্রোটিন সহযোগে কোষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এসব পদার্থ এবং প্রোটিনের মধ্যেও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। লিপিড, কার্বোহাইড্রেট ও বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড (যেমন অ্যামাইনো অ্যাসিড)-এর সংশ্লেষও উৎসেচক বা উৎসেচক তন্ত্রের অধীনেই নিয়ন্ত্রিত হয় যারা প্রকৃতপক্ষে প্রোটিন প্রকৃতির। অন্যদিকে কোষের প্রোটিন কিন্তু অপর প্রোটিনের ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় না, বরং নিউক্লিক অ্যাসিডের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে সংশ্লেষিত হয়।

প্রোটিন সংশ্লেষের পরিবর্তন প্রক্রিয়া (Changing pattern of protein synthesis) : অসংখ্য উদাহরণের মাধ্যমে মেরুদণ্ডী ভ্রূণে বিভেদন পদ্ধতির পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেয়া যায়। নিচে মানুষে হিমোগ্লোবিনের উপাদানের সাহায্যে নির্দিষ্ট জিন পরিস্ফুটনের সময় কিভাবে তাদের সক্রিয়তা পরিবর্তন করে তার বর্ণনা দেওয়া হলো।

পূর্ণবয়স্ক মানবদেহে হিমোগ্লোবিন যৌগিক অণুর আকারে বিরাজ করে। এতে মোট চারটি একক পলিপেপটাইড থাকে, দুটি α ধরনের এবং বাকি দুটি β ধরনের। প্রত্যেক ধরনের পলিপেপটাইড একেকটি পৃথক জিনের নির্দেশে উৎপন্ন হয়। মানব ভ্রূণে অন্য ধরনের হিমোগ্লোবিন থাকে। এতেও চারটি পলিপেপটাইড পাওয়া যায় যার মধ্যে দুটি পূর্ণ বয়স্কদের α ধরনের মত কিন্তু বাকি দুটির পলিপেপটাইড অনুক্রম এতই ভিন্ন প্রকৃতির যে, তাদের নামকরণ করা হয়েছে γ-শৃঙ্খল। এই γ-শৃঙ্খল একটি পৃথক জিনের নির্দেশে উৎপন্ন হয়। জন্মের পরপরই শিশুর রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পায় এবং বাকি জীবন এক শতাংশ কম হিমোগ্লোবিন নিয়েই কাটাতে হয়। হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়ার পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ দেহে আবির্ভূত হয় α ও β শৃঙ্খল। এ থেকে সহজেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জন্মের পর γ শৃঙ্খল উৎপন্নকারী জিনের কাজ বন্ধ হয়ে যায়; অন্যদিকে β শৃঙ্খল উৎপন্নকারীর কাজ শুরু হয়। জন্মের আগে ও পরে α শৃঙ্খল উৎপন্নকারী জিন সমান কার্যক্ষম থাকে (Gerald, ১৯৬১)।

জেনোটাইপের সাহায্যে কলার সক্রিয় সামর্থ্য নিয়ন্ত্রণ (**Control of the reactive ability of tissues by the genotype**) : কোষে বিভেদনের প্রাথমিক ধাপ সাইটোপ্লাজম রচিত হলেও চূড়ান্ত ফল জিনের অংশ গ্রহণ ছাড়া হয় না। আবেশনের মাধ্যমে বিভেদনের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আবেশ পদার্থ ততটা সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় এক প্রজাতির প্রাণিকলা অন্য প্রজাতির (এমনকি অন্য বর্গভুক্ত) গাঠনিক আবেশ ঘটাতে সক্ষম। নিচের উদাহরণ থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে।

ইউরোডিল (স্যালামাণ্ডার ও নিউট) লার্ভার আদর্শ দাঁত মজ্জা এবং ডেন্টিন ও এনামেল স্তর নিয়ে গঠিত। দাঁতগুলো থাকে মুখের ভিতর এবং চোয়াল ও তালব্য অস্থিতে যুক্ত। ব্যাঙের ব্যাঙাচির কোন দাঁত নেই। এর পরিবর্তে চোয়ালের কিনারা হর্নি আবরণে মোড়া থাকে এবং মুখের চারদিক ঘিরে অবস্থিত একটি চাকতিতে সারি সারি অতি ক্ষুদ্রাকায় হর্নি দাঁত ও এপিডার্মাল পিড়কা সৃষ্টি হয়। জানা গেছে যে, মৌখিক এক্টোডার্ম থেকে আগত আবেশনের প্রভাবে এক্টোডার্মাল মুখোপাঙ্গ গঠিত হয়। আবেশক শুধু মুখীয় অন্তঃপ্রবেশের স্থান নির্ধারণ করে দেয়, এর নির্দিষ্ট অভিনবত্বগুলোকে নয়। এখন যদি একটি প্রাথমিক ব্যাঙ-ভ্রূণ থেকে এক্টোডার্ম উঠিয়ে নিয়ে স্যালামাণ্ডার-ভ্রূণের মুখীয় অংশে লাগিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তা মুখ সৃষ্টির জন্য আবেশিত হবে। এই মুখ হবে দেখতে ঠিক ব্যাঙের মুখের মত এবং হর্নি চোয়াল, সারি সারি হর্নি দাঁত ও পিড়কাযুক্ত (Spemann and Schotte, ১৯৩২)।

এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, মুখ আবেশকের প্রভাব স্যালামাণ্ডার ও ব্যাঙে একই বা স্যালাণ্ডারের আবেশকের প্রতি সাড়া দিতে ব্যাঙের এক্টোডার্ম অন্তত একইভাবে সমর্থ। পার্থক্য শুধু এক্টোডার্মের সক্ষমতায়। একই উদ্দীপনায় থেকেও ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর এক্টোডার্ম তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সাড়া দিয়েছে। এক্টোডার্মের এই সক্ষমতা বা সক্রিয়তার প্রকৃতি প্রভাবিত হয়েছে ইউরোডিল ও অ্যানুরা-তে মুখ পরিস্ফুটনে পার্থক্যের জন্য দায়ী বংশগতি উপাদানের কারণে। আবেশকের ক্ষমতা সীমিত। তা শুধু বিভেদনকে প্ররোচিত করে। সক্রিয় কোষের বংশগতি গঠন এই বিভেদন সরবরাহ করে। এই গঠন যদি নিউক্লীয় ডিএনএ-র মধ্যে থেকে থাকে তাহলে উপসংহার টানা যায় যে, আবেশন সক্রিয় কোষে জিন ক্রিয়াশীলতায় পরিবর্তন ঘটিয়ে অবশেষে সম্পূর্ণতা অর্জন করে। তবে বংশগতি উপাদানও যে অনেক সময় সক্রিয় কলার সক্ষমতাকে অপরিবর্তিত রেখে আবেশন তন্ত্রকে পরিবর্তিত করতে পারে তার উদাহরণও কম নয়।

পরিস্ফুটনে জিনক্রিয়ার অনুক্রম (Sequence of gene action in development): পরিস্ফুটনের শুরুতে সব জিন অবদমিত অবস্থায় থাকে। ক্লিভেজের সময় থাকে নিষ্ক্রিয়। গ্যাস্ট্রুলেশন শুরু হওয়ার পরে কিছু জিন অবদমিত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে। তখন সেই জিনগুলোর প্রত্যেকটির কাজ সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। স্বাভাবিক পরিস্ফুটন পর্যবেক্ষণের সময় ভ্রূণের দেহে নির্দিষ্ট অর্জিত অংশ কোন জিন বা জিনগুলোর জন্য হয়েছে তা বলা কষ্টকর। তবে একটি বিপরিণত ভ্রূণে এক বা একাধিক জিন স্বাভাবিক অ্যালিল অপেক্ষা ভিন্নতর হয়ে যায় বা ক্রোমোজোমে জিনের বিন্যাসে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জীবের পরিস্ফুটন স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা বিচ্যুত ধরনের হলেই কেবল সে পরিবর্তন আমাদের নজরে পড়ে। একটি বিপরিণত দেহে অঙ্গকুঁড়ি সৃষ্টি বিঘ্নিত হলে আমরা বলে থাকি যে, এই প্রক্রিয়া বিপরিণত জিনের স্বাভাবিক অ্যালিলের নিয়ন্ত্রণে হয়েছে বা এই প্রক্রিয়া ক্রোমোজোমে জিনের স্বাভাবিক বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মরফোজেনেটিক প্রক্রিয়া

প্রাণীর বয়স বাড়ার সাথে সাথে ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটনের গতি মন্থর হয়ে যায়। তখন আর ক্লিভেজ, গ্যাস্ট্রুলেশন বা অঙ্গকুঁড়ি সৃষ্টিকালীন দর্শনীয় পরিবর্তনগুলো ঘটে না। কলাগত বিভেদন শুরু হয়ে গেলে বিভিন্ন কলার সৃষ্টি হয়। এদের অবলম্বন দান এবং আরেকটু বৃদ্ধির জন্য বিভেদন প্রক্রিয়াও প্রলম্বিত হয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বৃদ্ধির গতিও মন্থর হয়ে পড়ে। তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তি-জনির শেষ পর্যায়ে মরফোজেনেটিক প্রক্রিয়াগুলো আবারও আবির্ভূত হয়। সেই বিশেষ ঘটনাগুলো এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

রূপান্তর

অনেক প্রাণীর ভ্রূণ পরিস্ফুটন শেষে লার্ভায় উপনীত হয়। তখন মরফোজেনেটিক প্রক্রিয়ার পুনর্জাগরণ ঘটে। সেই প্রক্রিয়া শেষে লার্ভা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। লার্ভা থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হওয়ার জন্য যে দ্রুত ও সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, তাকে রূপান্তর বলে।

প্রাণিজগতের প্রায় সব গোষ্ঠীতেই লার্ভার আত্মপ্রকাশ ঘটে। পরিণত প্রাণী থেকে আলাদা চিহ্নিত করার জন্য প্রত্যেক লার্ভাকে স্বতন্ত্র নামে ডাকা হয়। নিচে বিভিন্ন প্রাণিগোষ্ঠী এবং তাদের লার্ভার নামের তালিকা দেয়া হলো :

প্রাণিগোষ্ঠী	লার্ভার নাম
১। Porifera	অ্যাম্ফিব্লাস্টুলা
২। Coelenterata	প্ল্যানুলা
৩। Platyhelminthes	
টারবেলারিয়া	ম্যুলার-এর লার্ভা
ট্রিমাটোড	মিরাসিডিয়াম, সারকারিয়া, রেডিয়া, স্পোরোসিস্ট
সিস্টোড	ওনকোস্ফিরা
৪। Nemertinea	পাইলিডিয়াম
৫। Annelida	ট্রোকোফোর

৬। Mollusca	ট্রোকোফোর ও ভেলিগার
৭। Crustacea	
Entomostraca	নপলিয়াস
Malacostraca	জুইয়া
৮। Insecta	নিমফ, ক্যাটারপিলার, গ্রাব প্রভৃতি
৯। Bryozoa ectoprocta	সাইফোনাটিস লার্ভা
১০। Echinodermata	বাইপিনারিয়া, প্লিউটাস, অরিকুলারিয়া প্রভৃতি
১১। Enteropneusta	টরনারিয়া
১২। Ascidiacea	ট্যাডপোল লার্ভা
১৩। Cyclostomata	অ্যামোসিট
১৪। Amphibia	ব্যাঙাচি (ট্যাডপোল)।

উপরোল্লিখিত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মরফোজেনেটিক প্রক্রিয়া পরিবর্তনের প্রকৃতিগত এবং কার্যকারণ সম্বন্ধীয় উভয় দিক থেকেই ভিন্ন। সাধারণ আলোচনায় সবগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা অসম্ভব। তাই ব্যাঙের রূপান্তরকে একটি উদাহরণ হিসেবে বর্ণনা করা হলো।

রূপান্তরের সময় গাঠনিক পরিবর্তন

জলচর জীবন থেকে স্থলচরে উন্নীত হওয়ার জন্য উভচরে রূপান্তর ঘটে। ব্যাঙের ক্ষেত্রে পরিবেশ পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন। অধিকাংশ ব্যাঙের ব্যাঙাচি জীবিত বা মৃত উদ্ভিজ্জ পদার্থ মুখের চারদিকে অবস্থিত হর্নি দাঁত দিয়ে চেঁছে খায়। কেউ বা ক্ষয়িত বস্তু খাদক। ওরা বসতির তলদেশ থেকে কাদামাটি গিলে ফেলে। কাদামাটি থেকে অন্ত্র প্রয়োজনীয় খাদ্য রেখে দেয়। ***Xenopus***-এর ব্যাঙাচি প্ল্যাঙ্কটন খায়। পরিণত ব্যাঙ মাংসাশী প্রাণী। পোকা, কীট এসব এবং কখনো বা ছোট ছোট ব্যাঙ, এমনকি পাখি ও ইঁদুর পর্যন্ত খেয়ে ফেলে।

রূপান্তরের সময় প্রাণিদেহে যেসব পরিবর্তন ঘটে তার অংশবিশেষ অগ্রগামী (Progressive) এবং কিছু পশ্চাদগামী (Regressive)। এসব পরিবর্তনকে নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) লার্ভাজীবনে প্রয়োজনীয় অঙ্গ বা গঠন পরিণত দেহে সংক্ষিপ্ত আকারে থাকতে পারে বা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

(২) কিছু অঙ্গ শুধু রূপান্তরের সময় কিংবা পরে পরিস্ফুটিত ও কার্যক্ষম হয়ে উঠে।

(৩) কয়েকটি অঙ্গ যা রূপান্তরের আগে ও পরে উপস্থিত থাকে এবং পরিণত জীবনের চাহিদামাফিক পরিবর্তিত হয়।

অ্যানুরা জাতীয় উভচরে (অর্থাৎ ব্যাঙে) লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের জীবন পদ্ধতি সুস্পষ্ট আলাদা। সেই কারণে রূপান্তরকালীন পরিবর্তনও ব্যাপক। রূপান্তর ঘটেও বেশ দ্রুত, মাত্র কয়েকদিনেই তা সম্পন্ন হয়।

ব্যাঙে রূপান্তরকালীন পশ্চাদ্গামী প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ—

(১) পাখনা-ভাঁজসহ সম্পূর্ণ লম্বা লেজই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

(২) ফুলকাগুলো বিশোষিত হয়, ফুলকা ছিদ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং পেরি-ব্রাংকিয়াল গহ্বর অদৃশ্য হয়।

(৩) মুখের চারদিক ঘিরে থাকা চাকতি থেকে হর্নি দাঁত এবং চোয়ালের হর্নি কিনারা খসে পড়ে।

(৪) অবসারণী নল ছোট ও খাটো হয়।

(৫) অ্যাওর্টিক আর্চের অংশসহ কিছু রক্তবাহিকা সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করে।

ব্যাঙে রূপান্তরকালীন অগ্রগামী বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ—

(১) হাত-পা সৃষ্টি হয়, তা আকারে বড় হয় এবং বিভেদিত হয়। কানকুয়া ঝিল্লীর নিচে পরিস্ফুটিত অগ্রপদ বাইরে বেরিয়ে আসে।

(২) প্রথম গলবিলীয় থলের সাথে সংযোগ রেখে মধ্যকর্ণ পরিস্ফুটিত হয়। বৃত্তাকার কর্ণ উপাস্থিতে অবলম্বিত হয়ে কর্ণপটহ সৃষ্টি হয়।

(৩) মাথার পৃষ্ঠদেশে চোখ দুটি উদ্গত হয় এবং চোখের পাতার সৃষ্টি হয়।

(৪) মুখের মেঝে থেকে জিহ্বার উৎপত্তি হয়।

ব্যাঙের রূপান্তরের আগে (লার্ভায়) ও পরে (পূর্ণাঙ্গ দেহে) যেসব অঙ্গ কার্যক্ষম থাকে কিন্তু রূপান্তরের সময় ভবিষ্যৎ চাহিদার অনুকূলে গাড়া দিয়ে বিভেদিত হয় তার মধ্যে ত্বক ও অন্ত্রই প্রধান। ব্যাঙাচির ত্বক স্তিস্তরী এপিডার্মিসে আবৃত থাকে। রূপান্তরের সময় এপিডার্মিসে কোষস্তরের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং বহির্ভাগের স্তরটি কেরাটিনময় হয়ে উঠে। বহুকোষীয় শ্লেষ্মা গ্রন্থি ও সিরাস গ্রন্থি ত্বকের বহির্ভাগ থেকে পকেটের মত সৃষ্টি হয়ে নিচে অধঃত্বকীয় যোজক কলায় নিমজ্জিত হয়। ব্যাঙাচি-দেহের পার্শ্বীয় রেখাতন্ত্র অধিকাংশ ব্যাঙে অদৃশ্য হয়। ত্বকের রঞ্জনেরও পরিবর্তন ঘটে, নতুন বিন্যাস ও বর্ণের সৃষ্টি হয়। ব্যাঙাচির

অনেক লম্বা অন্ত্রটি (যেমনটি পাওয়া যায় অনেক শাকাশী প্রাণীতে) খুব ছোট হয়ে যায়। অন্ত্রের অধিকাংশ প্যাঁচই খুলে সোজা হয়ে যায়।

রূপান্তরের সময় অঙ্গসংস্থানিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কিছু শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তনও সংঘটিত হয়। এসময় অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা কাজের সূত্রপাত ঘটে যা গ্লাইকোজেনের ভাঙনে যকৃতের বর্ধিত ভূমিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত। রেচন পদ্ধতিতেও বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ব্যাঙাচিতে নাইট্রোজেন বিপাকের বর্জ্য হচ্ছে অ্যামোনিয়া যা খুব সহজেই ব্যাপন প্রক্রিয়ায় জলীয় মাধ্যমে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু স্থলচর প্রাণীতে তা সঞ্চিত হয়ে দেহে মারাত্মক বিষময়তার কারণ হতে পারে। রূপান্তরিত ব্যাঙ তাদের অধিকাংশ নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য ইউরিয়ারূপে ত্যাগ করে, অত্যন্ত কম পরিমাণে নিষ্ক্রান্ত হয় অ্যামোনিয়া। এই পরিবর্তন ঘটে রূপান্তরের শেষের দিকে। তখন যকৃতও কাজের ধারা সামান্য পরিবর্তন করে ইউরিয়া সংশ্লেষে তৎপর হয়।

ব্যাঙাচির বহির্ফুলকা ও লেজের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে যোগ অঙ্গের গাঠনিক কলার স্ববিধ্বংসী কার্যক্রমের ফলে। একে অটোলাইসিস (autolysis) বলে। অ্যামিবয়েড কোষগুলো বিধ্বস্ত কলার অংশগুলো ধরে আত্মস্থ করে ফেলে।

একদিকে পশ্চাদগামী প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, অপরদিকে, পরিবর্তনের ক্রান্তিলগ্নে খাদ্যগ্রহণ বিষয়ক জটিলতায় বাধাগ্রস্ত হওয়ায় দেহের ভর রূপান্তরের শুরুতে যা থাকে তার চেয়ে কমে যায়। একে অবৃদ্ধি (degrowth) বলা যেতে পারে। দেহের ভর শুধু অংশ হারানোর জন্যই কমে না, বরং সক্রিয় বৃদ্ধিশীল অঙ্গ ছাড়া বাকি অঙ্গগুলো হ্রস্বীভূত হওয়ার ফলেও ঘটে থাকে। তাই দেখা যায়, রূপান্তরের পূর্বমুহূর্তে লার্ভার মাথা ও দেহকাণ্ড যত বড় থাকে, রূপান্তরিত ব্যাঙে তা বেশ ছোট।

রূপান্তরের কার্যকরণঃ রূপান্তরকালে একই সময়ে প্রাণিদেহের নানা অংশে পরিবর্তন দেখে ধারণা করা যায় যে, সকল পরিবর্তনের জন্য নিশ্চয়ই কিছু অভিন্ন কারণ রয়েছে। পরে দেখা গেলো, লার্ভা যখন রূপান্তর দশায় উপনীত হয় তখন থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত বিপুল পরিমাণ হরমোনই হচ্ছে সেই অভিন্ন কারণ। এই উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের কৃতিত্ব বিজ্ঞানী গুডের্নটেস (Guderntesch, ১৯১২) এর। তিনি ভেড়ার থাইরয়েড গ্রন্থি শুকিয়ে গুঁড়ো করে ব্যাঙাচিদের খেতে দিয়ে লক্ষ্য করেন যে, সেগুলো সময়ের আগেই রূপান্তরিত হয়ে যায়। অন্যান্য গ্রন্থির গুঁড়ো খেয়ে তা হয় না।

দু'টি পরীক্ষা থেকে ব্যাঙের রূপান্তরে থাইরয়েড হরমোনের ভূমিকা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। একটি পরীক্ষায় লেজ-কুঁড়ি দশার ব্যাঙের ভ্রূণ থেকে থাইরয়েড গ্রন্থিকুঁড়িটি সরিয়ে নিলে দেখা যাবে যে, ব্যাঙাচি বেঁচে থাকতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধিশীল, কিন্তু রূপান্তরে ব্যর্থ হয়েছে (Allen, ১৯১৮)। এদের প্রায় বছরখানেক বাঁচিয়েও রাখা যায়।

আরেকটি পরীক্ষা চালানো হয়েছে থাইরয়েড গ্রন্থিবিহীন ব্যাঙাচিদের থাইরয়েড গ্রন্থির গুঁড়ো খাইয়ে বা থাইরয়েড গ্রন্থির নির্যাস মিশ্রিত দ্রবণে ব্যাঙাচিদের রেখে দিয়ে। দেখা গেছে, এই অবস্থায় ব্যাঙাচির দেহে দ্রুত রূপান্তর শুরু হয়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয়, অন্য কোন উপায়ে থাইরয়েড হরমোন পেলে ব্যাঙাচির নিজের থাইরয়েড গ্রন্থি না হলেও চলে। অর্থাৎ যে কোন উপায়ে হোক এদের থাইরয়েড হরমোন প্রয়োজন।

টাটকা থাইরয়েড কলা থেকে যে নির্যাস বের হয় তাতে থাইরোগ্লোবিউলিন নামে একধরনের প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিন আয়োডিনও ধারণ করে যা থাইরয়েড হরমোনের কাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই উচ্চ আণবিক ওজনধারী (প্রায় ৬৭৫,০০০ একক) থাইরোগ্লোবিউলিন ভেঙে ক্ষুদ্রকগুলো নিম্ন আণবিক ওজনের আয়োডিনধারী যৌগ সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন ও থাইরক্সিন প্রধান। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিনই বেশি উৎপন্ন হয় এবং তা প্রধান সক্রিয় পদার্থ হিসেবে বিবেচিত। অন্যদিকে ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন কলায় বেশি সক্রিয়।

এমনও পরীক্ষা করা হয়েছে যে, আয়োডিন একাই ব্যাঙাচির রূপান্তরের কারণ হতে পারে কি না। দেখা গেছে, পানিতে আয়োডিনের ০.০০০০০১৮৩৩ শতাংশ দ্রবণে বা দেহে আয়োডিন প্রবেশ করালে কিংবা দেহগহ্বরে আয়োডিন কেলাস স্থাপন করলেও রূপান্তর ঘটে। তবে আয়োডিনের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে তাদের সাথে বন্ধনকৃত অ্যামাইনো অ্যাসিডের ধরনের উপর।

উভচরের রূপান্তর কার্যকারিতার সাথে শুধু থাইরয়েড গ্রন্থিই জড়িত নয়, এতে হাইপোফাইসিসও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাঙাচির হাইপোফাইসিস নষ্ট হয়ে গেলে (Adler, ১৯১৪) বা হাইপোফাইসিস কুঁড়িটি যদি সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে আর রূপান্তর ঘটে না। পরে অবশ্য কোন রূপান্তরিত বা পূর্ণবয়স্ক ব্যাঙের হাইপোফাইসিসের কিছু অংশ ব্যাঙাচিতে পুনঃস্থাপন করলে রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হয়, তবে সেক্ষেত্রে থাইরয়েড গ্রন্থিটি অক্ষত থাকতেই হবে।

এই পরীক্ষা থেকে মন্তব্য করা যায় যে, হাইপোফাইসিস কলার উপর সরাসরি কোন কাজ করে না, বরং থাইরয়েড গ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত করে কাজ সমাধা করে।

হাইপোফাইসিসের সম্মুখ খণ্ড থেকে থাইরোট্রপিক হরমোন নিঃসৃত হয়। এই হরমোন থাইরয়েড গ্রন্থিকে সক্রিয় করে তুলে। উভচরীয় লার্ভায় যতক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক রূপান্তর না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত হাইপোফাইসিস থাইরোট্রপিক হরমোন নিঃসৃত করে না।

এসব পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাইপোফাইসিসের সম্মুখ খণ্ড যখন নির্দিষ্ট মাত্রায় বিভেদিত হয় এবং থাইরোট্রপিক হরমোন উৎপাদনে সক্ষম হয়, তখন রূপান্তরের প্রারম্ভিক সংকেত ধ্বনিত হয়। থাইরোট্রপিক হরমোন থাইরয়েড গ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত করে, ফলে থাইরয়েড হরমোন নিঃসৃত হয়। থাইরয়েড হরমোন (যার মধ্যে থাইরক্সিন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ) কলায় সরাসরি কাজ করে। এর ফলে কিছু কোষের আপজাত্য ও বিনষ্টি ঘটায় এবং অন্যদের বৃদ্ধি ও বিভেদনে উদ্দীপ্ত করে।

রূপান্তরে কলার প্রতিক্রিয়া ঃ দেহের বিভিন্ন কলায় একই সময়ে একই পরিমাণ থাইরয়েড হরমোন থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে কলাগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। লেজ, ফুলকা প্রভৃতির ধ্বংস সাধনে রত হয়, অন্যদিকে হাত-পা প্রভৃতি বৃদ্ধি ও বিভেদনে মত্ত হয়ে পড়ে। এর কারণ কিন্তু দেহাংশগুলোর অবস্থানগত বা সক্রিয় পদার্থের বিষম বিস্তার নয়, বরং এই প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে প্রতিক্রিয়াশীল অংশের প্রকৃতির উপর, একটি ব্যাঙাচির লেজের কিছু অংশ অন্য একটি ব্যাঙাচির দেহকাণ্ডে স্থাপন করে দেখা গেছে রূপান্তরের সময় আসল লেজটির সাথে সাথে দেহকাণ্ডে স্থাপিত অংশটিও বিশোষিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি একটি ব্যাঙাচির একটি চোখ অন্য ব্যাঙাচির লেজে স্থাপন করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, লেজটি যখন রূপান্তরের সময় বিশোষিত হতে থাকে তখন চোখটি সুস্থ ও সবল থাকে। বিশোষণের ফলে লেজটি যতই সংকুচিত হতে থাকে চোখটিও ততই দেহকাণ্ডের কাছে চলে আসে। এক পর্যায়ে লেজ অদৃশ্য হয়ে গেলে চোখটি রূপান্তরিত ব্যাঙের নিতম্ব অঞ্চলে একীভূত হয়ে যায় (Schwind, ১৯৩৩)। এই পরীক্ষা দুটি থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, থাইরয়েড নিঃসরণ রক্তসংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে বাহিত হয় এবং এই নিঃসরণ একধরনের হরমোন। কোন কলায় এই হরমোনের প্রভাব কি হবে তা নির্ধারণ করে সে কলার বিক্রিয়াশীল গুণাগুণ। একে সক্ষমতা বলা যায়। থাইরয়েড হরমোনের প্রতি বিক্রিয়া ও কলার সক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে তাদের কলাগত বিভেদনের উপর নির্ভর করে। ব্যাঙাচিতে লেজের পেশী বিভেদনের সময়ই বিশোষিত হয়, অন্যদিকে দেহকাণ্ডের

পেশী প্রভাবিত হয় না। শুধু তাই না, দেহের বিভিন্ন অংশ অগ্রগামী বা পশ্চাদগামী যে কোন ধরনের পরিবর্তনেই অংশগ্রহণ করুক না কেন হরমোনের পরিমাণের উপর সমানভাবে সাড়া দেয় না। উপরন্তু একই অঙ্গের সব অংশও একসাথে সাড়া দেয় না, যেমন লেজের শীর্ষদেশ গোড়ার চেয়ে বেশি তাড়াতাড়ি সাড়া দেয়।

একবারে প্রচুর পরিমাণ থাইরয়েড হরমোন সরবরাহ করলে রূপান্তরের সব প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হয়ে যায়। এতে ঘটনাক্রম ওলট-পালট হয়ে যায়। তখন অগ্রগামী প্রক্রিয়ার চেয়ে পশ্চাদগামী প্রক্রিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে। ফলে অগ্রপদ পূর্ণ বিভেদিত হওয়ার আগেই বেরিয়ে আসে। পা শক্তিশালী হওয়ার আগেই লেজ অদৃশ্য হয়ে যায়। দুর্বল পা ব্যাঙাচির চলনের দায়িত্ব নিতে তখনও সক্ষম না হওয়ায় ব্যাঙাচির মৃত্যু ঘটে।

রূপান্তরকালে আবেশন প্রক্রিয়া ঃ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, থাইরয়েড হরমোন রক্তবাহিকায় বাহিত হয়ে দেহের সব কলায় গিয়ে পৌঁছায়। রূপান্তরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সরাসরি থাইরয়েড হরমোনের প্রতিক্রিয়া। এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমও পরিলক্ষিত হয়। যেমন, স্বাভাবিক রূপান্তরের সময় লেজের ত্বকও বিশোষিত হয়, কিন্তু এই ত্বককে যদি তার নিচের পেশী ছাড়িয়ে দেহে স্থাপন করা হয় তাহলে তা সুস্থ থাকে। ত্বক যদি পেশীসহ হয় তাহলে দেহের যে কোন স্থানে লাগালেও বিশোষিত হয়ে যাবে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, থাইরয়েড হরমোনের প্রত্যক্ষ ক্রিয়া হচ্ছে পেশী কলার উপর, ত্বক গৌণভাবে বিশেষণ প্রক্রিয়ায় জড়িত হয়। এর চেয়েও জটিল প্রক্রিয়া হচ্ছে কর্ণপটহের পরিস্ফুটন।

যেসব অঙ্গ রূপান্তরে অগ্রগামী বা প্রগতিশীল অঙ্গরূপে পরিস্ফুটিত হয় মধ্যকর্ণ তাদের অন্যতম। মধ্যকর্ণ তার গহ্বরসহ ইউস্টেশীয় নালীর সাহায্যে গলবিলের সাথে যুক্ত থাকে। রূপান্তরের শেষদিকে কর্ণপটহ সর্বপ্রথম বিভেদিত হয়। ব্যাঙে তা কোয়াড্রেট উপাস্থির পশ্চাৎ কিনারা থেকে বহির্বৃদ্ধিরূপে সৃষ্ট টিমপ্যানিক উপাস্থি বলয়ে অবলম্বিত। যে পর্দাটি কর্ণপটহরূপে বিভেদিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে দেহ আবৃতকারী ত্বকের অনুরূপই, কোন পার্থক্য নেই। রূপান্তরের সময় কর্ণপটহ অঞ্চলের ত্বকের যোজককলা স্তর পুনঃসংগঠিত হয়। আদি তন্তুস্তর স্ট্র্যাটাম কমপ্যাকটাম ভেঙে যায়। সে জায়গায় নতুন একটি পাতলা তন্তুময় স্তরের সৃষ্টি হয়। পূর্ণ বিভেদিত কর্ণপটহ সাধারণ ত্বকের চেয়ে পুরুত্বের দিক থেকে প্রায় অর্ধেক, কিন্তু সুদৃঢ় এবং তার বর্ণময়তাও ভিন্ন।

দেখা গেছে যে, কর্ণপটহের বিভেদন থাইরয়েড হরমোনের প্রত্যক্ষ ক্রিয়ায় ঘটে না, বরং টিমপ্যানিক উপাস্থি দ্বারা আবেশিত হয় (Helff, ১৯২৮)। রূপান্তরের আগে ঐ উপাস্থি সরিয়ে নিলে কর্ণপটহ পরিস্ফুটিত হয় না। ওটিক (otic) অঞ্চল যদি

পাশের বা পিঠের ত্বক দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় তাহলে সেই ত্বক একটি কর্ণপটহ সৃষ্টি করে। আবার যদি টিমপ্যানিক উপাস্থিকে পাশের বা পিঠের ত্বকের নিচে প্রবেশ করিয়ে দেয়া যায় তাহলে সে জায়গায় ত্বক কর্ণপটহে বিভেদিত হয়।

কর্ণপটহ বিভেদিত হওয়ার আগে যে জটিল আন্তঃক্রিয়ার একটি শৃঙ্খল রচিত হয় তার শুরুতে থাকে হাইপোফাইসিস কুঁড়ির সৃষ্টি। এই কুঁড়ি স্টোমোডীয় অন্তর্প্রবেশের সাথে একত্রে সৃষ্টি হয় এবং সম্ভবত মৌখিক এণ্ডোডার্ম দ্বারা আবেশিত হয়। হাইপোফাইসিস যথাসময়ে থাইরোট্রপিক হরমোন নিঃসৃত করে যা থাইরয়েড গ্রন্থিকে উদ্দীপ্ত করে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরয়েড হরমোন নিঃসৃত হয়ে কোয়াড্রেটের পশ্চাৎ কিনারাকে টিমপ্যানিক উপাস্থিতে বিভেদিত হওয়ায় ভূমিকা পালন করে। সবশেষে টিমপ্যানিক উপাস্থি ত্বককে কর্ণপটহে বিভেদিত হওয়ার জন্য আবেশিত করে।

তৃতীয় অধ্যায়

পুনরুৎপত্তি

পুনরুৎপত্তি (Regeneration) হচ্ছে প্রাণীর ব্যক্তিজনিক চক্রের প্রাপ্তসর দশায় সংঘটিত এক উল্লেখযোগ্য মরফোজেনেটিক প্রক্রিয়া। স্বাভাবিক পরিবেশে দুর্ঘটনাবশতই হোক বা গবেষকের ছুরি-কাঁচির কারণেই হোক প্রাণিদেহ সেই ব্যাপক ক্ষতির মোকাবেলা করতে সক্ষম। হারানো অংশ পুনর্নির্মাণে সে সক্ষম। এই পুনর্নির্মাণের আওতায় প্রাণিদেহ ক্ষত ভরাট করে এক বা একাধিক অঙ্গ, কিংবা দেহের এক বিরাট অংশ পর্যন্ত বিনির্মাণে সমর্থ। দেহের হারানো অংশের নবায়ন ও পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াকে পুনরুৎপত্তি বলে।

পরিণত দেহে গতিশীলতা

পরিণত প্রাণিদেহকে আপাতদৃষ্টিতে স্থিতিশীল মনে হলেও আসলে তা নয়। দেহে অনেক সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবর্তন ঘটে চলেছে। জটিল রাসায়নিক যৌগ প্রতিনিয়ত ভাঙছে, তৈরি হচ্ছে; অনেক কোষ নষ্ট হচ্ছে, নতুন কোষগুলো সেই স্থান দখল করছে; এবং অনেক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক কোষের ক্ষয় পূরণও হয়ে থাকে। এইসব বৃদ্ধির মাত্রা সবসময় বোঝাও যায় না। যেমন পূর্ণবয়স্ক মানবদেহে যে কোন এক সময়ে ২৫×১০^{১২} টি লোহিত রক্তকণিকা সক্রিয় পরিবহনে থাকে। এর প্রায় এক শতাংশ কোষ প্রতিদিনই প্রতিস্থাপিত হয়। সব লোহিত রক্তকণিকা প্রতি চার মাসে বদল হয়। আর অন্যান্য কোষও প্রতিস্থাপিত হয়। যেমন মানুষের একবারের বীর্যস্খলনে প্রায় ৩ সি. সি. বীর্যরস স্খলিত হয়। তাতে প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন (৩·৫ কোটি) শুক্রাণু থাকে। স্পার্মাটোগোনিয়ার বিভাজনের ফলে সেই ঘাটতি পূরণ হয়। ত্বককোষ, পৌষ্টিক নালীর আবরণী কোষ এবং জরায়ু গাত্রের আবরণী কোষও স্বাভাবিক, সুস্থ মানবদেহের জন্য প্রতিস্থাপিত হয়। এক কথায় বলা যায় যে, পূর্ণবয়স্ক দেহে প্রতিদিন অসংখ্য কোষ বিনষ্ট হয়, আবার উৎপাদিতও হয় এবং এভাবে কোষীয় মাত্রা একটি গতিশীল স্থিতাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। জীবিত প্রাণীর কার্যিক সক্রিয়তার এই অঙ্গসংস্থানিক বহিঃপ্রকাশকে শারীরবৃত্তীয় পুনরুৎপত্তি (physiological regeneration) বলা যেতে পারে।

গতিশীল স্থিতিশীলতা সত্ত্বেও পূর্ণবয়স্ক প্রাণিদেহে ব্যাপক উন্নয়নমূলক প্রক্রিয়া সংঘটিত হতে দেখা যায়। অনেক প্রাণী পরিণত দেহে আদি ভ্রূণের পরিবর্তনশীল গঠনের অনেক কিছু ধারণ করে রাখে এবং তখন একটিমাত্র দেহ থেকে দুই বা ততোধিক পূর্ণাঙ্গদেহী প্রাণী সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। যেমন দ্বিখণ্ডিত প্ল্যানারিয়ার দেহের প্রত্যেকটি অংশ থেকে একেকটি পূর্ণ প্ল্যানারিয়ার জন্ম হয়। অন্যান্য প্রাণী তার হারানো দেহাংশ পুনর্গঠনে সক্ষম, ঠিক ভ্রূণের মত। দেহের হারানো অংশ প্রতিস্থাপনকেই সাধারণত পুনরুৎপত্তি বলা হয়ে থাকে, তবে সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এই প্রক্রিয়াকে **ক্ষতিপূরণীয় পুনরুৎপত্তি** (Reparative regeneration) বলাই যুক্তিসঙ্গত হবে।

পুনরুৎপত্তির বৈশিষ্ট্য

মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী উভয় ক্ষেত্রেই পুনরুৎপত্তি এমন কতকগুলো প্রক্রিয়া ও ঘটনাবলী নিয়ে সংঘটিত হয় যা ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও ঘটনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দেখা যায়, পুনরুৎপত্তির জন্য একটি উদ্দীপনা থাকে, এতে কোষের অভিবাসন ও মরফোজেনেটিক চলন ঘটে, আরও ঘটে কলার আন্তঃক্রিয়া ও কোষ সংখ্যার সক্রিয়তা, বৃদ্ধি ও বিভেদন। তবে গোষ্ঠীবিশেষে এর কিছু হেরফেরও হতে পারে। তা সত্ত্বেও ভ্রূণীয় পরিস্ফুটন ও পুনরুৎপত্তির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় পূর্ণাঙ্গ দেহে যেখানে থাকে পরিণত কলা, হরমোন ও আরও অন্যান্য কিছু। তাই আমরা ভ্রূণীয় প্রক্রিয়াগুলোর সাথে পুনরুৎপত্তিকে এক করে ফেলতে পারি না।

BANSDOC Library

একটি আদর্শ উদাহরণ

পুনরুৎপত্তির উদাহরণ হিসেবে নিউট ও স্যালামাণ্ডারের লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ উভয় দশাতেই হাত-পা'এর নবায়নের ঘটনা উপস্থাপন অতি প্রচলিত। লার্ভার হাত-পা প্রায়ই ওদের সঙ্গীদের অত্যাচারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গবেষকবৃন্দও হাত-পায়ের বিভিন্ন স্থান কেটে ফেলে দিয়ে পুনরুৎপত্তির পরীক্ষা চালিয়ে থাকেন। যেকোন কারণেই হোক না কেন একটি হাত বা পা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলো শেষে আবার তা আত্মপ্রকাশ করে।

(১) প্রথমেই ক্ষতের চতুর্কিনারা ঘিরে অবস্থিত এপিডার্মিস ক্ষতের উপর বিস্তৃত হয়ে তা ঢেকে ফেলে। ক্ষত বন্ধের প্রক্রিয়াটি বেশ দ্রুত এবং এক বা দু'দিনের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। সময়ের হিসেবটা নির্ভর করে প্রাণীর আকৃতির উপর।

(২) পরবর্তী কয়েকদিনে ক্ষত আবৃতকারী এপিডার্মিস বাইরের দিকে ফুলে উঠে, অনেকটা কোণাকৃতি ধারণ করে (চিত্র : ১)।

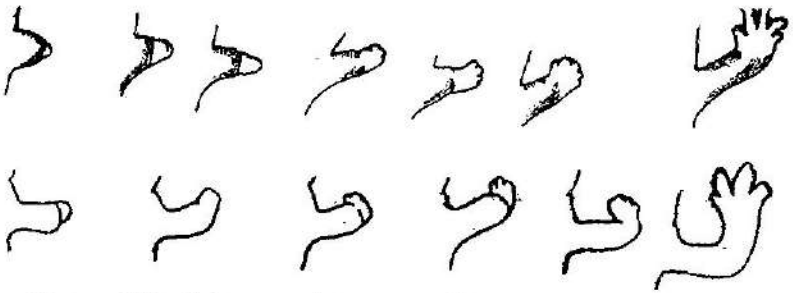

চিত্র ১ : নিউট, ***Triturus cristatus***-এর কর্তিত পায়ের পুনরুৎপত্তি : প্রথম সারিতে পিছনের পা ও দ্বিতীয় সারিতে সামনের পা-এর পুনরুৎপত্তি দেখানো হয়েছে (Balinsky, ১৯৮১ অনুসরণে)।

(৩) ফুলে উঠা স্থানে এপিডার্মিসের নিচে অসংখ্য কোষ সমবেত হয়ে কোষপিণ্ড গঠন করে। কোষগুলো দ্রুত বিভাজিত হয় এবং এপিডার্মিসের আবরণসহ পুনরুৎপত্তি ব্লাস্টেমা বা পুনরুৎপত্তি কুঁড়ি (Regeneration blastema or regeneration bud) গঠন করে।

(৪) ব্লাস্টেমা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। প্রথমে গঠনটি কোণাকৃতি থাকলেও পরে ক্রমশ প্রান্তের দিকে উপরে-নিচে চাপা হয়ে যায়। প্রান্তের এই চাপা অংশটি হচ্ছে করতল বা পদতলের কুঁড়ি।

(৫) শীঘ্রই আদি আঙুলের আবির্ভাব ঘটে। করতল বা পদতল কুঁড়ির কিনারায় খাঁজ দেখে তা সহজেই বোঝা যায়।

(৬) পদকুঁড়ির অভ্যন্তরে কোষপিণ্ড পৃথক হয়ে হাত-পায়ের আদি অন্তঃস্থ অঙ্গ (কঙ্কালের বিভিন্ন অস্থি ও পেশী) গঠন করে। তারপর সেগুলো কলাগত বিভেদনে অংশ নেয়। আদি আঙুলগুলো লম্বা হয়, পুনরুৎপত্তিরত সমগ্র হাত-পা স্বাভাবিক হাত-পায়ের সমান বৃদ্ধি লাভ করে।

কলার বিভেদন সম্পন্ন হয়ে গেলে হাত-পা স্বাভাবিক কাজকর্মে আত্মনিয়োগ করে। অবশেষে, নবায়িত অঙ্গ পুরোপুরি স্বাভাবিক অঙ্গের মতো হয়ে যায়।

প্রাণীর আকার এবং পরিস্ফুটনের পর্যায়ের উপর পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্নের সময়টি নির্ভর করে। ছোট লার্ভার পুনরুৎপত্তি ঘটে অতি দ্রুত। এই ক্ষেত্রে হাত বা পা তিন সপ্তাহের মধ্যে পুনরুদ্ধার হয়। বয়স্ক ও বড় লার্ভার এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লেগে যায়।

পুনরুৎপত্তির প্রকারভেদ

প্রাণিজগতে প্রধানত দু'ধরনের পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়া সংঘটিত হতে দেখা যায়। (১) এপিমরফোসিস বা এপিমরফিক পুনরুৎপত্তি (epimorphosis বা epimorphic regeneration) এবং (২) মরফালেক্সিস বা মরফালেকটিক পুনরুৎপত্তি (morphallaxis or morphallactic regeneration)।

যখন একটি হৃত দেহাংশ পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহের বাকী অংশের সাথে যুক্ত হয়, তখন তাকে এপিমরফোসিস বলে। নিউটের হাত বা পায়ের পুনরুৎপত্তি এই ধরনের। উচ্চতর প্রাণীতে এপিমরফোসিস প্রক্রিয়াই সচরাচর বেশি ঘটে থাকে।

যে পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়ায় দেহের সব অংশে পুনর্গঠনের জোয়ার বয়ে যায় তাকে মরফালেক্সিস বলে। যেমন, ***Hydra***-র একটি ছোট দেহাংশ থেকে পূর্ণ দেহের সৃষ্টি।

বিভিন্ন প্রাণীর পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা

এককোষী প্রাণী থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী পর্যন্ত, এক কথায় বলতে গেলে, সমগ্র প্রাণিজগতেই পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা কম-বেশি প্রদর্শিত হয়। তবে তার উদ্দেশ্য ও গতি সবসময় এক থাকে না। নিচের আলোচনা থেকে আমরা সে বিষয়ে কিছু ধারণা পাব।

ক. এককোষী প্রাণীতে পুনরুৎপত্তি

এককোষী অনেক প্রাণীরই পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা আছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে ***Stentor***-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রাণীর বহিঃপ্লাজম পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দেহতলের কোথাও কেটে যদি কোন উপায়ে সবটুকু অন্তঃপ্লাজম বের করে নেয়া হয় এবং শুধু বহিঃপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস থাকে, তাহলে সে অন্তঃপ্লাজম দ্রুত পুনরুদ্ধার করে নিয়ে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও জননের উদ্দেশ্যে রত হয়। অন্যদিকে, যদি বহিঃপ্লাজম ফেলে দিয়ে যদি শুধু অন্তঃপ্লাজম ও নিউক্লিয়াসকে রাখা হয়, তাহলে দেহটি স্ফীতকায় ধারণ করে, কিছু সময় জীবিত থেকে অবশেষে মৃত্যুবরণ করে। যদি উপরোক্ত অবস্থায় এক টুকরা বহিঃপ্লাজম সাথে রেখে দেয়া যায় তাহলে তা ধীরে ধীরে অন্তঃপ্লাজমের চারদিক ঘিরে প্রসারিত হয় এবং দেহের অন্যান্য

হৃত অংশ ফিরিয়ে আনে। এই প্রাণীর ম্যাক্রোনিউক্লিয়াসও পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খ. বহুকোষী প্রাণীতে পুনরুৎপত্তি

বিভিন্ন বহুকোষী প্রাণিগোষ্ঠীতে ঘটেছে বৈচিত্র্যময় পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়ার সমাহার। স্পঞ্জ, সিলেন্টেরেট ও আরও অন্যান্য নিম্নতর অমেরুদণ্ডীতে এই প্রক্রিয়া বেশ উল্লেখযোগ্য। উচ্চতর প্রাণীতে ততটা সুস্পষ্ট না হলেও তাদের ভ্রূণীয়, লার্ভা ও তরুণ দশায় পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়, বয়স্ক প্রাণীতে তেমনটি ঘটে না। নিচে অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী কয়েকটি গোষ্ঠীতে পুনরুৎপত্তির ধরন বর্ণনা করা হয়েছে।

(ক) অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে পুনরুৎপত্তি

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে স্পঞ্জ, সিলেন্টেরেট, প্লানারিয়া, নিমারটিন, অ্যানিলিড, মোলাস্ক, নিমাটোড, আর্থ্রোপোড ও ইকাইনোডার্ম গোষ্ঠী বেশ উল্লেখযোগ্য পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়া প্রদর্শন করে থাকে। নিচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) স্পঞ্জে পুনরুৎপত্তি: স্পঞ্জের দেহ ছোট ছোট টুকরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও অনুকূল পরিবেশে প্রত্যেকটি টুকরা থেকে ধীরে ধীরে (কয়েক মাসে বা বছরে) একেকটি পূর্ণদেহী স্পঞ্জ সৃষ্টি হতে পারে; যেমন—কয়েকটি কোয়ানোসাইটসহ ০·৪ মিলিমিটারের চেয়ে বড় বড় *Leucosolenia*-র খণ্ড ক্রমশ পূর্ণাঙ্গ স্পঞ্জে পরিণত হতে দেখা যায়। এমনকি, কোন কোন ক্ষেত্রে স্পঞ্জদেহের প্রতেকটি কোষকে যদি আলাদাও করে ফেলা হয় তবুও তারা পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা হারায় না। বিজ্ঞানী উইলসন (Wilson, ১৯০৭) তা প্রমাণ করেছেন। তিনি প্রথমে একটি স্পঞ্জকে কেটে টুকরা করেছেন। টুকরাগুলোকে একটি পেষণযন্ত্রের ভিতর পিষে সূক্ষ্ম রেশমী কাপড়ে চেপে প্রত্যেকটি কোষকে পরস্পর থেকে যথাসম্ভব পৃথক করেছেন। এভাবে আলাদা করা কতকগুলো কোষকে একটি বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশে রেখে দিলে দেখা যাবে যে, কয়েকদিনের মধ্যেই কোষগুলো একত্রিত হয়ে একটি ছোট পিণ্ডে পরিণত হয়েছে এবং পরে কোষগুলো যার যার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পুনর্বিন্যস্ত হয়ে একটি নতুন স্পঞ্জের রূপ নিয়েছে। ডার্মাল কোষগুলো আবরণ তৈরিতে এবং কোয়ানোসাইটগুলো ভিতরের ফ্ল্যাজেলীয় প্রকোষ্ঠ নির্মাণে ব্রত হয়। আর্কিওসাইটগুলোও তাদের স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে যায়। প্রতি মিনিটে

০.৬-৩.৫ মাইক্রোন দূরত্ব অ্যামিবয়েড চলনের মাধ্যমে অতিক্রম করতে পারায় আর্কিও-সাইটগুলো দেহগঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। একটি নতুন সদস্য সৃষ্টির জন্য দুই হাজার কোষ হলেই চলে (Galtsoff, ১৯২৫)। তিন সপ্তাহের মধ্যেই নতুন অসকুলামসহ সমগ্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

স্পঞ্জদেহে উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়াকে পুনর্গঠন (reconstiution) নাম দেয়া হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, স্পঞ্জের প্রত্যেকটি কোষ আলাদা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নিজ নিজ কলাগত বৈশিষ্ট্য ধরে রেখে পুনর্বিন্যস্ত হয়। প্রাগ্রসর বিভেদন ঘটার সম্ভাবনা এই ক্ষেত্রে খুবই কম। তাই এই প্রক্রিয়াকে মরফালেক্সিস ধরনের পুনরুৎপত্তির সাথে তুলনা করা যায়।

(২) সিলেন্টেরেটে পুনরুৎপত্তিঃ সিলেন্টেরেটেও পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা প্রচণ্ড। ট্রেম্বলে (Trembley, ১৭৪০) সর্বপ্রথম *Hydra*-য় পুনরুৎপত্তির বিষয়টি আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি *Hydra*-কে দুই বা ততোধিক অংশে বিভক্ত করলে প্রত্যেকটি টুকরা থেকে একটি করে নতুন ও ছোট আকারের সদস্য পুনর্গঠিত হয়। একটি কর্তিত হাইড্রাদেহের পিছনের অংশকে মুখ ও কর্ষিকাসহ সামনের অংশ পুনরুদ্ধার করতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে সামনের অংশ পুনরুদ্ধার করে পদ ও পাদচাকতিসহ পিছনের অংশ। এমনকি পূর্ণদেহের ১/১২০০ ভাগের অতি ক্ষুদ্র খণ্ডও একটি পূর্ণ হাইড্রায় রূপান্তরিত হতে পারে। এটি একটি মরফালেক্সিস প্রক্রিয়া। অর্থাৎ হাইড্রায় এপিমরফোসিস ও মরফালেক্সিস দু'ধরনের পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়াই দেখা পাওয়া যায়। আরও দেখা গেছে যে, সিলেন্টেরেটে পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা পলিপজাত দশায়ই সর্বাধিক, মেডুসাজাত দশায় সবচেয়ে কম।

(৩) প্ল্যানারিয়ায় পুনরুৎপত্তিঃ পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার জন্য সিলেন্টেরেটদের পরেই প্ল্যানারিয়াদের স্থান। প্ল্যানারীয়দের আড়াআড়ি বা লম্বালম্বি কেটে ফেললে প্রত্যেকটি অংশ তার হারানো অর্ধাংশকে পুনরুদ্ধার করে নেয়। এই প্রক্রিয়ায় দেহের যে কোন অংশ, যেমন—মাথা, লেজ বা গলবিলসহ মধ্য অংশ, প্রতিস্থাপিত হতে পারে। কোন অংশ কেটে ফেললে সেই অংগে একটি পুনরুৎপত্তি ব্লাস্টেমার সৃষ্টি হয়। এই ব্লাস্টেমা থেকে হৃত অংশের পুনরুৎপত্তি ঘটে। উদ্ধারকৃত অংশটি প্রকৃত অংশের চেয়ে ছোট থাকে। এইভাবে প্ল্যানারিয়া এপিমরফোসিস ও মরফালেক্সিস উভয় ধরনের পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পুনরুৎপত্তি সম্পন্ন হয়। অন্যান্য প্ল্যাটিহেলমিন্থ সদস্যে পুনরুৎপত্তি তেমন ব্যাপক আকারে ঘটে না।

(৪) নিমারটিনে পুনরুৎপত্তি : নিমারটিনরাও প্রচণ্ড পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার অধিকারী। এই গোষ্ঠীর বড় বড় প্রজাতিগুলো উত্তেজিত হলেই টুকরা টুকরা হয়ে যায়। প্রোবোসিসটি উদ্গত হলেই ভেঙে যায়, দ্রুত তার পুনরুৎপত্তিও ঘটে। কিন্তু দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলে তা থেকে পুনরুৎপত্তির মান প্রজাতিভেদে একেক রকম হয়ে থাকে। কোন কোন প্রজাতি খণ্ডিতকরণের মাধ্যমে নিয়মিত বংশবিস্তার করে, এমনকি তাদের পিছনের অংশের টুকরোগুলো পর্যন্ত মিউকাস আবরণীর ভিতর পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার অধিকারী। এভাবে নিমারটিনেও এপিমরফোসিস ও মরফালেক্সিস উভয় ধরনের পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়াই দেখতে পাওয়া যায়।

(৫) নিমাটোডে পুনরুৎপত্তি : নিমাটোডে পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা খুব কম, একদিকে তাদের দেহকোষগুলো উচ্চমাত্রায় বিভেদিত; অন্যদিকে, কোষসংখ্যাও সীমিত। এদের পুনরুৎপত্তি বলতে বাহ্যিক কোন ক্ষতপূরণকেই বুঝিয়ে থাকে।

(৬) অ্যানিলিডে পুনরুৎপত্তি : অ্যানিলিডে পুনরুৎপত্তি সম্বন্ধে ধারণা অর্জনের জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে, অঙ্গচ্ছেদের পর পলিকিট ও অলিগোকিট সদস্যরা হৃত সম্মুখ বা পশ্চাৎ অংশ পুনরুদ্ধার করে নিতে পারে।

কেঁচো বা অন্যান্য অলিগোকিটের দেহকে কেটে দুটি অর্ধাংশে ভাগ করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটি অর্ধাংশেই তার হৃত অংশ পুনরুদ্ধার করে নিয়েছে। এভাবে একটি সদস্য থেকে দুটি নতুন সদস্যের সৃষ্টি হয়।

বেশিরভাগ অ্যানিলিডেই পুনরুৎপত্তি বেশ সীমিত। সামনের দিকে কর্তিত অংশে সীমিত সংখ্যক খণ্ডের পুনরুৎপত্তি ঘটে, কারণ প্রত্যেক প্রজাতিতে এই অংশের খণ্ডসংখ্যা নির্ধারিত। *Allolobophora foetida* প্রজাতির কেঁচোতে এই সংখ্যা হচ্ছে ৫। যদি পাঁচটি খণ্ড বা তারও কম সংখ্যক খণ্ড সামনের দিক থেকে কেটে ফেলা হয় তাহলে সম্পূর্ণ অংশেরই পুনরুৎপত্তি ঘটবে। কিন্তু যদি পাঁচের বেশি সংখ্যক খণ্ড সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে মাত্র চারটি বা পাঁচটি খণ্ডের পুনরুৎপত্তি ঘটে; ফলে প্রাণিদেহের স্বাভাবিক খণ্ড সংখ্যা আর ফিরে পায় না। যদি জনন-খণ্ডের (১০-১৪ তম) পিছনে কেটে ফেলা হয় তাহলেও মাত্র চারটি বা পাঁচটি সম্মুখ খণ্ডের পুনরুৎপত্তি ঘটবে; ফলে জনন খণ্ড আর কোনদিন নবায়িত হবে না। অন্যদিকে পিছনের অংশে পুনরুৎপত্তিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। সেখানে সবসময় হারানো খণ্ডের সমান সংখ্যক খণ্ডেরই পুনরুৎপত্তি ঘটে। এভাবে অ্যানিলিডে শুধু এপিমরফোসিস প্রক্রিয়ায় অঙ্গের পুনরুদ্ধার পর্ব সম্পন্ন হয়।

বিজ্ঞানী ওয়েইস (Weiss, ১৯৩৯) জানিয়েছেন যে, জোঁকে কখনও পুনরুৎপত্তি ঘটে না।

(৭) মোলাস্কো পুনরুৎপত্তিঃ মোলাস্কে পুনরুৎপত্তির ঘটনা বেশ কমই ঘটে। গ্যাস্ট্রোপোডে চোখসহ অক্ষিদণ্ড, মাথা ও পায়ের অংশবিশেষের পুনরুৎপত্তি ঘটতে দেখা যায়। সম্পূর্ণ মাথা কখনও পুনরুদ্ধার করা যায় না। মাথার কিছু অংশসহ সেরেব্রাল গ্যাংগলিয়া সরিয়ে ফেললে তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। সেফালোপোডে শুধু বাহুর পুনরুৎপত্তি ঘটে, দেহের অন্য কোন অংশের নয়।

(৮) আর্থ্রোপোডে পুনরুৎপত্তিঃ হারানো উপাঙ্গের নবায়নজাতীয় পুনরুৎপত্তি আর্থ্রোপোডে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। অধিকাংশ ক্রাস্টেসিয়তে পূর্ণাঙ্গ দশা ছাড়াও পরিস্ফুটনের যে কোন পর্যায়ে পায়ের পুনরুৎপত্তি ঘটতে পারে। কিন্তু পতঙ্গে তা শুধু লার্ভা দশায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং নতুন পা স্বাভাবিকের চেয়ে সবসময় খাটো হয়। শত্রু বা গবেষকের হাতে পড়ে কাঁকড়া ও মাকড়ের পা অতি দ্রুত খসে পড়ে। একটি নির্দিষ্ট বিচ্ছেদস্থল থেকে পা ভেঙে যায়। পায়ের এক্সটেনসর পেশীর প্রচণ্ড সংকোচনের ফলেই এমনটি ঘটে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছেদ (autotomy) বলে।

স্বচ্ছেদের পর বা উপাঙ্গ হারানোর পর ক্ষতস্থান একটি কাইটিনময় ঢিবিতে বন্ধ হয়ে যায়। এই ঢিবির নিচে পুনরুৎপত্তি কুঁড়ির সৃষ্টি হয় যা পরে এপিমরফিক প্রক্রিয়ায় হৃত অংশকে ফিরিয়ে দেয়। পরবর্তী খোলস মোচন প্রক্রিয়ার আগে নবসৃষ্ট উপাঙ্গ সুস্পষ্ট হয় না। প্রথমদিকে খাটো হলেও কয়েকবার খোলস মোচনের সময় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে তা স্বাভাবিক আকারে ফিরে আসে।

(৯) ইকাইনোডার্মে পুনরুৎপত্তিঃ এই প্রাণিগোষ্ঠীর স্টারফিশ, ব্রিটল স্টার ও সী লিলি নামে খ্যাত প্রাণীরা চাকতির অংশবিশেষ ও বাহু পুনরুদ্ধার করতে পারে। পরিবেশে তারা প্রায়ই দু'একটি বাহু হারিয়ে ফেলে, আবার তা পুনরুদ্ধারও করে। হলোথুরয়েডরা পায়ুপথ দিয়ে তাদের অভ্যন্তরীণ কিছু অঙ্গ (যেমন—শ্বসন বৃক্ষ ও পৌষ্টিক নালী) বাইরে বের করতে পারে। এসব কখনও হারিয়ে গেলে পুনরুদ্ধারে তারা সক্ষম।

(খ) মেরুদণ্ডী প্রাণীতে পুনরুৎপত্তি

মেরুদণ্ডী সব গোষ্ঠীতেই পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়া দেখা গেলেও ইউরোডিল উভচরেই তা কিছু ব্যাপক আকারে ঘটে থাকে। নিচে বিভিন্ন মেরুদণ্ডী গোষ্ঠীতে পুনরুৎপত্তির স্বরূপ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

(১) মাছে পুনরুৎপত্তি : মাছে পুনরুৎপত্তি অত্যন্ত সীমিত। মাছের পাখনা কেটে ফেললে বা ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার পুনরুৎপত্তি ঘটতে পারে। পৌচ্ছিক পাখনাও পুনরুৎপাদিত হয় কিন্তু লেজের নবায়ন কখনও সম্ভবপর নয়।

(২) উভচরে পুনরুৎপত্তি : ইউরোডিল উভচরে দর্শনীয় পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। নিউট ও স্যালামাণ্ডারের লার্ভা শুধু হাত-পা-ই নয় লেজ, বহির্ফুলকা এবং উপর ও নিচের চোয়াল পর্যন্ত পুনরুদ্ধারে সক্ষম। এমনকি, চোখের লেন্স এবং রেটিনাও নবায়িত হতে পারে। বিনষ্ট চোখের সামান্য ভগ্নাবশেষ থেকেই সম্পূর্ণ নতুন চোখের সৃষ্টি হতে পারে।

অ্যানুরা জাতীয় উভচরে অর্থাৎ ব্যাঙের লার্ভায় পুনরুৎপত্তি সীমিত মাত্রার। ব্যাঙাচি শুধু হাত-পা ও লেজ পুনরুদ্ধারে সক্ষম। পূর্ণবয়স্কে এই প্রক্রিয়া একেবারে অনুপস্থিত।

(৩) সরীসৃপে পুনরুৎপত্তি : শিকারী প্রাণী বা গবেষকের সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় স্বচ্ছেদ প্রক্রিয়ায় টিকটিকির লেজের গোড়ার দিকে অবস্থিত বিশেষ বিযুক্তি-স্থল থেকে লেজের সামনের অংশ খসে পড়ে এবং ক্ষতস্থানে একটি পুনরুৎপত্তি কুঁড়ির সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে নতুন লেজ গঠিত হয়। নতুন লেজ লম্বায় পুরনোটির সমান হতে পারে আবার অনেক সময় একটি ছোট কোণাকৃতির উদ্গত অংশের মতোও হতে পারে (Bryant and Bellairs, ১৯৬৭)। লেজের আঁইশগুলো আদি লেজের আঁইশের মতো হয় না, তাছাড়া অভ্যন্তরে কোন পৌচ্ছিক কশেরুকাও থাকে না। এর পরিবর্তে একটি অখণ্ডায়িত উপাস্থির নল প্রসারিত থাকে। কখনও বা টিকটিকির ক্ষতিগ্রস্ত পা বা আঙুলেরও পুনরুৎপত্তি ঘটে, তবে তা অসম্পূর্ণ ধরনের; যেমন-পা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এমন একটি অঙ্গের সৃষ্টি হয় যাতে কোন আঙুল থাকে না।

(৪) পাখিতে পুনরুৎপত্তি : পাখির পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা খুব কম। শুধু ঠোঁটের কিছু অংশের পুনরুৎপত্তি ঘটতে দেখা যায়।

(৫) স্তন্যপায়ীতে পুনরুৎপত্তি : স্তন্যপায়ীতে হাত-পায়ের স্বতঃস্ফূর্ত পুনরুৎপত্তি ঘটে না, এমনকি শিশুভ্রূণ দশায়ও নয় (Nicholas, ১৯২৬)। তবে মারসুপিয়ালের নবজাতকে তা ঘটতে দেখা যায়। এই গোষ্ঠীর শিশুরা খুবই অসম্পূর্ণ বিভেদিত অবস্থায় জন্ম নেয়। তখন কর্তিত পিছনের পায়ে যদি মগজকলার

সামান্য অংশ লাগিয়ে দেয়া যায় তাহলে এর উদ্দীপনায় উল্লেখযোগ্য পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। তাছাড়া স্তন্যপায়ীতে আর তেমন পুনরুৎপত্তি ঘটে না, যা ঘটে তা শুধু কলার পুনরুদ্ধারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, হৃত অঙ্গ নবায়ন কখনও সম্ভব হয় না।

কলার পুনরুৎপত্তিতে ক্ষতপূরণের সমতুল্য মনে করা হয়। ত্বকের ক্ষত নতুন এপিডার্মিসও যোজক কলায় পূরণ হয়। বড় ক্ষতে সৃষ্ট যোজক কলা স্বাভাবিক ডার্মিসের চেয়ে ভিন্ন হওয়ায় ক্ষতচিহ্ন হিসেবে থেকে যায়।

কঙ্কাল কলা বেশ পুনরুৎপত্তি ক্ষমতাসম্পন্ন। হাত-পায়ের অস্থিতে বড় ধরনের ত্রুটিও সেরে উঠতে দেখা যায়। কণ্ডরায় কোন ক্ষত হলে প্রথমে তা যোজক কলার সাহায্য নিয়ে সেরে উঠে। পরে সেই যোজক কলাই কণ্ডরার গাঠনিক ও যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়।

কিছু অভ্যন্তরীণ অঙ্গও পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার অধিকারী। যকৃতের একটি বিরাট অংশ কেটে বাদ দিলেও বাকি অংশ থেকে তার পুনরুদ্ধার ঘটতে পারে তবে এই নতুন যকৃত-কলার আকৃতি পূর্বতন অংশের চেয়ে সামান্য ভিন্ন হয়।

পুনরুৎপত্তির নিয়ামক

প্রাণীর পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার মাত্রা যদিও তার গঠন, কলার বিভেদন বা ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটনের ধাপ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল, তা সত্ত্বেও পরিবেশ বা বিশেষ ব্যবস্থাপনায় এর গতি বৃদ্ধির হ্রাস ঘটানো যায়। নিচে এই ধরনের কয়েকটি নিয়ামকের কথা উল্লেখ করা হলো—

(১) তাপমাত্রা ঃ পুনরুৎপত্তির হার অন্যান্য জৈবনিক প্রক্রিয়ার মতোই স্বাভাবিকভাবে তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়ানো হলে পুনরুৎপত্তি ত্বরান্বিত হতে দেখা যায়।

(২) খাদ্য ঃ পুনরুৎপত্তিতে খাদ্যের ভূমিকাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলা যায় না। অভুক্ত প্রাণী যথারীতি পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়া চালিয়ে যায়। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি আসে তার অন্তঃস্থ উৎস থেকে। দেখা গেছে যে, দীর্ঘদিন যাবত প্ল্যানারীয়-দের খাবার না দিলে তারা নিজ দেহের উপাদানকে বিপাকীয় কাজে ব্যবহার করে বেঁচে থাকতে পারে। এতে অবৃদ্ধি হতে পারে, তাই বলে পুনরুৎপত্তির কাজ থেমে থাকে না। অবশেষে ছোট আকৃতির সদস্যদের আবির্ভাব ঘটে (চিত্র : ২)।

(৩) স্নায়ুতন্ত্র ঃ পুনরুৎপত্তির ক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্র প্রভাবশালী ভূমিকা রাখে। উভচরে দেখা গেছে যে, হৃত অংশের ক্ষতস্থানে পর্যাপ্ত স্নায়ু সরবরাহ না থাকলে পুনরুৎপত্তির প্রাথমিক ধাপগুলো স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হতে পারে না। নিউটের হাত বা পা কাটার পর যদি হাত বা পায়ের স্নায়ু সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে

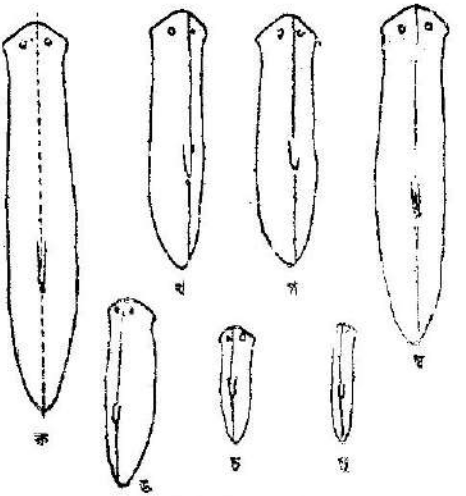

চিত্র ২ : একটি অনুদৈর্ঘ্য দ্বিখণ্ডিত *Planaria lugubris* এর (ক) পুনরুৎপত্তি, (খ-ঘ) খাদ্য পাওয়া বাম অংশ; (ঙ-ছ) খাদ্য না পাওয়া ডান অংশ (Balinsky, 1981, অনুসরণে)

দেখা যাবে যে, পুনরুৎপত্তিতে হাত বা পায়ের পরিস্ফুটনও থেমে গেছে। শুধু তাই না, ব্লাস্টেমার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে বা এমনকি, বিশোষিতও হয়ে যেতে পারে (চিত্র : ৩)। আর যদি হাত-পা কাটার আগে স্নায়ু কেটে নেয়া হয় তাহলে বিভেদন প্রক্রিয়া চালু হয় ঠিকই কিন্তু তা হাত-পা'র ব্লাস্টেমা সৃষ্টির পরিবর্তে হাত-পায়ের অধিকাংশ ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত অনিয়ন্ত্রিতভাবে অব্যাহত

চিত্র ৩ : স্নায়ু কেটে দেওয়ায় পায়ের পুনরুৎপত্তি থেমে যাওয়া (প্রতিজোড়ায় বাম পা)। স্নায়ুযুক্ত পা ঠিকই পুনরুৎপত্তি লাভ করেছে (Balinsky, ১৯৮১, অনুসরণে)

থাকে। পুনরুৎপত্তির সৃষ্টিশীল অংশ আদৌ শুরু হয় না। প্রধানত পুনরুৎপত্তির প্রাথমিক ধাপগুলোতেই স্নায়ুতন্ত্রের জোর প্রভাব থাকে। পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়া যদি বিভেদন শুরুর মুহূর্ত পর্যন্ত পৌঁছে যায় তাহলে তার পরিস্ফুটন স্নায়ু সরবরাহ ছাড়াও চলতে পারে।

আরও অনেক পরীক্ষার ফলাফল থেকে এটা নিশ্চিত বলা যায় যে, পুনরুৎপত্তির জন্য স্নায়ুতন্ত্রের প্রভাব অতি জরুরী। কিন্তু এসব পরীক্ষা থেকে স্নায়ুতন্ত্রের কাজের পদ্ধতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। উভচরে এ সংক্রান্ত একটি পরীক্ষার ফলফলের ভিত্তিতে বিজ্ঞানী ব্যালিনস্কি (Balinsky, ১৯৭০) মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবত যে কোন ধরনের স্নায়ু সরবরাহ পুনরুৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয় প্রভাবের উৎস হতে পারে এবং প্রভাবের প্রকৃতি স্নায়ু উদ্দীপনার স্বাভাবিক সংবহনের চেয়ে ভিন্নতর। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে, একটি পুনরুৎপত্তি ব্লাস্টেমার সব কোষ যেহেতু ক্ষতস্থানে অবস্থান গ্রহণের জন্য গতিশীল থাকে, তাই প্রত্যেকটি কোষে স্নায়ুতন্তুর সংস্পর্শ থাকা অসম্ভব। এই অবস্থায় স্নায়ু উদ্দীপনার স্বাভাবিক সংবহন পদ্ধতি অচল বলেই প্রমাণিত হবে। সে কারণে স্নায়ুপ্রান্তগুলো হয়তো কিছু পদার্থ ত্যাগের মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করে। কী সেই পদার্থ তা হয়তো ভবিষ্যতে জানা যাবে।

(৪) রঞ্জন রশ্মি: কলায় রঞ্জন রশ্মির প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া সার্বজনীন। এই রশ্মিসম্পাতে পুনরুৎপত্তির প্রতিক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় বা বন্ধ হয়ে যায়। একটি পূর্ণ বয়স্ক নিউটের হাত বা পা কেটে ফেললে দ্রুত তার পুনরুৎপত্তি ঘটে। যদি নব-সৃষ্ট পুনরুৎপত্তি কুঁড়ি রঞ্জন রশ্মি দিয়ে কিরণীয় করা হয় তাহলে সেই অঙ্গের পরিস্ফুটন মন্থর হয়ে পড়ে বা বন্ধও হয়ে যেতে পারে। তা নির্ভর করে কিরণীয়নের পরিমাণের উপর। একেক প্রাণীতে এই মাত্রা একেক রকম হলেও ৫০০০ থেকে ৭০০০ রন্টজেন মাত্রা প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুনরুৎপত্তি দমন করে রাখে। কিরণীয় পুনরুৎপত্তি কুঁড়ি আর বড় হয় না, বরং অঙ্গের কঙ্কাল ও পেশী সৃষ্টির পরিবর্তে তা যোজক কলায় ভরে থাকে। কুঁড়িটি আসলে ছোট হয়ে যায় এবং আংশিক বা সম্পূর্ণ বিশোষিত হয়। এর কারণ হচ্ছে, রঞ্জন রশ্মি পুনরুৎপত্তি কুঁড়ির ভিতরে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বাধা দান। রঞ্জন রশ্মি কোষের মাইটোটিক প্রক্রিয়া দমন করে বা বন্ধ করে দেয়। ফলে কুঁড়ির বৃদ্ধি ঘটে না, যে পরিমাণ কোষ থাকে তা অঙ্গের পরিস্ফুটন ও বিভেদনের জন্য অপ্রতুল হয়ে পড়ে।

একটি পূর্ণবয়স্ক নিউটের স্বাভাবিক হাত বা পায়ে ৭০০০ রন্টজেন মাত্রা প্রয়োগ করা হলে তাতে কোন দৃশ্যমান ফল পাওয়া যাবে না। একটি অকিরণীয়

হাত বা পায়ের সাথে এর দৃশ্যত এবং কার্যগত কোন পার্থক্যই ধরা যায় না। কিন্তু কিরণীয় অঙ্গটি কেটে ফেলে দিলে সে স্থানে আর কোনদিন পুনরুৎপত্তি ঘটবে না, ক্ষতস্থানটি শুধু ত্বকে আবৃতই থেকে যাবে (Brunst, ১৯৫০)।

পুনরুৎপত্তিতে কলাস্থানিক প্রক্রিয়া (চিত্র ৪)

পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়ায় একটি কর্তিত অঙ্গের স্থানে কলাস্থানিক পরিবর্তনের এক জটিল অনুক্রম সংঘটিত হয়। পরে পুনরুৎপত্তি ব্লাস্টেমার সৃষ্টি হয় এবং এর বিভেদন ঘটে। সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে নিচের পাঁচটি ধাপে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়—

(১) রক্তপাত বন্ধ হওয়া;
(২) ক্ষতপূরণ;
(৩) পুনর্বিভেদ;
(৪) ব্লাস্টেমার সৃষ্টি এবং
(৫) ব্লাস্টেমার বিভেদন।

(১) রক্তপাত বন্ধ হওয়াঃ কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটার সাথে সাথেই দেহের অন্তঃস্থ কলা ও কোষ দেহতলে চলে আসতে শুরু করে। কিছু কোষ নিষ্পেষিত হয়, ছিঁড়ে যায় বা অন্যকোন উপায়ে নষ্ট হয়, অন্যান্য কোষ প্রতিকূল পরিবেশে উন্মুক্ত থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এভাবে ক্ষতস্থান মৃতকোষের ভগ্নাবশেষের ভাণ্ডারে পরিণত হয়। সুগঠিত রক্তবাহিকাসম্পন্ন প্রাণিদেহে ক্ষতিগ্রস্ত বাহিকা থেকে ক্ষতস্থানে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং দ্রুত একটি জটিল প্রক্রিয়ায় জমাট বাঁধে। এর ফলে আর রক্তপাত হতে পারে না।

(২) ক্ষতপূরণঃ এই ধাপে ত্বকের এপিথেলিয়াম জমাট বাধা রক্তের ঠিক নিচে অর্থাৎ ক্ষতস্থানের উপরে বিস্তৃত হয়। অ্যামিবয়েড চলনের মাধ্যমে কোষগুলোর বিস্তৃতি ঘটে। তখন ক্ষতস্থানের কিনারায় কোন বৃদ্ধি ঘটে না। এ সময় এপিথেলিয়ামে মাইটোসিস প্রক্রিয়াও বন্ধ থাকে। প্রাণিদেহের ও ক্ষতের আকৃতি, এবং তাপমাত্রার উপরই ক্ষতপূরণের সময় নির্ভর করে। স্যালামাণ্ডার লার্ভায় দু'একদিনের মধ্যেই ক্ষত ভরাট হয়ে যায়। অন্যদিকে, মেরুদণ্ডী প্রাণিদেহে ক্ষত সৃষ্টি হলে অধঃত্বকীয় পেশী স্তরে সংকোচন ঘটে। এর ফলে ক্ষতস্থানটি বেশ সংকীর্ণ হয়ে যায়।

(৩) পুনর্বিভেদনঃ ক্ষতস্থানটি এপিথেলিয়ামে আবৃত হয়ে যাওয়ার পর কর্তিত তলসংলগ্ন কোষগুলো পুনর্বিভেদনে রত হয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এই

প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট দেখা যায়। তখন অস্থি ও উপাস্থির আন্তঃকোষীয় মাতৃকা দ্রবীভূত হয়ে গেলে কোষগুলো ক্ষত ঢেকে রাখা এপিথেলিয়ামের নিচে মুক্ত অবস্থান গ্রহণ করে। যোজক কলাতন্তুও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ফলে যোজক কলার কোষগুলো বিভক্ত হয়ে যাওয়া কঙ্কাল কলার কোষগুলোর মতো একই রূপ ধারণ করে। ওদের মধ্যে কোন বিভেদ রেখা টানা যায় না (চিত্র ৫)। পেশীও পুনর্বিভেদনে রত হয়, এদের মাইওফাইব্রিল অদৃশ্য হয়ে যায় এবং নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমীয় অনুপাত বেড়ে যায়। সব কলার কোষই দেখতে ভ্রূণীয় কোষের মতো একই রকম দেখায়।

(৪) ব্লাস্টেমা বা পুনরুৎপত্তি কুঁড়ি সৃষ্টিঃ পুনর্বিভেদনের ফলে সৃষ্ট সদৃশ কোষগুলো ক্ষত আবৃতকারী ত্বকের নিচে সমবেত হয়ে ত্বককে নিয়ে ব্লাস্টেমা সৃষ্টি করে। পুনর্বিভেদন প্রক্রিয়া শুরুর সাথে সাথেই আসলে ব্লাস্টেমার সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। ব্লাস্টেমার ভিতরের কোষগুলোর উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদও প্রচলিত আছে। তার মধ্যে দুটি মতবাদ প্রধান।

একটি মতবাদে বলা হয়েছে যে, ব্লাস্টেমার সব কোষের উৎপত্তি স্থানীয় অর্থাৎ ক্ষতস্থান সংলগ্ন কলা থেকে এদের উদ্ভব। এই মত অনুযায়ী, ক্ষতের এপিথেলীয় আবরণ ছাড়া বাকী কোষগুলো যোজক কলা, কঙ্কাল প্রভৃতির পুনর্বিভেদনের ফলে মুক্ত হয়ে সেখানে সমবেত হয়।

অন্য মতবাদে বলা হয়েছে যে, ক্ষত সংলগ্ন এলাকার কোষ ব্লাস্টেমা সৃষ্টিতে কোন ভূমিকা রাখে না, তবে ক্ষতের আবরণটি সংলগ্ন অঞ্চল থেকেই প্রসারিত হয়। এই মত অনুযায়ী, রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে বা অ্যামিবয়েড চলনের মাধ্যমে দেহের দূরবর্তী অংশ থেকে কোষগুলোকে বিশেষ 'সংরক্ষিত' কোষ মনে করা হয় যারা এখনও পরিস্ফুটনের পূর্ণ ক্ষমতা বজায় রাখতে পেরেছে। বিভেদিত কলার কোষগুলো সেই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

অনেক পরীক্ষা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা সবশেষে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন যে, উল্লেখিত দুটি মতবাদের কোনটিকেই সার্বজনীন প্রযোগযোগ্য বলা যায় না। অনেক প্রাণীতে ব্লাস্টেমা সৃষ্টির জন্য উভয় উৎস থেকেই কোষের আগমন ঘটতে পারে।

(৫) ব্লাস্টেমার বিভেদন : ক্ষতস্থানের আবরণের নিচে যখন কলার পুনর্বিভেদন প্রক্রিয়া চলতে থাকে তখন পুনরুৎপত্তির এই ধাপ শুরু হয়। তখন ক্ষত সংলগ্ন

অঞ্চলের কোষগুলো দ্রুত মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায়। ব্লাস্টেমা সৃষ্টির সময় তা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে এবং তখন পেশী ও অন্যান্য কোষ তাদের গাঠনিক ও কার্যিক জটিলতা পরিহার করে পূর্ণোদ্যমে সংখ্যা-বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করে। সংখ্যাবৃদ্ধির গতি এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যখন কোষগুলো স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রাপ্তির আগেই আবার বিভক্ত হয়। এর ফলে ব্লাস্টেমায় সামান্য ছোট আকারের কোষের সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য বৃদ্ধি ও বিভক্তি সমান তালেই চলে। ব্লাস্টেমা সৃষ্টির পর মুহূর্তে বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি থাকে, পরে তা কমে যায়। তখন শুরু হয় বিভেদন।

পুনরুৎপত্তিরত অংশে কলাস্থানিক বিভেদন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াগুলোর মতোই ঘটে থাকে। দুটি বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। নিচে তার উল্লেখ করা হলো—

(১) পুনরুৎপত্তির সময় কিছু কলা এমন উৎস থেকে পরিস্ফুটিত হয় যা স্বাভাবিক ব্যক্তিজনিক প্রক্রিয়ায় হয় না। যেমন—প্ল্যানারিয়ার পুনরুৎপত্তি কোষ-গুলো প্যারেনকাইম থেকে উদ্ভূত। অতএব কোষগুলো মেসোডার্মাল প্রকৃতির। এই কোষগুলো থেকে পুনরুৎত্তির সময় শুধু প্যারেনকাইম ও পেশীই না বরং সেই সাথে স্নায়ুতন্ত্র ও গলবিলও সৃষ্টি করে। অথচ ডিম থেকে স্বাভাবিক পরিস্ফুটনের সময় স্নায়ুতন্ত্র ও গলবিল সৃষ্টি হয় এক্টোডার্ম থেকে। অন্যান্য প্রাণীতেও এমনি ঘটনা ঘটে থাকে।

(২) কখনও কখনও পুনরুদ্ভারকৃত অঙ্গের সৃষ্টি স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন স্যালামাণ্ডার লার্ভার স্বাভাবিক পরিস্ফুটনের সময় মেরুদণ্ডের অগ্রদূত হিসেবে নটোকর্ডের সৃষ্টি হয়। পূর্ণবয়স্ক স্যালামাণ্ডারে নটোকর্ড সংকীর্ণ হয়ে পড়ে এবং অস্থিময় কশেরুকা দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। কিন্তু পুনরুৎপত্তির সময় অস্থিময় কশেরুকা আর ফিরে আসে না। এর পরিবর্তে সুষুম্নারজ্জুর চারদিকে কশেরুকার প্রতিনিধিরূপে উপাস্থি দণ্ডের সৃষ্টি হয়। টিক-টিকির হারানো লেজের ভিতরও এ রকম উপাস্থি দণ্ডের সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাতে খণ্ডায়ন থাকে না।

পুনরুৎপত্তির শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া

পুনরুৎপত্তির সাথে জড়িত শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলোকে বিপাকের ধরন অনুযায়ী দুটি পরিব্যাপ্তিকালে চিহ্নিত করা যায়, প্রথম কাল হচ্ছে ধ্বংসাত্মক বিপাক, অপরটি অর্থাৎ দ্বিতীয় কাল গঠনমূলক বিপাক।

ধ্বংসাত্মক বিপাকের কাল ঃ যেসব প্রাণীতে যেমন—উভচরে পুনরুৎপত্তির গোড়াতেই ব্যাপক পুনর্বিভেদন ঘটে, তাদের ক্ষেত্রে এ সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আমিষ বিশ্লিষ্টকারী উৎসেচকের সক্রিয়তার আকস্মিক বৃদ্ধি। ব্যাঙাচির লেজ পুনরুদ্ধারের সময় এ সক্রিয়তা প্রায় চার গুণ বেড়ে যায়। এই বৃদ্ধির জন্য দায়ী উৎসেচক হচ্ছে ক্যাথেপসিন ও ডাইপেপটাইডেজ। এদের সক্রিয়তায় প্রথমে কর্তিত স্থানের ক্ষতিগ্রস্ত কোষগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে প্রধান ফল হচ্ছে ক্ষত সংলগ্ন তলের সুস্থ কলার অংশবিশেষের পুনর্বিভেদন। এতে আন্তঃকোষীয় পদার্থ ও কোষের বিভেদিত অংশ (যেমন—মায়োফাইব্রিল) বিনষ্ট হয়।

এসব অপাচিতিমূলক প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক কলায় যুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়—সমগ্র নাইট্রোজেনের ১৬·৮ শতাংশ থেকে ৩৫·১ শতাংশ পর্যন্ত (Orechowitsch and Bromley, ১৯৩৪)। আমিষ ও আমিষজাত পদার্থের গঠনেরও গুণগত পরিবর্তন ঘটে।

অঙ্গচ্ছেদের পর আরেকটি যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া উদ্ভূত হয় তা হচ্ছে কর্তিত স্থানের কলায় জারণের পরিবর্তন। শ্বাসাংক হঠাৎ করে পড়ে যায় অর্থাৎ ০·৫৭ মাত্রায় নেমে আসে (Ryvkina, ১৯৪৫)। এটা হচ্ছে কলায় অসম্পূর্ণ জারণের লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে পুনরুৎপত্তিরত কলায় ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ স্বাভাবিক কলার চেয়ে বেড়ে যায়। আমরা জানি যে, ল্যাকটিক অ্যাসিড তখনই তৈরি হয় যখন আবার গ্লাইকোলাইসিস জারণকে প্রতিস্থাপিত করে। ব্লাস্টেমা যখন পূর্ণ গঠিত হয় তখন শ্বাসাংক এবং ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণগত পরিবর্তন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। এরপর বিভেদন ধাপে স্বাভাবিক হয়ে আসে।

মুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড ও ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কর্তিত স্থানের কলায় এবং ব্লাস্টেমায় পিএইচ (pH) কমে যায়। ব্লাস্টেমা পূর্ণ গঠিত হলে তা বেড়ে গিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে আসে।

গঠনমূলক বিপাকের কাল ঃ বিপাকের ধ্বংসাত্মক কাল শেষ হলে শুরু হয় গঠনমূলক কাল। এই সময় পিএইচ স্বাভাবিক হয়ে আসে, শ্বাসাংক বেড়ে যায় এবং ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ কমে যায়। ব্লাস্টেমার কোষগুলো তখন সাইটোপ্লাজমীয় আরএনএ সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। নতুন করে রাইবোজোমীয় RNA সংশ্লেষের কারণে এই বৃদ্ধি ঘটে। তার সূত্র ধরে পুনরুৎপত্তিতে অংশগ্রহণকারী কোষগুলোতে নিউক্লিওলাইয়ের আকারও বড় হয় (Gurdon and Graham, ১৯৬৭)।

পুনরুৎপত্তি অংশের বিভেদনের সময় কোষে আরএনএ-এর পরিমাণ আবার কমে যায় (Brachet, ১৯৫০b)।

পুনরুৎপত্তি ক্ষেত্র ও হেটারোমরফোসিস

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রাণিদেহের যে অঙ্গ হারানো যায় সেই অঙ্গেরই পুনরুৎপত্তি ঘটে। অর্থাৎ হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা, লেজের বদলে লেজের পুনরুৎপত্তি হয়। অংসীয় অস্থিচক্রের একাংশ সরিয়ে নিলেও অংসীয় অস্থি-চক্রসহ সমগ্র বাহুই আবার ফিরে আসে। যদি অংসীয় অস্থিচক্রকে অংসীয় পেশীসহ

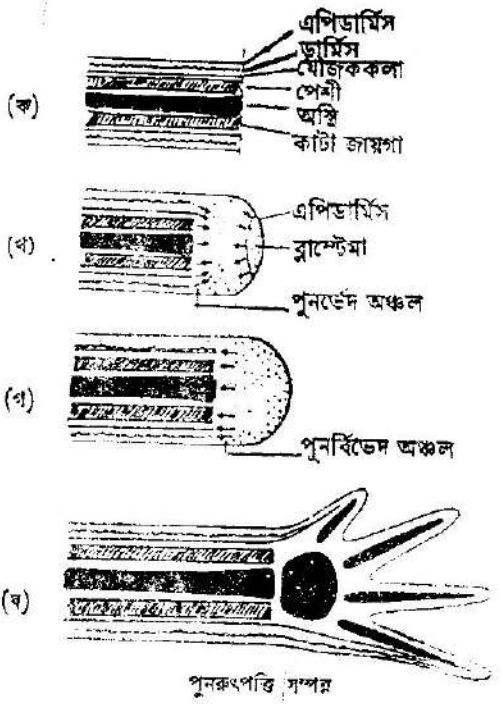

চিত্র ৪ : একটি স্যালামাণ্ডার লার্ভার পা কেটে ফেলার পর সেখানে কোষীয় পরিবর্তনের চিত্ররূপ (ক) সদ্যকাটা একটি স্থান; (খ) ব্লাস্টোমা সৃষ্টি, (গ) পুনর্ভেদ বন্ধ করে পুনর্বিভেদ চলছে; এবং (ঘ) পুনরুৎপত্তি-সম্পন্ন ব্লাস্টেমাটি হারানো অংশে বিভেদিত (Bodemer, ১৯৬৮ অনুসরণে)।

সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করা হয়, তাহলে আর নতুন বাহুর সৃষ্টি হয় না। এ পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে অঙ্গের পুনরুৎপত্তি ঘটবে তার আদি অঙ্গের কিছু অবশেষ দেহে অবশ্যই থাকতে হবে। বাহু এবং অংসীয় অস্থিচক্র ও সংলগ্ন পেশীকে পুনরুৎপত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে একটি একক বলে চিন্তা করা হয়। এ ধরনের একেকটি এককে পুনরুৎপত্তি সীমা (regeneration territory) বা পুনরুৎপত্তি ক্ষেত্র (regeneration field) নামে অভিহিত করা হয়।

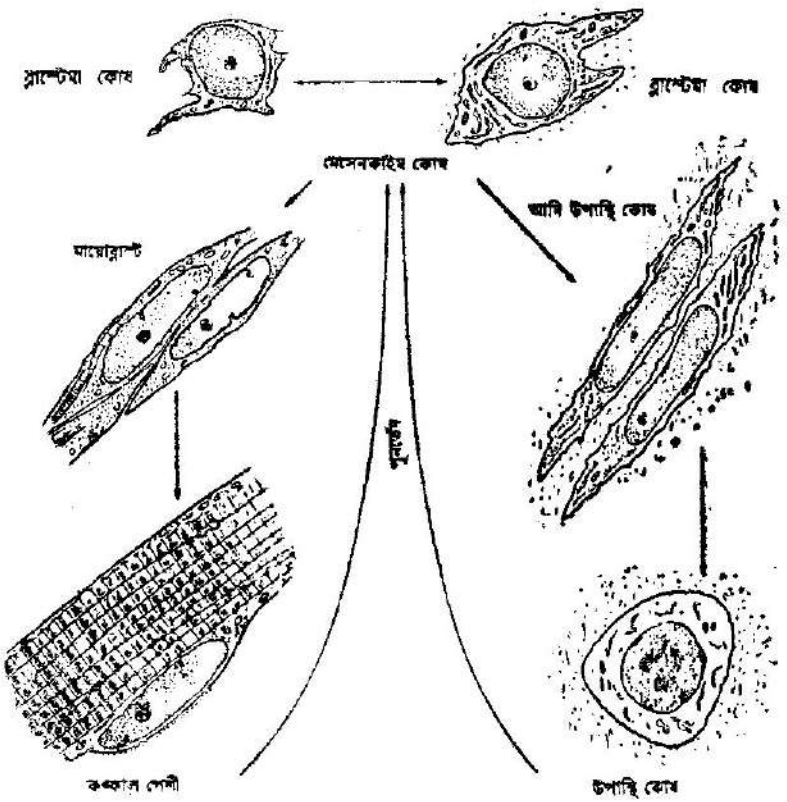

চিত্র ৫ঃ স্যালামাণ্ডারের পা পুনরুৎপত্তির সময় পেশী ও তরুণাস্থির বিভেদনের কোষতত্ত্ব (Lash and Whittaker, ১৯৭৪ অনুসরণে)।

পুনরুৎপত্তি ক্ষেত্র ধ্বংস হয়ে গেলে যে পুনরুদ্ধার পর্ব যে একেবারে বিনষ্ট হবে, তা নয়। তবুও পুনরুৎপত্তি ঘটে, তবে ভিন্ন উপায়ে। চিংড়িজাতীয় প্রাণী (***Palinurus***) এর অক্ষিদণ্ডকে যদি একেবারে গোড়া থেকে কেটে বাদ দেয়া হয়

তাহলে চোখ ও তার সংলগ্ন স্নায়ু গ্যাংলিওনের মূলোৎপাটন ঘটবে। এর ফলে নতুন চোখ আর সৃষ্টি হবে না। কর্তিত স্থানে ব্লাস্টেমা ঠিকই নির্মিত হয়, কিন্তু তা থেকে চোখের বদলে একটি অ্যান্টেনার মতো অঙ্গের আবির্ভাব ঘটে (চিত্র : ৬)। হৃত অংশের পরিবর্তে একটি ভিন্ন অঙ্গের পরিস্ফুটনকে হেটারোমরফোসিস (heteromorphosis) বলে। এ ক্ষেত্রে চোখ ও গ্যাংগ্লিয়ন মিলে একটি

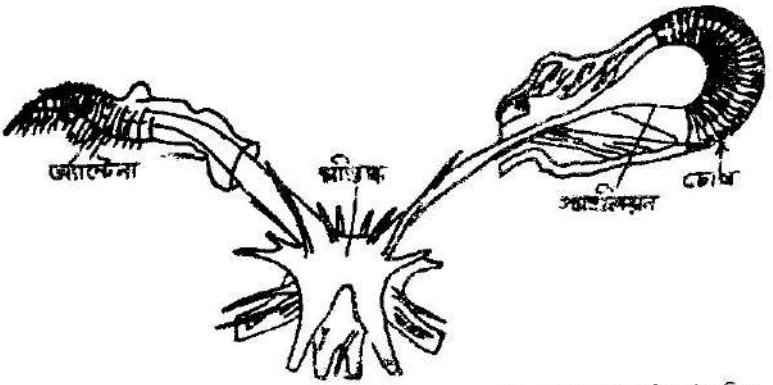

চিত্র ৬: ***Palinurus***-এ কর্তিত চোখের স্থানে একটি অ্যান্টেনার হেটারোমরফিক পুনরুৎপত্তি (Balinsky, ১৯৮১ অনুসরণে)।

পুনরুৎপত্তি সীমা বা ক্ষেত্র গঠন করেছে। এই সীমার একটি অংশও যদি অক্ষত থাকতো তাহলে সম্পূর্ণ তন্ত্রটি পুনর্গঠিত হতো। যেহেতু পুরো সীমানাই হারিয়ে গেছে, তাই অঙ্গটিকে আর কোনদিন ফিরে পাওয়া যাবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

অ্যাসিডীয়দের পরিস্ফুটন

প্রজননতন্ত্র

অ্যাসিডীয় প্রাণীরা উভলিঙ্গী। কোন কোন অ্যাসিডিয়ায় মুখ্য জননাঙ্গরূপে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় সুস্পষ্ট পৃথক হলে কিছু প্রাণীতে তেমন বিভক্তি ঘটেনি, যেমন-***Herdmania***, ***Ascidia***-র শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় দেহের বামপাশে অন্ত্রের প্যাঁচের মধ্যে অবস্থিত। তবে Molgulidae ও Cynthiidae গোত্রের কিছু প্রাণী এবং ***Herdmania***-য় জননাঙ্গগুলো দেহের দু'দিকেই বিন্যস্ত। অন্যদিকে, ***Polycarpa***-য় একাধিক পূর্ণাঙ্গ পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্র রয়েছে।

Herdmania-র জননাঙ্গ দুটি বেশ বড় এবং ম্যান্টলে শায়িত থেকে অ্যাট্রিয়াল গহ্বরে উদ্গত থাকে। ডান জননাঙ্গ পেরিকার্ডিয়ামের ঠিক পিঠের দিকে সমান্তরালে আর বাম জননাঙ্গ অন্ত্রের ফাঁসের মধ্যে অবস্থিত। ***Ascidia***-র কথা আগেই বলা হয়েছে যে, শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় দেহের বাঁপাশে অন্ত্রের প্যাঁচের মধ্যে থাকে।

Herdmania-র পরিণত জননাঙ্গ লম্বাটে, ছোট ছোট খণ্ডবিশিষ্ট এবং উভলিঙ্গী গ্রন্থির মতো। এর দৈর্ঘ্য ৩-৪ সে. মি., প্রস্থ ১ সে.মি এবং পুরুত্ব ২-৩ মি.মি.।

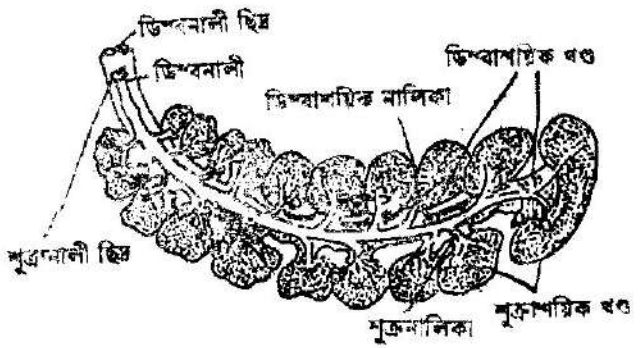

চিত্র ৭ : ***Herdmania***-র বাম জননাঙ্গ (Kotpal, ১৯৮৭ অনুসরণে।)

এতে একটি কেন্দ্রীয় অক্ষের দু'পাশে দু'সারিতে ১০-২০টি গোল খণ্ডযুক্ত থাকে। একেবারে শীর্ষে যে খণ্ডটি থাকে তা সবচেয়ে বড় ও বেজোড় এবং দেখতে অর্ধচন্দ্র বা মটরশুঁটির মতো (চিত্র ৭)। প্রত্যেকটি খণ্ডের বাইরের দিক বড় ও লাল

বর্ণের। এর নাম শুক্রাশয়িক অঞ্চল। আর ভিতরের দিকটি ছোট ও ফ্যাকাশে। একে ডিম্বাশয়িক অঞ্চল বলে। তাই জননাঙ্গের প্রত্যেকটি খণ্ডকে ডিম্বশুক্রাশয় বা উভলিঙ্গী গ্রন্থি নামেও অভিহিত করা হয়।

প্রত্যেকটি জননাঙ্গে দুটি করে নালী থাকে, এর একটি ডিম্বনালী, অন্যটি শুক্রনালী। জননাঙ্গের কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর নালী দুটি অগ্রসর হয়। ডিম্বনালী একটু বেশি প্রশস্ত এবং প্রত্যেক খণ্ডের ডিম্বাশয়িক অঞ্চল থেকে আগত নালিকা জননাঙ্গ ছাড়িয়ে সামান্য দূরেই অবসারণীতে বা অ্যাট্রিয়াল গহ্বরের পিঠের দিকে পায়ুছিদ্রের কিছুটা পিছনে একটি রন্ধ্রপথে গিয়ে শেষ হয়; রন্ধ্রটি চারটি পুরু ঝালরে রক্ষিত থাকে। অন্যদিকে শুক্রনালীও প্রত্যেক খণ্ড থেকে আগত নালিকা নিয়ে গঠিত হয়ে অবসারণীতে গিয়ে ডিম্বনালী ছিদ্রের সামান্য পিছনে উন্মুক্ত হয়। শুক্রনালী ও ডিম্বনালী উভয়ের অভ্যন্তর-ভাগই সিলিয়ায় মোড়া থাকে।

Ascidia-র ডিম্বাশয়টি অসংখ্য ছোট ছোট শাখা নিয়ে গঠিত। এর ভিতরে একটি সিলোম থেকে উদ্ভূত গহ্বর থাকে। ডিম্বনালীটি এই গহ্বর থেকে শুরু হয়ে মলাশয়ের ধার ঘেঁষে পায়ুছিদ্রের ঠিক পিছনে অ্যাট্রিয়াল গহ্বরে শেষ হয়েছে। শুক্রাশয়ও অসংখ্য ছোট ছোট নালিকায় গঠিত। নালিকাগুলো ডিম্বাশয় ও পার্শ্ববর্তী অঙ্গগুলোর উপরে বিস্তৃত। শুক্রনালীটি ডিম্বনালীর পাশেই অবস্থান করে কিন্তু এর আকার ছোট এবং ডিম্বনালী ছিদ্রের ঠিক পিছনেই উন্মুক্ত।

জননকোষ

সরল অ্যাসিডীয়দের ডিম্বাণু মাইক্রোলেসিথাল ও আইসোলেসিথাল ধরনের এবং ০·১—০·২ মি.মি. ব্যাসের হয়ে থাকে। এদের সাইটোপ্লাজম সুগঠিত, সুবিভেদিত এবং চমৎকার মেরুকরণও প্রদর্শন করে।

সরল অ্যাসিডীয়র পরিপক্কমান ডিম্বাণুর পরিধীয় সাইটোপ্লাজম কুসুমহীন ও স্বচ্ছ। ***Ciona, Ascidia*** এসব প্রাণীতে বর্ণহীন, কিন্তু ***Stylea*** ও ***Boltenia***-য় রঙিন। ***Stylea partita***-য় তা হলুদ দানাময়, ***Boltenia echinata***-য় কমলা বর্ণের। ডিম্বাণুর কেন্দ্রীয় সাইটোপ্লাজমীয় এলাকা কালচে ধূসর রঙের। এতে কুসুম দানা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো থাকে। ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসটি বেশ বড় এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মধ্যেই, কিন্তু ঠিক কেন্দ্রে না থেকে সরে গিয়ে পরিধীয় সাইটোপ্লাজমের নিচে এসে অবস্থান নেয়। ডিম্বাণুর এই অংশকে প্রাণী মেরু, আর বিপরীত অংশকে ভেজিটাল মেরু বলে।

ডিম্বাণুর চারদিকে কয়েক সারি ঝিল্লী থাকে। একেবারে বাইরের স্তরটি চাপা কোষে নির্মিত। কোষগুলোকে আদি ফলিকল কোষ বলে। অধিকাংশ প্রজাতিতে

ডিম্বাশয়ের অবিভেদিত কোষ থেকে এগুলোর সৃষ্টি হয়। এদের উপরতলে একটি ভিত্তি পর্দা থাকে। ফলিকল কোষগুলো বিভক্ত হয়ে দ্রুত একটি ঘনাকার কোষের

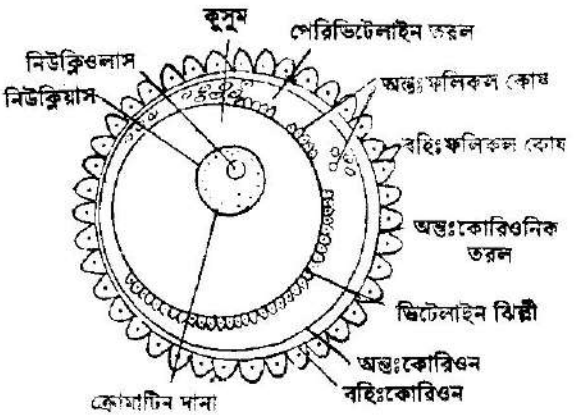

চিত্র ৮ ক : *Herdmania*-র একটি পরিপক্ব ডিম্বাণু (Kotpal, ১৯৮৯ অনুসরণে)

গোলক নির্মাণ করে। কিছু কোষ গোলকের ভিতরে প্রবেশ করে ডিম্বাণুতলে একটি স্তর সৃষ্টি করে। অন্যেরা সেই স্তর ভেদ করে কুসুমের বহিঃতলে অবস্থান নেয়। ডিম্বাণু-তলের কোষস্তরকে টেস্ট কোষ (test cell) বলে। পরে তারা বহির্তলে কোরিওন (chorion) নামে একটি গঠন-বিহীন পাতলা স্তর সৃষ্টি করে। এর নিচে একটি জিলেটিনময় (gelatinous) স্বচ্ছ স্তর (চিত্র ৮ ক) থাকে। এই স্তরে ধ্বংসপ্রাপ্ত টেস্ট কোষ বিক্ষিপ্ত ছড়ানো থাকে। এ সময় ফলিকল কোষ ও ভিত্তিপর্দার মাঝখানে চাপা এপিথেলীয় কোষের একটি স্তর আবির্ভূত হয়। ডিম্বপাতের আগেই ভিত্তিপর্দার সাথে এই স্তরও দূরীভূত হয়ে যায়। প্রায় সব সরল অ্যাসিডীয়দের (যাদের পরিস্ফুটন ঘটে প্রাণিদেহের বাইরে) ফলিকল কোষের

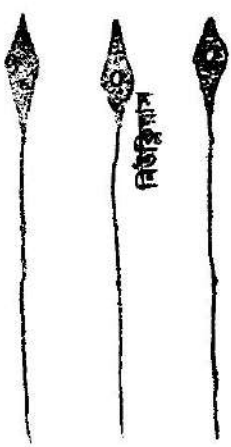

চিত্র ৮ খ : *Herdmania*-র বিভিন্ন ধরনের শুক্রাণু (Kotpal, ১৯৮৯ অনুসরণে)

প্রোটোপ্লাজম গহ্বরযুক্ত হওয়ায় দেখতে ফেনায়িত মনে হয়। কোষগুলো বড় আকার ধারণ করে ডিম্বাণুতল থেকে পিড়কের মত উৎগত হয়। এভাবে ফলিকল কোষ ডিম্বাণুকে পানিতে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে।

বিভিন্ন বই-পুস্তকে অ্যাসিডীয়দের শুক্রাণু সম্বন্ধে তেমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে কিছু সাম্প্রতিক ভারতীয় গ্রন্থে ***Herdmania***-র শুক্রাণু সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, এখানে তারই উদ্ধৃতি দেয়া হলো। জননাঙ্গের শুক্রাশয়িক অংশ থেকে আণুবীক্ষণিক, প্রায় ৪ মাইক্রা লম্বা শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। আদর্শ শুক্রাণুর মতো এদের দেহও তিনটি অংশে বিভক্ত—মাথা, মধ্যমাংশ বা গ্রীবা ও লেজ। মাথাটি প্রশস্ত ও নিউক্লিয়াসযুক্ত। এর সামনে একটি ঠোঁটের মতো অ্যাক্রোসোম থাকে লেজটি লম্বা ও সোজা। অ্যাক্রোসোমের গঠন অনুযায়ী শুক্রাণু তিন ধরনের—

(১) অ্যাক্রোসোমের দৈর্ঘ্য মাথার চেয়ে খাটো ;
(২) অ্যাক্রোসোমের দৈর্ঘ্য মাথার সমান; এবং
(৩) অ্যাক্রোসোমের দৈর্ঘ্য মাথার চেয়ে লম্বা (চিত্র ৮খ)।

নিষেক

অধিকাংশ সরল অ্যাসিডীয়তে বহিনিষেক ঘটে। উভলিঙ্গী হওয়া সত্ত্বেও ওদের কখনও স্বনিষেক ঘটে না। কারণ ডিম্বাণু ও শুক্রাণু পর্যায়ক্রমে পরিণত হয়। অবশ্য একই সময় পরিপক্ব হলেও স্বনিষেক হয় না। পরীক্ষা করেও দেখা গেছে, একই প্রাণীর শুক্রাণু ও ডিম্বাণু দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষেক ঘটানো যায় না।

অ্যাট্রিয়াল গহ্বর থেকে ডিম্বাণু বের হওয়ার পরপরই সাধারণত Ascidiacea শ্রেণীভুক্ত সদস্যে নিষেক সম্পন্ন হয়। তবে কিছু সরল এবং অধিকাংশ জটিল অ্যাসিডীয়র নিষেক দেহের ভিতরেই ঘটে, যেমন—অ্যাট্রিয়াল গহ্বরে, ডিম্বনালীর স্ফীত প্রান্তদেশে বা অ্যাট্রিয়াল গহ্বরে বিশেষভাবে গঠিত শাবক থলি (Brood sac) -তে। এসব ক্ষেত্রে, নিষেকের পরপরই জাইগোট দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় (যেমন—***Polycarpa***)। অনেকে আবার জাইগোটকে ২–৩২ কোষী দশা পর্যন্ত (যেমন—***Polycarpa pomaria***)। কিংবা লেজবিশিষ্ট লার্ভার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত দেহের ভিতরে রেখে দেয়।

পুষ্টি, শ্বসন ও অন্যান্য কাজের জন্য পানির যে ধারা দেহের ভিতরে প্রবেশ করে তার মাধ্যমে অন্য কোন সদস্যের জননকোষ বাহিত হয়ে অ্যাট্রিয়াল গহ্বরে প্রবেশ করলে সিলীয় মৌখিক সাইফন কিছু জননকোষ (ডিম্বাণু বা শুক্রাণু)

পানির স্রোত থেকে ধরে রাখে। দেহের ভিতর এদের উপস্থিতির জন্য নিউরাল গ্রন্থি থেকে এক ধরনের রস নিঃসৃত হয়। এই করণ মেরুদণ্ডী প্রাণীর পিটুইটারি গ্রন্থির সামনের অংশ থেকে নিঃসৃত গোনাডোট্রোপিক হরমোনের মতোই। নিউরাল গ্রন্থির করণে আশেপাশের স্নায়ু-গ্যাংগলিওনগুলো উজ্জীবিত হয়ে জননাঙ্গগুলোকে জননকোষ স্খলনের স্নায়ু উদ্দীপনা প্রেরণ করে। এভাবে নিষেক নিশ্চিত করার জন্য একই স্থানে অবস্থিত অ্যাসিডীয়দের জননকোষ একই সময়ে স্খলনের কাজ সমন্বিত হয়।

সাধারণত ডিম্বাণুর ভেজিটাল মেরুতেই শুক্রাণু প্রবেশ করে। শুক্রাণু প্রবেশের পরপরই ডিম্বাণুর পরিপক্কতা বিভাজন সম্পন্ন হয় এবং ডিম্বাণু-সাইটোপ্লাজমে চলন ঘটতে থাকে। এভাবে ডিম্বাণুতে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শুক্রাণু প্রবেশের সাথে সাথে ডিম্বাণুর পরিধীয় হলুদ হায়ালোপ্লাজম স্তর দ্রুত ভেজিটাল মেরুর দিকে ধাবিত হয়। তখন নিউক্লিয়াসের চারদিকে সামান্য পরিমাণ স্বচ্ছ সাইটোপ্লাজম থাকে, বাকি সাইটোপ্লাজম ভেজিটাল মেরুর দিকে হলুদ হায়ালোপ্লাজম ও কুসুমবাহী ধূসর সাইটোপ্লাজমের মাঝখানে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

স্বচ্ছ ও হলুদ সাইটোপ্লাজম ভেজিটাল মেরুতে জমা হওয়ার পর শুক্রাণু-নিউক্লিয়াস ভেজিটাল মেরু ছেড়ে উপরের দিকে ডিমের একপাশে যাওয়া শুরু করে। এই সময়ের মধ্যে ডিম্বাণুর পরিপক্কতা বিভাজন শেষ হয়। ডিম্বাণু-নিউক্লিয়াস শুক্রাণু-নিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য নিরক্ষরেখার ঠিক নিচে নেমে আসে। শুক্রাণু নিউক্লিয়াস চলার সময় সাথে করে কিছু হলুদ ও স্বচ্ছ সাইটোপ্লাজম নিয়ে যায়। হলুদ সাইটোপ্লাজম তখন ডিম্বাণুর নিরক্ষরেখার ঠিক নিচে একটি হলুদ অর্ধচন্দ্র গঠন করে। এই অর্ধচন্দ্রের মধ্যবিন্দু ভ্রূণের পিছনের প্রান্ত নির্দেশ করে। খুব শীঘ্রই হলুদ অর্ধচন্দ্রের ঠিক উপরে সুস্পষ্ট স্বচ্ছ সাইটোপ্লাজমের অর্ধচন্দ্র গঠন আবির্ভূত হয়।

স্বচ্ছ ও হলুদ সাইটোপ্লাজম ভেজিটাল মেরুতে চলে যায়, আর কুসুম দানাগুলো ডিমের কেন্দ্র থেকে প্রাণী মেরুতে সরে আসে। হলুদ ও স্বচ্ছ অর্ধচন্দ্র সৃষ্টি হলে কুসুম ভেজিটাল মেরুতে এসে অবস্থান নেয়। পরে প্রথম ক্লিভেজের সময় হলুদ অর্ধচন্দ্রের উল্টোদিকে ধূসর অর্ধচন্দ্র নামে আরেকটি অর্ধচন্দ্র সৃষ্টি হয়।

নিষেকের ফলে ডিম্বাণু উপাদানে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তাতে চারটি সুনির্দিষ্ট এলাকা গড়ে উঠে; যথা —

(১) স্বচ্ছ সাইটোপ্লাজমের উপরের অর্ধগোলক। এতে খুব সামান্য পরিমাণ কুসুম ও মাইটোকনড্রিয়া থাকে।

(২) পশ্চাৎ-অক্ষীয় হলুদ অর্ধচন্দ্র।

(৩) সম্মুখ-পৃষ্ঠীয় ধূসর অর্ধচন্দ্র।

(৪) কুসুমযুক্ত ধূসর সাইটোপ্লাজম। এতে অসংখ্য মাইটোকনড্রিয়াও আছে। এভাবে নিষিক্ত ডিম্বাণুতে দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভাগ্য-মানচিত্র

নিষিক্ত ডিম্বাণু স্বাভাবিক রঞ্জকেই রঞ্জিত হওয়ায় উপরে উল্লিখিত চারটি অঞ্চলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে বেশ সঠিক মন্তব্য করা যায়।

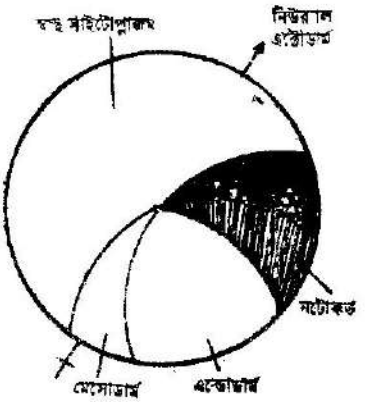

চিত্র ৯ : একটি অ্যাসিডীয় *Styela*-র নিষিক্ত ডিম্বাণুর ভাগ্য-মানচিত্র। তীর চিহ্ন অগ্র-পশ্চাৎ অক্ষ নির্দেশক। (Verma *et al*., ১৯৮০ অনুসরণে)

Styela-র নিষিক্ত ডিম্বাণুর ভাগ্য-মানচিত্রে (চিত্র ৯) উপরের স্বচ্ছ সাইটোপ্লাজম হচ্ছে ভাবী এপিডার্মিস, হলুদ অর্ধচন্দ্র মেসোডার্ম এবং গাঢ় ধূসর কুসুম-যুক্ত সাইটোপ্লাজম হচ্ছে এন্ডোডার্ম। ধূসর অর্ধচন্দ্রের সাইটোপ্লাজমকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়–উপরের অংশ নিউরাল এক্টো-ডার্ম এবং নিচের অংশ নটোকর্ড।

ক্লিভেজ ও ব্লাস্টুলেশন

জাইগোট বিভক্তি হলোব্লাস্টিক ও প্রায় সমান ধরনের। কিন্তু আটকোষী পর্যায়ে চারটি কোষ ছোট ও চারটি বড় আকারের। ছোট কোষগুলো ভবিষ্যত পিঠে অবস্থান করে এবং এন্ডোডার্মের সূচনা করে। বড় কোষগুলো এক্টোডার্মের অধিকাংশ গঠন করে। পরবর্তী ধাপগুলোতে এক্টোডার্ম কোষ এন্ডোডার্ম কোষের চেয়ে তাড়াতাড়ি বিভক্ত হয়ে আরও ছোট ছোট কোষে পরিণত হয়।

ষোলকোষী পর্যায়ে ভ্রূণ একটি চাপা ব্লাস্টুলায় উপনীত হয়। একে প্ল্যাকুলা (placula) বলে। এর একদিকে এক্টোডার্ম ও অন্যদিকে এন্ডোডার্ম এবং মাঝখানে একটি ছোট সেগমেন্টেশন গহ্বর (segmentation cavity) থাকে (চিত্র ১০ ক)।

গ্যাস্ট্রুলেশন

ইনভেজিনেশন প্রক্রিয়ায় গ্যাস্ট্রুলেশন সম্পন্ন হয়। এ সময় এন্ডোডার্ম কোষের চেয়ে এক্টোডার্ম কোষগুলো দ্রুত বিভক্ত হয়; সম্পূর্ণ ভ্রূণটি এন্ডোডার্মের

অংশে একটি অবতলসহ বেঁকে যায়। এক্টোডার্ম অন্তঃত্বকের উপর প্রসারিত হয়। স্তর দুটি পরস্পরের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে চলে এলে সেগমেন্টেশন গহ্বরের বিলুপ্তি ঘটে। অবতল অংশটি আরও গভীর হয়ে আর্কেন্টেরনের রূপ নেয়। তখন প্রশস্ত ব্লাস্টোপোর যুক্ত ভ্রূণটি পেয়ালার মতো গ্যাস্ট্রুলায় পরিণত হয়। ব্লাস্টোপোর ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকে (চিত্র ১০ খ)। এই সংকোচন সামনে শুরু হয়ে পিছনে ছড়িয়ে পড়ে, পরিশেষে পৃষ্ঠীয় তলের পিছনের প্রান্তে একটি ছোট রন্ধ্রে পরিণত হয়।

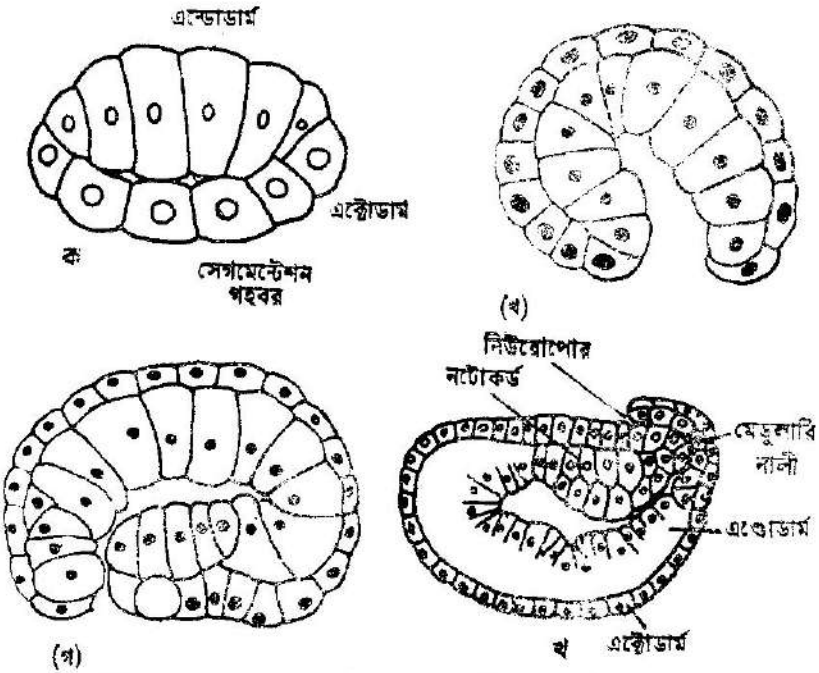

চিত্র ১০: ***Clavellina***-র পরিস্ফুটনের প্রাথমিক ধাপ (ক) চালা ব্লাস্টুলা; (খ) প্রাথমিক গ্যাস্ট্রুলা; (গ) অপেক্ষাকৃত অগ্রসর গ্যাস্ট্রুলা এবং (ঘ) গ্যাস্ট্রুলায় মেডুলারি নালী সৃষ্টি (Parker and Haswell, ১৯৬৪ অনুসরণে)।

টিউবুলেশন

ভ্রূণটি ভবিষ্যত লম্বা অক্ষ বরাবর প্রলম্বিত হয়। তখন চাপা ও উত্তল অংশ দেখে যথাক্রমে দেহের পিঠ ও বুক সনাক্ত করা যায়। ব্লাস্টোপোর ঘিরে অবস্থিত

এক্টোডার্ম কোষগুলোকে ঘনক্ষেত্রের মতো আকৃতি দেখে সহজেই অন্যান্য কোষ থেকে আলাদা করা যায়। এ কোষগুলো স্নায়ুতন্ত্রের প্রথম অঙ্কুর গঠন করে। ব্লাস্টোপোর সংকুচিত হওয়ার সময় সেগুলো পিঠের দিকে মেডুলারি প্লেট (medullary plate) রূপে সজ্জিত হয়। প্লেটে একটি খাদের আবির্ভাব ঘটে যা ডান ও বাম মেডুলারি ভাঁজে (medullary fold) আবদ্ধ থাকে।

মেডুলারি ভাঁজ মেডুলারি খাতের উপর দিয়ে ঊর্ধ্ব-নিম্নমুখী হয়ে বৃদ্ধি পায় এবং পরে পরস্পর সংযুক্ত হয়। এই সংযুক্তি পিছনে সংঘটিত হয়ে এমনভাবে সামনে এগিয়ে আসে যার ফলে নিউরোসিল (neurocoel) নামে একটি নালীর সৃষ্টি হয়। নিউরোসিলের পিছনের অংশই হচ্ছে ব্লাস্টোপোর। মেডুলারি খাদের এই বন্ধকরণ কৌশলে ব্লাস্টোপোরের পিছনের অংশ ঘিরে অতিক্রমকারী ভাঁজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিউরোসিলের পিছনের অংশের উপর দিয়ে ভাঁজ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্লাস্টোপোর এভাবে মেডুলারি নালীতে আবদ্ধ হয়ে কিছু সময়ের জন্য নিউরেন্টেরিক নালী (neurenteric canal) নামে একটি ছোট রন্ধ্র হিসেবে অবস্থান করে। এই ছিদ্রের সাহায্যে নিউরোসিল ও এন্টেরিক গহ্বর সংযোগ রক্ষা করে। মেডুলারি নালীর সামনের প্রান্তে অসম্পূর্ণ বন্ধকরণের জন্য সেখানে নিউরোপোর (neuropore) নামে একটি ছিদ্র থাকে। ছিদ্রটি বাইরে উন্মুক্ত।

পিঠের দিকে মাঝরেখা বরাবর অবস্থিত আর্কেন্টেরন প্রাচীরের কতকগুলো কোষ থেকে নটোকর্ড সৃষ্টি হয় (চিত্র ১০ গ ও ঘ)। কোষগুলো বিন্যস্ত হয়ে একটি লম্বা কোষরজ্জু গঠন করে। রজ্জুটি আর্কেন্টেরন প্রাচীরের এণ্ডোডার্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে আর্কেন্টেরন ও মেডুলারি খাদের মাঝখানে অবস্থান করে।

পাশের দিকে কিছু এণ্ডোডার্ম কোষ বিভক্ত হয়ে একজোড়া অনুদৈর্ঘ্য কোষীয় সূত্র গঠন করে। ওরা হচ্ছে ভাবী মেসোডার্ম। মেসোডার্মের উৎপত্তির সময় আর্কেন্টেরন থেকে কোন প্রবর্ধন বের হয় না।

ভ্রূণের আকার পেয়ালার মতো (চিত্র ১১)। এর সরু অংশটি হচ্ছে ভাবী লেজ। সরু অংশ লম্বা হওয়ার সময় এর এন্টেরিক গহ্বরের অংশ দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন ভিতরে শুধু এণ্ডোডার্ম কোষে ভরা থাকে।

লেজ অঞ্চল তাড়াতাড়ি লম্বা হতে থাকে। গোলাকার দেহকাণ্ড অঞ্চল ডিমের আকার ধারণ করে। এর সামনের দিকে এক্টোডার্ম থেকে তিনটি উদ্গত অংশের উৎপত্তি হয়। এগুলো হচ্ছে ভাবী আঠালো পিড়কা। এদের সাহায্য নিয়ে লার্ভা পরে নিশ্চল জীবনে প্রবেশ করে। এক্টোডার্ম কোষগুলো প্রথম দিকেই সেলুলোজ টেস্ট নির্মাণের উপাদান নিঃসৃত করে। লেজ অঞ্চলে টেস্ট উপরে ও নিচের দিকে

দুটি ঝালরের মতো অংশের সৃষ্টি করে। অংশ দুটি তখন বেজোড় পাখনার মতো কাজ করে।

মেডুলারি নালীর সামনের অংশ বড় হয়ে একটি সংবেদ থলিকা; আর পিছনের সরু অংশ স্নায়ুরজ্জু গঠন করে। সংবেদ থলিকার ভার্ভার সংবেদ অঙ্গ—স্ট্যাটোসিস্ট ও চোখ বা অসেলাস থাকে।

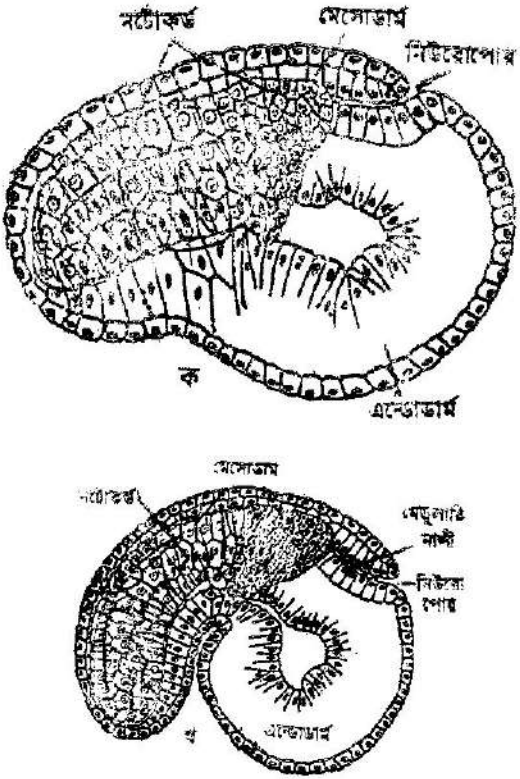

চিত্র ১১ : ***Clavellina***-র পরিস্ফুটনের দুটি পরবর্তী ধাপ (ক) ভার্ভার মেডুলারি নালী বেষ্টিত হয়েছে এবং (খ) সুস্পষ্ট লেজকুড়ি সুগঠিত মেসোডার্ম স্তর ও নটোকর্ডসহ ভার্ভা। (Parker and Haswell, ১৯৬৪ অনুসরণে)।

ভ্রূণীয় পৌষ্টিক নালী দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। প্রশস্ত অংশটি থাকে নটোকর্ডের সামনে, আর সরু অংশটি তার পিছনে নটোকর্ড অঞ্চলে। প্রশস্ত অংশ থেকে গলবিল এবং সরু অংশ থেকে গলনালী, পাকস্থলী ও অন্ত্রের উৎপত্তি হয়। ডিম

ফুটে ভ্রূণ বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই মুখের সৃষ্টি হয়। প্রথমে সামনের প্রান্তে একটি এক্টোডর্মীয় ইনভেজিনেশন সৃষ্টি হলে আর্কেনটরন থেকে একটি এক্টো-ডার্মীয় অংশ বের হয়ে তার সাথে মিলিত হয়। দুটি অংশই একসাথে মুখছিদ্র গঠন করে। অধিকাংশ প্রজাতির লার্ভায় পাকস্থলী ও অন্ত্র নিরেট হওয়ায় কোন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না।

আর্কেনটেরন থেকে প্রথমে একটি ফাঁপা বৃদ্ধির মতো হৃৎপিণ্ড ও পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর সৃষ্টি হয়। এই বৃদ্ধি পরে আলাদা হয়ে একটি দু'প্রাচীরবিশিষ্ট থলি গঠন করে। এর ভিতরের প্রাচীর থেকে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর, আর বাইরের প্রাচীর থেকে পেরিকার্ডিয়ামের প্রাচীর সৃষ্টি হয়।

এক্টোডার্মের একজোড়া ইনভেজিনেশন থেকে অ্যাট্রিয়াল গহ্বরের সূচনা হয়। ইনভেজিনেশন দুটি ভিতর দিকে আরও বড় হয়ে একজোড়া থলিতে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি থলি একেকটি ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত। অ্যাট্রিয়াল গহ্বর সৃষ্টিতে এক্টোডার্ম ও এণ্ডোডার্ম কোনটি কতটুকু অংশ নেয় তা সঠিক আজও জানা যায় নি। যাহোক, ফাঁকা স্থান অবশেষে গলবিলের চারদিকে বৃদ্ধি পেয়ে অ্যাট্রিয়াল গহ্বর সৃষ্টি করে। গলবিলের গায়ে যে দুটি ছিদ্র (ভবিষ্যত স্টিগমাটা) থাকে তা দিয়ে গলবিল চারদিকের ফাঁকাস্থানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। অ্যাট্রিয়াল থলির ছিদ্র দুটি পরে এক সাথে মিলে একটি স্থায়ী অ্যাট্রিয়াল ছিদ্রে পরিণত হয়।

আরও কিছু পরিস্ফুটনের পর ভ্রূণ যখন একটি অ্যাসিডীয় ট্যাডপোল লার্ভায় উপনীত হয় তখন ডিমের আবরণ ছিঁড়ে তা মুক্ত সাঁতারু লার্ভা হিসেবে বেরিয়ে আসে।

লার্ভা জীবন

অ্যাসিডীয়দের পূর্ণ গঠিত, লম্বাটে ও নলাকার লার্ভাকে ট্যাডপোল লার্ভা (Tadpole larva) বলে (চিত্র ১২)। দেখতে ছোট ব্যাঙাচির মতো। এর দেহকে ধড় ও লেজ এই দু'অংশে ভাগ করা যায়।

ধড়

লার্ভায় সামনের দিকের বড় ডিম্বাকার অংশটি হচ্ছে ধড়। এতে নিম্নলিখিত অংশগুলো পাওয়া যায়—

(১) ধড়ের গ্যাংগলিওন,
(২) নিউরাল গ্রন্থি,
(৩) পৌস্টিক নালী,

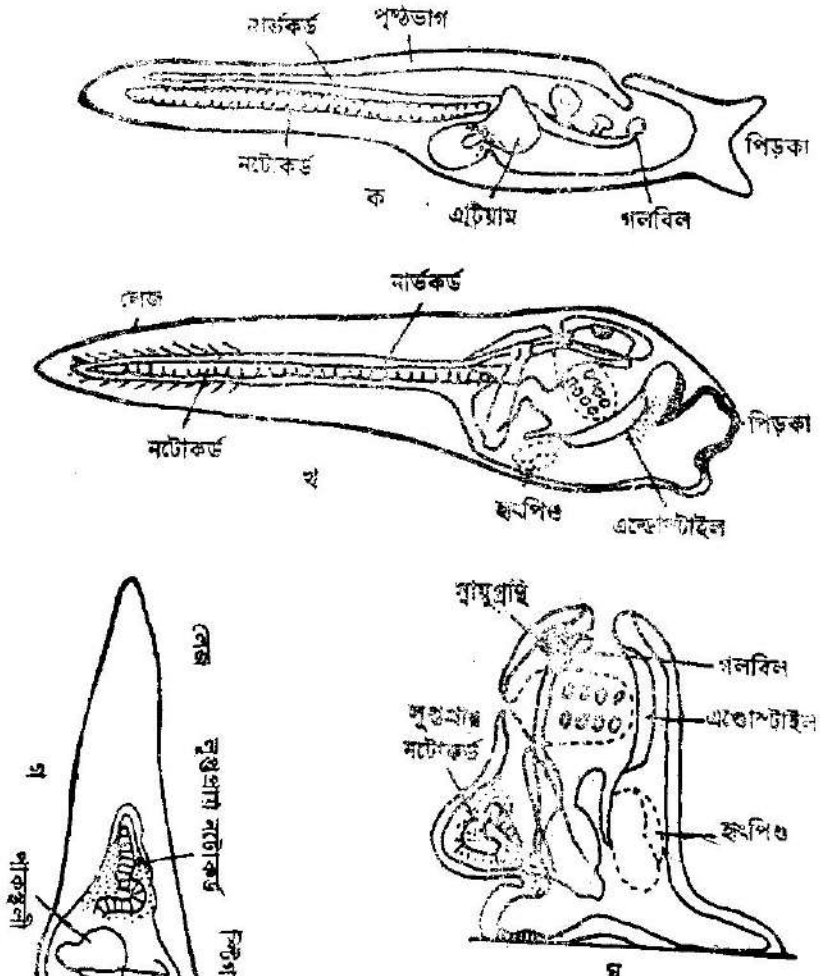

চিত্র ১২ : ***Ascidia***-র ব্যাঙাচি এবং তার প্রতীপ রূপান্তর (ক) ডিমের আবরণী থেকে নির্গত হবার পর মুক্ত লার্ভা : (খ) কোন বস্তুর সাথে আবদ্ধ হবার পূর্বের অবস্থা (গ) কোন বস্তুর সাথে আবদ্ধ হবার পরের অবস্থা ; (ঘ) সংযুক্ত লার্ভার পরের পর্যায় (কবের, ১৯৮২ থেকে) ।

(৪) অ্যাট্রিয়াল গহ্বর,
(৫) হৃৎপিণ্ড এবং
(৬) আঠালো প্যাপিলী বা পিড়ক।

(১) ধড়ের গ্যাংগলিওন : ধড় অংশের স্নায়ুরজ্জু স্ফীত হয়ে এই গ্যাংগলিওন সৃষ্টি করেছে। পরে তা আরও সামনে একটি পাতলা প্রাচীরে ঘেরা সংবেদ থলিকা (Sensory or cerebral vesicle) গঠন করে। এই থলিকার ভিতরে থাকে একটি অসেল্লাস (Ocellus) বা চোখ ও একটি অটোলিথবাহী স্ট্যাটোসিস্ট (Eakin and Kuda, ১৯৭৯)। থলিকার পিছনের প্রাচীরে অসেলাস অবস্থিত (চিত্র ১২ ক)। একটি লেন্স কোষ, একটি রঞ্জক কোষ ও একটি রেটিনা নিয়ে অসেলাস গঠিত। রঞ্জক কোষে অনেক মেলানিন দানা থাকে। রেটিনা কোষ থেকে বর্ধিত অংশ বের হয়ে রঞ্জক কোষে প্রবেশ করে। এগুলো অনেকটা মেরুদণ্ডী চোখের বড় কোষের মতোই।

(২) নিউরাল গ্রন্থি : ধড় গহ্বরের সামনের প্রান্ত থেকে এই গ্রন্থি একটি সিলীয় বৃদ্ধি হিসেবে প্রকাশিত হয় এবং সংবেদ থলিকার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে অবস্থান করে।

(৩) পৌষ্টিক নালী : লার্ভায় পৌষ্টিক নালী মোটামুটি সুগঠিত এবং গলবিল গলনালী, পাকস্থলী ও অন্ত্রে বিভক্ত। কিন্তু লার্ভার মুখ তখনও টেস্টের অভিন্ন আবরণে আবৃত থাকায় সেসব অঙ্গ কোন কাজে আসে না। গলবিলের তলদেশ ইতিমধ্যেই প্রায় পূর্ণ গঠিত একটি এণ্ডোস্টাইল বহন করে। এর প্রাচীরেও কয়েকটি স্টিগমাটা থাকে।

(৪) অ্যাট্রিয়াল গহ্বর : অ্যাট্রিয়াল গহ্বর আবির্ভূত হয় সামনের দিকে। ভ্রূণ অবস্থায় যে একজোড়া পৃষ্ঠ-পার্শ্বীয় ইনভেজিনেশন ভিতরের দিকে থলির মতো হয়ে গলবিল ঘিরে রেখেছিল সেগুলোই এখন পিছনে মিলিত হয়েছে, আর বাইরে উন্মুক্ত হয়েছে একটিমাত্র অ্যাট্রিয়াল ছিদ্রপথে।

(৫) হৃৎপিণ্ড ও পেরিকার্ডিয়াম : পৌষ্টিক নালী থেকে একটি ফাঁপা বৃদ্ধি বের হয়ে পেরিকার্ডিয়ামে পরিণত হয়। এর পিঠের প্রাচীর থেকে একটি ইনভেজিনেশন-রূপে হৃৎপিণ্ডের উৎপত্তি হয়।

(৬) আঠালো প্যাপিলী : গায়ের দেহ জুড়ে থাকা টেস্ট মুখের নিচে কয়েকটি গ্রন্থিময় পিড়ক গঠন করে। লার্ভা পরে এই পিড়কগুলোর সাহায্যে কোন নিশ্চল শক্ত দ্রব্যের সাথে সংস্থাপিত হয়ে রূপান্তরের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

লেজ

ধড়ের পিছনের সরু, লম্বা ও দু'পাশে চাপা অংশকে লেজ বলে। লেজের মধ্যে নিম্নলিখিত অংশ পাওয়া যায়—

(১) পুচ্ছ পাখনা
(২) নটোকর্ড
(৩) স্নায়ুরজ্জু ও
(৪) পেশীকোষ।

(১) পুচ্ছ পাখনা : লেজের দু'পাশের দুটি ঝালরের মতো অংশই পুচ্ছ পাখনা। টেস্ট পাতলা ও নমনীয় পর্দার মতো বেড়ে গিয়ে এই পাখনা নির্মাণ করে। এর ভিতরে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত সূক্ষ্ম সুতার মতো অংশগুলো হচ্ছে পাখনা রশ্মি।

(২) নটোকর্ড : নটোকর্ডটি সুদৃঢ় ও নলাকার এবং লেজের সবটুকু দৈর্ঘ্য জুড়ে থাকে। এর ভিতরে ৪০-৪২টি বড়, গহ্বরপূর্ণ ও নলাকার কোষের একটি সারি থাকে। কোষ সারির চারদিক একটি যোজক কলাতন্তুর আবরণে মোড়া। কোষ আর আবরণ মিলেই নটোকর্ডটি গঠিত। এটি ধড়ের পিছনের অংশে মলাশয়ের কাছে পর্যন্ত প্রসারিত, কখনই গলবিলকে ছাড়িয়ে যায় না।

(৩) স্নায়ুরজ্জু : স্নায়ুরজ্জুটি ফাঁপা ও পৃষ্ঠীয়, এবং তা সংবেদ থলিকা থেকে বের হয়ে নটোকর্ডের উপর দিয়ে সমান্তরালে লেজের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছায়। এর যে অংশ ধড়ের মধ্যে থাকে তা প্রায় নিরেট কিন্তু লেজের অংশটি সরু ও ফাঁপা, এর কোষগুলোও স্নায়ুকোষের মতো নয়।

(৪) পেশী কোষ : নটোকর্ডের দু'পাশে তিন সারি করে মোট ৩৬টি পেশী কোষ রয়েছে। প্রত্যেকটি কোষ বেশ বড় আকারের। এদের কিনারায় আছে অনেকগুলো আড়াআড়ি সূক্ষ্ম আঁইশের মতো মায়োফাইব্রিল (myofibril) ও ভিতরে গহ্বরপূর্ণ সাইটোপ্লাজম।

সাঁতার দেয়ার সময় বাম ও ডান দিকের কোষগুলো পর্যায়ক্রমিক সংকুচিত হলে লেজটি একদিক থেকে অন্যদিকে বেঁকে যায়। নটোকর্ডও সম্ভবত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শিরদাঁড়ার মতো একইভাবে কাজ করে, কারণ এটি নমনীয়, কিন্তু নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের। আবার চারদিকে আবরণ থাকায় নটোকর্ড ছোটও হতে পারে না।

নটোকর্ড এখানে না থাকলে লেজের দু'পাশের পেশী কোষই এক সাথে সংকুচিত হয়ে লেজকে খাটো করে ফেলত। কিন্তু নটোকর্ড এখানে থাকায় একপাশের কোষ সংকুচিত হলে অন্য পাশের কোষগুলো লম্বা হয়। এভাবে নটোকর্ড দু'পাশের কোষকেই প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে।

উপরিলিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে ট্যাডপোল লার্ভার বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংক্ষেপে এভাবে উল্লেখ করা যায় :

(১) দেহ লম্বাটে, নলাকার ও দেখতে ব্যাঙাচির মতো।

(২) লেজের সমগ্র দৈর্ঘ্য জুড়ে নটোকর্ড অবস্থিত।

(৩) ধড়ের ভিতরে স্নায়ুরজ্জু থেকে সৃষ্ট সংবেদ থলিকায় অসেলাস ও স্ট্যাটোসিস্ট রয়েছে।

(৪) ধড়ের ভিতরে স্নায়ুরজ্জুর যে স্ফীত ও প্রায় নিরেট অংশ রয়েছে তা থেকে একটি ফাঁপা ও সরু স্নায়ুরজ্জু বের হয়ে নটোকর্ডের উপর দিয়ে সমান্তরালে লেজের শীর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত।

(৫) মোটামুটি সুগঠিত পৌষ্টিক নালী গলবিল, গলনালী, অন্ত্র ও এণ্ডোস্টাইলযুক্ত, কিন্তু মুখ টেন্টে আবৃত।

(৬) নিউরাল গ্রন্থি একটি সিলীয় নালী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে মাত্র।

(৭) অ্যাট্রিয়াল গহ্বরও পরিস্ফুটনের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং একটিমাত্র ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত।

(৮) পাকস্থলীর বৃদ্ধি হিসেবে হৃৎপিণ্ড ও পেরিকার্ডিয়াম আবির্ভূত হয়।

(৯) লেজ সুগঠিত পাখনা ও পেশীকোষযুক্ত।

(১০) ধড়ের সম্মুখ প্রান্তে কয়েকটি গ্রন্থিময় আঠালো প্যাপিলি বা পিড়কা থাকে।

সাঁতারু জীবন

লার্ভার মুক্ত সাঁতারু জীবনের মেয়াদ সব প্রজাতিতে এক নয়। যেমন *Botyllus*-এ দেড় মিনিট থেকে তিন মিনিট, আবার কোন অ্যাসিডীয়তে একমাসেরও বেশি। তবে সাধারণত ওরা এক বা দু'দিন সচল জীবন যাপন করে। এ সময়ের মধ্যেই ওরা জন্মস্থান থেকে সাঁতরে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে প্রজাতির বাসভূমিরও বিস্তৃতি ঘটে।

বেশিরভাগ প্রজাতির লার্ভা প্রথমে পানির উপরতলে সাঁতার কাটে। একে বিপরীত ভৌমগতি (Negative geotropism) বলে। এভাবে নির্দিষ্ট সময় চলার

পর লার্ভা পানির নিচে আলো থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। অবশেষে অল্প অন্ধকারে এমন কোন শক্ত দ্রব্যের গায়ে প্যাপিলীর সাহায্যে আটকে যায় যেখানে তলানী জমে লার্ভার ক্ষুদে দেহকে যেন ঢেকে ফেলতে না পারে। একে সদৃশ ভৌমগতি (positive geotropism) বলে।

রূপান্তর

ক্ষণস্থায়ী সচল জীবনের অধিকারী ট্যাডপোল লার্ভা রূপান্তরের আগেই নিমজ্জিত কোন শক্ত দ্রব্যের সাথে ধড়ের সম্মুখ প্রান্তের আঠালো প্যাপিলির সাহায্যে নিজেকে আটকে নিয়ে লেজ উপর দিকে খাড়া করে ধরে রাখে। এরপরেই শুরু হয় রূপান্তর।

প্রতীপ রূপান্তর (retrogressive metamorphosis): যে ধরনের রূপান্তরে একটি লার্ভা তার উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলোর বিলুপ্তি ঘটিয়ে সরল ও আদি প্রকৃতির প্রাণীতে পরিণত হয়, তাকে প্রতীপ রূপান্তর বলে।

ট্যাডপোল লার্ভার কয়েকটি অঙ্গ যেমন—নটোকর্ড, স্নায়ুরজ্জু, সংবেদ থলিকা, স্ট্যাটোসিস্ট প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে রূপান্তরের সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই অ্যাসিডীয়দের রূপান্তর প্রতীপ রূপান্তরের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

রূপান্তরকালীন পরিবর্তন (চিত্র ১২)

ট্যাডপোল লার্ভা আঠালো প্যাপিলীর সাহায্যে নিমজ্জিত শক্ত কিছুর সাথে নিজেকে আটকে নিয়ে রূপান্তরের জটিল ঘটনাবলী ঘটিয়ে পূর্ণাঙ্গ নিশ্চল প্রাণীতে পরিণত হয়।

সমগ্র রূপান্তর প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করলে এতে এই ধরনের পরিবর্তন চিহ্নিত করা যায়—একটি ধ্বংসাত্মক, অপরটি গঠনাত্মক। নিচে এই দুই শিরোনামের অধীনে রূপান্তর প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন: এ প্রক্রিয়ায় লার্ভার বিভিন্ন কলা বিনষ্ট হয় এবং কয়েকটি অঙ্গ অদৃশ্য হয়ে যায়। নিচে তার উল্লেখ রয়েছে।

(১) আংশিক বিশোষণ ও আংশিক বর্জনের ফলে লার্ভার লেজ পাখনাসহ খাটো হতে থাকে এবং এক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন লার্ভাকে একটি নাশপাতির মতো দেখায়।

(২) পৌচ্ছিক পেশী, স্নায়ুরজ্জু ও নটোকর্ড টুকরা হয়ে কোষভক্ষণ প্রক্রিয়ায় অদৃশ্য হয়।

(৩) আঠালো প্যাপিলি সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়।
(৪) অসেলাস ও স্ট্যাটোসিস্টসহ সংবেদ থলিকা ভেঙে অদৃশ্য হয়ে যায়।
(৫) সামনের অঞ্চলে সংযোগস্থল (আঠালো প্যাপিলি) এবং মুখের মাঝখানের অংশ দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও অ্যাট্রিওপোরসহ প্রকৃত পিঠের বৃদ্ধি রহিত হয়ে যায়। এর ফলে মুখ ৯০ ডিগ্রী কোণে ঘুরে যায়। তাই পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর ফুলকা ও অ্যাট্রিয়াল ছিদ্রের চূড়ান্ত অবস্থান লার্ভার আসল সামনের এবং পিঠের দিক নির্দেশ করে।

গঠনাত্মক পরিবর্তন: বেশ কিছু উন্নত ও প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হারালেও লার্ভার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দেহের অন্যান্য অংশ পরিণত দেহে সুগঠিত ও বিশেষায়িত হয়ে উঠে। নিচে এর উল্লেখ রয়েছে।

(১) লেজ হারিয়ে ধড়টি নাশপাতির আকৃতি ধারণ করে। এর চারটি কোণা থেকে চারটি বড় বড় এক্টোডার্মাল অ্যাম্পুলি (ectodermal ampullae)-র উৎপত্তি হয়। এগুলো রূপান্তররত লার্ভাকে ভিত্তির সাথে শক্ত করে ধরে রাখে। তাছাড়াও, এদের ভিতরে যে তরল প্রবাহিত হয় তা শ্বসনে সাহায্য করে। পরে আরও দুটি ছোট অ্যাম্পুলির সৃষ্টি হয়।
(২) নিউরাল গ্রন্থি ও স্নায়ু গ্যাংগলিওন মুখ ও অ্যাট্রিয়াল ছিদ্রের মাঝখানে চলে আসে। ধড় গ্যাংগলিওন নিজে ভিসেরাল স্নায়ু হিসেবে টিকে থাকে।
(৩) মুখ ঢেকে রাখা টেন্টের বিশোষণে মুখ কার্যক্ষম হয়ে উঠে।
(৪) গলবিল অনেক বড় হয় এবং স্টিগমাটার সংখ্যাও বেড়ে যায়। এ অবস্থায় গলবিল একটি ফুলকা থলির মতো গঠনে রূপ নেয়।
(৫) পাকস্থলী বড় হয়, অন্ত্র লম্বা হয়ে ফাঁস তৈরি করে এবং যকৃত আবির্ভূত হয়।
(৬) অ্যাট্রিয়াল গহ্বর বিশাল আকার ধারণ করে।
(৭) মেসোডার্ম কোষ থেকে জননাঙ্গ ও জননাঙ্গ নালীর উৎপত্তি হয়।
(৮) হৃৎপিণ্ড ও পেরিকার্ডিয়ামসহ সংবহনতন্ত্র আবির্ভূত হয়।
(৯) সারা দেহ পুরু, শক্ত ও রক্তজালকসমৃদ্ধ টেস্টে আবদ্ধ হয়। প্রয়োজনে টেস্ট প্রাণীকে সংবদ্ধকরণে 'পা'-এরও সৃষ্টি করে।
(১০) ব্রাঙ্কিয়াল ও অ্যাট্রিয়াল ছিদ্র সংলগ্ন দেহের অংশ লম্বা হয়ে দুটি সাইফন গঠন করে।

এভাবে একটি সচল মুক্ত সাঁতারু, জটিল গঠনের এবং কর্ডেট বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত লার্ভা রূপান্তরিত হয়ে এমন একটি সরল ও নিশ্চল পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় যাতে শুধু ফুলকা-রন্ধ্র ছাড়া আর কোন কর্ডেট বৈশিষ্ট্যই অবশিষ্ট থাকে না।

কিছু সরল ও দেহের ভিতরে পরিস্ফুটন ঘটে এমন অ্যাসিডীয়দের রূপান্তর বর্ণিত অবস্থার তুলনায় সংক্ষিপ্ত হতে পারে। *Molgula* এবং *Peloxaia* ছাড়া বাকি সব অ্যাসিডীয়দের জীবন ইতিহাসেই লেজবিশিষ্ট ট্যাডপোল লার্ভা রয়েছে।

ট্যাডপোল লার্ভার গুরুত্ব

অ্যাসিডীয়দের জীবনে ক্ষণস্থায়ী ট্যাডপোল লার্ভা প্রাণিজগতে নিচে উল্লেখিত দুটি কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—

(১) এই লার্ভা আপজাত্যের (Degeneration) একটি চমৎকার উদাহরণ, এবং

(২) এই লার্ভা প্রাণিজগতে অ্যাসিডীয়দের প্রকৃত স্থান নির্ধারণের ভূমিকা পালন করে।

(১) আপজাত্যের উদাহরণ : সাধারণত কোন প্রাণীর লার্ভার অঙ্গগুলো নানা-ভাবে পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাণিদেহের নির্দিষ্ট অঙ্গে পরিণত হয়। কিন্তু অ্যাসিডীয়দের লার্ভাদেহে যেসব অঙ্গ থাকে তার কয়েকটি রূপান্তরের সময় বিলুপ্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে কোন ধরনের অঙ্গে আর পরিণত হয় না।

(২) শ্রেণীবদ্ধগত গুরুত্ব : ট্যাডপোল লার্ভায় কর্ডাটার তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিই পাওয়া যায়, অর্থাৎ এতে মেরুদণ্ড, ফাঁপা, পৃষ্ঠীয় স্নায়ুরজ্জু, ফুলকা রন্ধ্র সবই রয়েছে। কিন্তু রূপান্তরের সময় ফুলকা রন্ধ্র ছাড়া বাকি দুটি বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি ঘটে। তাই আগে অ্যাসিডীয়দের অকর্ডাটা গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়েছিল। কোভালেভস্কি (Kowalevsky) ১৮৬৯ সালে ট্যাডপোল লার্ভার বৈশিষ্ট্য ও রূপান্তর পর্যবেক্ষণ করে অ্যাসিডীয়দের কর্ডাটা গোষ্ঠীভুক্ত করেন। এভাবে ট্যাডপোল লার্ভা কর্ডাটার সাথে অ্যাসিডীয়দের সম্পর্ক নির্ণয়ে এবং শ্রেণীবিন্যাসে এদের প্রকৃত স্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উল্লিখিত দুটি গুরুত্ব ছাড়াও অ্যাসিডীয়দের জীবনে সচল ট্যাডপোল লার্ভা নিজ প্রজাতির বাসভূমির বিস্তৃতি ঘটিয়ে খাদ্যাভাব ও অন্যান্য সমস্যা দূরীকরণে যথেষ্ট সাহায্যও করে থাকে হয়তো।

পঞ্চম অধ্যায়

অ্যাম্ফিঅক্সাসের পরিস্ফুটন

জননাঙ্গ ও জননকোষ

অ্যাম্ফিঅক্সাস ভিন্নলিঙ্গী প্রাণী। পূর্ণবয়স্ক প্রাণীতে শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় দেহের দুইপাশে অ্যাট্রিয়াম ও মায়োটম বেষ্টনকারী দেহ প্রাচীরের মাঝখানে অবস্থান করে। প্রত্যেক পাশে এদের সংখ্যা প্রায় ২৮টি। এগুলো ১১-৪০তম বা ৪১তম পেশীখণ্ড পর্যন্ত খণ্ডায়িত বিন্যস্ত থাকে (চিত্র ১৩)।

ভ্রূণে আদি জননকোষ মায়োটমের নিম্ন-সম্মুখ অঞ্চলে গুচ্ছের মতো সৃষ্টি হয়। পরে তা একটি ছোট কুঁড়ির মতো ফুলে উঠে। আবরণসহ এই কুঁড়ি মায়োসিলে থলির মতো বেড়ে উঠে। থলির গলাটি তখন ছোট বোঁটা হয়ে গহ্বরের পিছনের

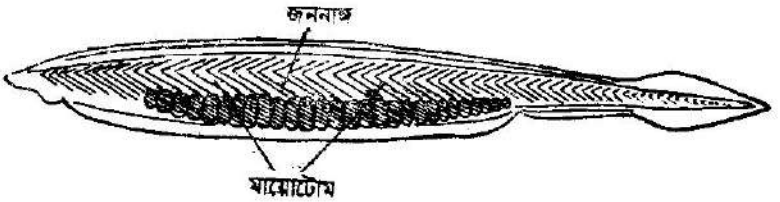

চিত্র ১৩ : অ্যাম্ফিঅক্সাসে জননাঙ্গের অবস্থান।

মায়োসিল প্রাচীরে লেগে থাকে। এভাবে প্রাণীর প্রত্যেকটি ডিম্বাণু একেকটি ফলিকলে আবদ্ধ না হয়ে থলির প্রাচীরে যুক্ত থাকে। সবগুলি ডিম্বাণুর জন্যই থলিটি অভিন্ন ফলিকলের মতো কাজ করে। প্রথমে ওরা মায়োসিলে থাকে, পরে প্রত্যেকটি মায়োসিলের বেশিরভাগ তলদেশীয় অংশ জননাঙ্গসহ উপরের অংশ থেকে আলাদা হয়ে গনোসিল (Gonocoel) নামক গহ্বরের সৃষ্টি করে। এ সময়ের মধ্যেই একগুচ্ছ ডিম্বাণু পরিপক্ক হয়ে উঠে। প্রত্যেকটি ডিম্বাণুই বড় হয়ে প্রায় সবটুকু সিলোমীয় ফাঁক দখল করে নেয়। তখন ডিম্বাণুগুলো বহিষ্কৃত হয় এবং ডিম্বাশয়টিও অদৃশ্য হয়ে যায়। পরের জনন ঋতুর জন্য আবার নতুন ডিম্বাশয়ের উৎপত্তি হয়। শুক্রাশয় ও শুক্রাণুর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।

ডিম্বাণুঃ পরিপক্ব বিভক্তির ঠিক আগের মুহূর্তে অ্যাম্ফিঅক্সাসের পরিণত ডিম্বাণুর ব্যাস হয় ০·১২ মি. মি.। এটি তখন একটি পাতলা ভিটেলাইন ঝিল্লীতে আবৃত থাকে। এর ভিতরে থাকে প্রায় কুসুমহীন, কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়াসমৃদ্ধ সাইটোপ্লাজমের এক পাতলা কর্টিক্যাল (cortical) বা পরিধীয় স্তর। নিউক্লিয়াসটি বেশ বড়, ডিম্বাণু ব্যাসের প্রায় অর্ধেক এবং তা প্রাণী মেরুতে ডিম্বাণু ঝিল্লীর কাছে অবস্থান করে। পরিধীয় অংশ ও প্রাণী মেরুতে নিউক্লিয়াসের আশেপাশের অংশ

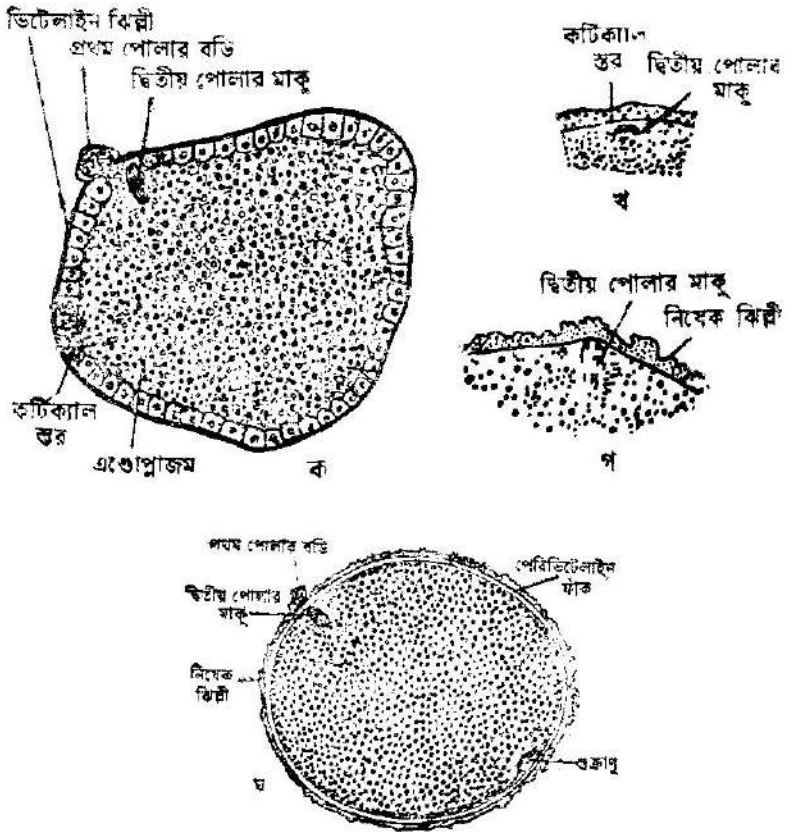

চিত্র : ১৪ অ্যাম্ফিঅক্সাসের ডিম্বাণু; (ক) ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু; (খ) পেরিভিটেলাইন ঝিল্লী সৃষ্টিরত কর্টিক্যাল স্তর, (গ) নিষেক ঝিল্লী সৃষ্টি, এবং (ঘ) নিষিক্ত ডিম্বাণু (McEwen, ১৯৬৯ অনুসরণে)।

ছাড়া ডিম্বাণুর সবখানে সাইটোপ্লাজম দানাময় কুসুম বহন করে। কুসুম হচ্ছে ভ্রূণের সঞ্চিত খাদ্য।

অ্যাম্ফিঅক্সাসের ডিম্বাণু মাইক্রোলেসিথাল ও আইসোলেসিথাল ধরনের, কারণ একদিকে কুসুমের পরিমাণ খুব কম, অন্যদিকে কুসুম প্রায় সমানভাবে বিস্তৃত. কিন্তু নিউক্লিয়াসটি অকেন্দ্রিক হওয়ায় ডিম্বাণুকে কিছুটা টেলোলেসিথাল ধরনেরও বলা যায়। কুসুমহীন সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস দেখে ডিম্বাণুর প্রাণী মেরুকে এবং এর বিপরীত দিকের ভেজিটাল মেরুকে সহজেই চেনা যায়।

শুক্রাণু ঃ অ্যাম্ফিঅক্সাসের শুক্রাণুর মাথা বেশ, স্ফীত, এর মধ্যখণ্ড অনেক খাটো। এ পার্থক্য ছাড়া শুক্রাণুর পরিস্ফুটন ও গাঠনিক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য একটি আদর্শ শুক্রাণুর মতই।

ডিম্বাণুর পরিপক্বতা বিভাজন

সম্ভবত ডিম্বপাতের সময়ই প্রাণী মেরুতে ডিম্বাণুর প্রথম পরিপক্বতা বিভক্তি সম্পন্ন হয়। তখন প্রথম পোলার বডি ডিম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিটেলাইন ঝিল্লী ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং তাড়াতাড়ি খসে পড়ে। এর পরপরই দ্বিতীয় পরিপক্বতা মাকুর সৃষ্টি হয় এবং মেটাফেজ পর্যন্ত এগিয়ে থাকে। নিষেকের পূর্ব পর্যন্ত এভাবে বিশ্রামকাল হিসেবে কেটে যায়। নিষিক্ত না হলে ডিম্বাণু ধ্বংস

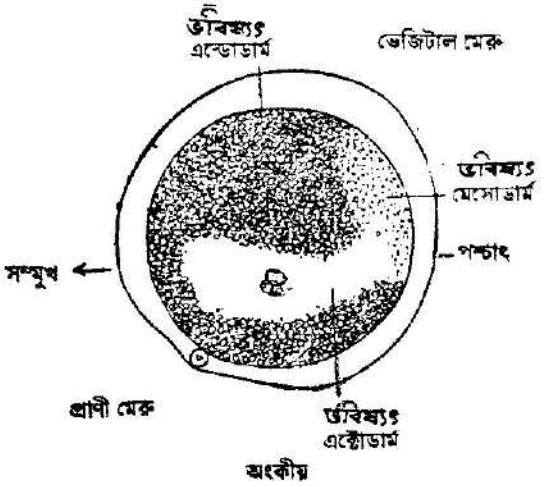

চিত্র ১৫ : অ্যাম্ফিঅক্সাসের ভাইগোটের মধ্যচ্ছেদ (McEwen, ১৯৬৯ অনুসরণে)

হয়ে যায়, আর নিষিক্ত হলে নিষেক ঝিল্লী উত্তোলিত হয় এবং দ্বিতীয় পোলার বডি আত্মপ্রকাশ করে। এই পোলার বডি সব সময়ই ডিম্বাণুর বাইরের প্রান্তে পেরিভাটেলাইন ফাঁকে এসে নিষেক ঝিল্লীতে আবৃত হয়ে লেগে থাকে (চিত্র ১৫)। একে দেখে সহজেই ডিম্বাণুর প্রাণী মেরু চিহ্নিত করা যায়।

স্খলন ও নিষেক

সারা বসন্ত ও গ্রীষ্ম জুড়ে অ্যাম্ফিঅক্সাসেরা যখন বিকেলে সাঁতরাতে বের হয় তখন জননকোষ স্খলিত হয়। ঐ সময় গনোসিল গহ্বর প্রাচীরে যে পেশল সংকোচন ঘটে তার ফলে ডিম্বাণু (বা শুক্রাণু) এসব প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসে। ঐ জায়গার অ্যাট্রিয়াল প্রাচীরও ফেটে যায়। এভাবে জননকোষ অ্যাট্রিয়াল গহ্বরে এসে পড়ে। সেখান থেকে ওরা অ্যাট্রিওপোরের মাধ্যমে সমুদ্রের পানিতে স্খলিত হয়।

ডিম্বাণু সমুদ্রের পানির সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে ভিটেলাইন ঝিল্লীর নিচে সামান্য ফাঁক রেখে পেরিভিটেলাইন ঝিল্লীর সৃষ্টি হয়। এ ঝিল্লীটি সম্ভবত ডিম্বাণুতলের পরিধীয় গহ্বরপূর্ণ সাইটোপ্লাজমের বাইরের অংশ থেকে তৈরি হয় এবং কিছুক্ষণ ডিম্বাণুতলের সাথে প্রায় লাগানো থাকে।

পেরিভিটেলাইন ঝিল্লী প্রথমে তরল প্রকৃতির হলেও সমুদ্রের পানিতে কিছুক্ষণ থাকার পর প্রাণী মেরু থেকে তাড়াতাড়ি চারদিকে শক্ত হতে থাকে। এ সময়ের মধ্যে ডিম্বাণুকে অসংখ্য শুক্রাণু ঘেরাও করে ফেলে। এক বা একাধিক শুক্রাণু প্রথমে ভিটেলাইন ঝিল্লী ভেদ করে, পরে মধ্যের ঐ সামান্য ফাঁক অতিক্রম করে এবং অন্তঃস্থ ঝিল্লীও বিদীর্ণ করে। অবশেষে ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশে সক্ষম হয়।

শুক্রাণুর প্রবেশ সাধারণত ভেজিটাল মেরুর আশেপাশেই ঘটে। কারণ এখানে পেরিভিটেলাইন ঝিল্লী বেশি সময় ধরে তরল থাকে। শুক্রাণু ডিম্বাণুতে পৌঁছার সাথে সাথে এ ঝিল্লী তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে যায়। শুধু তাই না, ঝিল্লীটি ভিটেলাইন ঝিল্লীর সাথে একীভূত হয়ে একটি নিষেক ঝিল্লীও নির্মাণ করে (চিত্র ১৪)। নিষেক ঝিল্লী তখন ডিম্বাণুতল থেকে সরে এসে যে ফাঁকের সৃষ্টি করে তাকে পেরিভিটেলাইন ফাঁক বলে। নিষেক ঝিল্লী গ্যাস্ট্রুলা দশা পর্যন্ত অক্ষুন্ন থাকে, এরপর বিনষ্ট ও অদৃশ্য হয়ে যায়।

নিষেকের সময় শুক্রাণু-নিউক্লিয়াস ডিম্বাণু-নিউক্লিয়াসের সমান বড় হয় এবং দুই নিউক্লিয়াই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণুর নিরক্ষরেখার সামান্য উপরে একীভূত হয়ে জাইগোট নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। জাইগোট নিউক্লিয়াসসহ ডিম্বাণুকে তখন জাইগোট বলে। একীভূত নিউক্লিয়াস একটি স্বল্প এলাকায় অবস্থান করে। এই স্বল্প অঞ্চলের

নাম হায়ালোপ্লাজম যা প্রধানত প্রাণী মেরুতে থাকলেও কোণাকারে সামান্য পিছনেও প্রসারিত থাকে (চিত্র ১৫)। নিষেকের সময় অতিরিক্ত শুক্রাণু প্রবেশ করে গেলে ওরা বাড়াবাড়ি না করে ধ্বংস হয়ে যায়।

ডিম্বাণুর ভাগ্য-মানচিত্র

নিষেকের পরপরই ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের অংশগুলো পুনর্বিন্যস্ত হয়ে ভবিষ্যত অঙ্গ সৃষ্টিকারী অঞ্চলের চারটি নির্দিষ্ট অংশে বিভেদিত হয় নিচে এদের উল্লেখ করা হলো (চিত্র ১৬) :

(১) প্রাণী অর্ধের কুসুমহীন স্বচ্ছ সাইটোপ্লাজম ভাবী-এক্টোডার্ম নির্দেশ করে। এ অংশ ত্বকের এপিডার্মিসে পরিণত হয়।

(২) দানাময় কুসুমীয় সাইটোপ্লাজম ভাবী-এণ্ডোডার্ম নির্দেশ করে। এ অংশ পৌষ্টিক নালীর প্রাচীর নির্মাণ করে।

(৩) পরিধীয় (cortical) সাইটোপ্লাজম ভেজিটাল প্রান্তে এসে পিছনের অংশে অর্ধচন্দ্রাকার ধারণ করে। এ অংশ মেসোডার্ম নির্দেশক যা থেকে পেশী ও সিলোমের প্রাচীর তৈরি হয়।

(৪) ভাবী-মেসোডার্ম অংশের বিপরীতে অবস্থিত আরও দুটি অর্ধচন্দ্রকার অংশ নটোকর্ড ও স্নায়ুতন্ত্রের জন্য নির্দিষ্ট থাকে।

চিত্র ১৬ : ***Amphioxus* (*Branchiostoma*) *belcheri*–র** আটকোষী (ক) ও ৩২ কোষী (খ) দশার ভাগ্য-মানচিত্র (Balinsky, ১৯৮১ অনুসরণে)।

ক্লিভেজ

ক্লিভেজ হলোব্লাস্টিক ধরনের, কিন্তু সমান নয়। নিষেকের ৬০–৯০ মিনিট পর মধ্যরেখীয় তলে প্রথম ক্লিভেজ ঘটে। এতে জাইগোটি দুটি সমান অর্ধে বিভক্ত হয়।

দ্বিতীয় ক্লিভেজ ঘটে প্রথমটির প্রায় ৪৫ মিনিট পর। এটাও মধ্যরেখীয়, তবে প্রথমটির সমকোণী, এবং পরস্পরকে পোলার বডির নিচে ছেদ করে। ফলে প্রায়

সমান আকৃতির চারটি ব্লাস্টোমিয়ার উৎপন্ন হয়। আসলে ক্লিভেজ তলটি প্রাণী ও ভেজিটাল মেরুর সামান্য পশ্চাৎ-অঙ্কীয়দেশ দিয়ে অতিক্রম করায় সম্মুখ-পশ্চাৎ ব্লাস্টোমিয়ারদুটি পশ্চাৎ-অঙ্কীয় ব্লাস্টোমিয়ার দুটির চেয়ে একটু বড় হয় (চিত্র ১৭)। এই ক্লিভেজে কিছুটা সর্পিল ঝোঁকও লক্ষ্য করা যায়। প্রাণী মেরুর দিক থেকে তাকালে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

তৃতীয় ক্লিভেজ ঘটে দ্বিতীয় ক্লিভেজের ৩০ মিনিট পর, জাইগোটের মধ্যভাগে এবং অন্য দুটি ক্লিভেজের আড়াআড়ি, অর্থাৎ ডিম্বাণুর প্রাণী ও ভেজিটাল মেরুর অনুভূমিক। এটি সম্পূর্ণ নিরক্ষীয় নয়, বরং কিছুটা প্রাণী মেরু ঘেঁষা। এ কারণে জাইগোট উপরে ও নিচে চারকোষী দুটি অর্ধে ভাগ হয়ে যায়। এদের মধ্যে প্রাণী মেরু সংলগ্ন চারটি ব্লাস্টোমিয়ার ভেজিটাল মেরুর চারটির চেয়ে ছোট। এদের মাইক্রোমিয়ার এবং বড়গুলোকে ম্যাক্রোমিয়ার বা মেগামিয়ার বলে।

চতুর্থ ক্লিভেজ প্রথমটির মতো মধ্যরেখীয়, আসলে দ্বিপার্শ্বীয়-মধ্যরেখীয়, কারণ দুটি ক্রমপর্যায়িক অনুলম্ব ক্লিভেজে আটটি ব্লাস্টোমিয়ার ১৬টিতে পরিণত হয়।

পঞ্চম ক্লিভেজ আড়াআড়ি হয়ে আটটি করে ব্লাস্টোমিয়ারের চার স্তরবিশিষ্ট মোট ৩২ ব্লাস্টোমিয়ারের একটি গুচ্ছ সৃষ্টি করে।

ষষ্ঠ ক্লিভেজ মোটামুটি মধ্যরেখীয়। এর ফলে ৬৪টি ব্লাস্টোমিয়ার উৎপন্ন হয়। কিন্তু সপ্তম ক্লিভেজ থেকে বিভক্তির ধারাবাহিকতা আর বজায় থাকে না, এবং মাইক্রোমিয়ারগুলো আরও তাড়াতাড়ি বিভক্ত হয়, ফলে উপরের কোষগুলো যথেষ্ট ছোট আকারের হয়ে পড়ে।

ব্লাস্টুলা / ব্লাস্টুলেশন

ব্লাস্টোমিয়ারগুলোর বিভক্তির ফলে জাইগোট এমন একটি পেয়ালা আকৃতির গঠনে উপনীত হয় যার কোষগুলো একটিমাত্র স্তরে বিন্যস্ত থেকে জেলীর মতো তরলে পূর্ণ একটি কেন্দ্রীয় গহ্বরকে ঘিরে রাখে। এই অবস্থায় ভ্রূণকে ব্লাস্টুলা এবং কেন্দ্রস্থ গহ্বরকে ব্লাস্টোসিল বলে। ৬৪-ব্লাস্টোমিয়ার দশায় ব্লাস্টোসিল গঠন সম্পন্ন হয় (চিত্র ১৭)। ব্লাস্টোসিলের জেলী তাড়াতাড়ি পানি শোষণ করে আরও তরল হয় এবং আয়তনে অনেক বেড়ে যায়। তখন পরিণত ব্লাস্টুলা অক্লিভেজিত ডিমের চেয়ে এক-তৃতীয়াংশ বড় হয় এবং দেখতে নাশপাতির মতো দেখায়।

ব্লাস্টুলার কোষগুলো এত অনিয়ত বিন্যস্ত থাকে যে, উৎসের ভিত্তিতে এদের সনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও পোলার বডির সাথে সম্পর্ক রেখে কোষগুলোর অবস্থান ও আকৃতি দেখে কিছুটা চিহ্নিত করা যায়। ব্লাস্টুলার

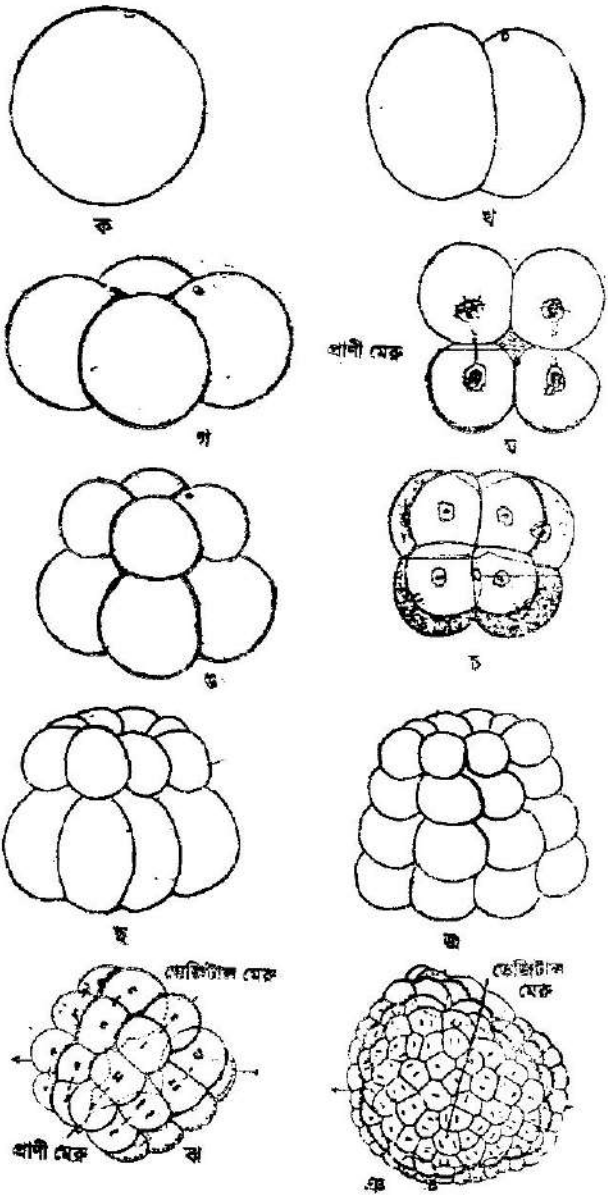

চিত্র ১৭ : অ্যাম্ফিঅক্সাসের জাইগোটের ক্লিভেজ (ক) জাইগোট, (খ) প্রথম ক্লিভেজ, (গ) ৪ কোষ দশা, (ঘ) ৪ কোষ দশা (প্রাণী মেরু থেকে দৃশ্যমান), (ঙ) ৮ কোষ দশা, (চ) ৮ কোষ দশা (প্রাণীমেরু থেকে দৃশ্যমান) (ছ) ১৬ কোষ দশা, (জ) ৩২ কোষ দশা, (ঝ) ৩২ কোষ দশা (পাশ থেকে দৃশ্যমান) এবং (ঞ) ১২৮ কোষ দশা (বাম পাশ থেকে দৃশ্যমান)।

সবচেয়ে ছোট ও সবচেয়ে দ্রুত বিভক্তিরত কোষ পিছন দিকে থাকে। ওরা ৮-ব্লাস্টোমিয়ার দশায় দুটি পশ্চাৎ ম্যাক্রোমিয়ার থেকে এসেছে এবং ভবিষ্যত মেসোডার্ম নির্দেশ করছে। সম্মুখ-অক্ষীয় অঞ্চলের কোষগুলো কিছুটা বড়, এদের বিভক্তির হার বেশ মন্থর। ওরা ৮-ব্লাস্টোমিয়ার দশার চারটি মাইক্রোমিয়ার থেকে এসেছে এবং ভবিষ্যত এক্টোডার্ম নির্দেশ করছে। বৃহত্তম ও মন্থরতম বিভক্তিরত কোষগুলো থাকে পশ্চাৎ-পৃষ্ঠীয় অঞ্চলে। ওরা এসেছে ৮-ব্লাস্টোমিয়ার দশার পৃষ্ঠীয় ম্যাক্রোমিয়ার জোড়া থেকে এবং ভবিষ্যত এণ্ডোডার্ম নির্দেশ করছে।

গ্যাস্ট্রুলেশন

কনক্লিন (Conklin, 1932)-এর মতে, অ্যাম্ফিঅক্সাসের গ্যাস্ট্রুলেশন ইনভেজিনেশন, ইনভলিউশন ও এক ধরনের এপিবলির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়।

ইনভেজিনেশন ও ইনভলিউশন: ব্লাস্টুলার সম্মুখ-পৃষ্ঠীয় ছোট এলাকাটি যা ভবিষ্যত এণ্ডোডার্ম কোষে গঠিত তা ইতিমধ্যেই চাপা হয়ে হাইপোব্লাস্টিক প্লেট (এণ্ডোডার্মাল প্লেট) গঠন করে (চিত্র ১৮, খ)। প্রক্রিয়ায় পশ্চাৎ-পৃষ্ঠীয় অংশও জড়িয়ে পড়ে। ব্লাস্টুলার সাধারণ আকৃতির জন্য ভবিষ্যত পিছন থেকে তাকালে এই চাপা প্লেটকে কিছুটা বাঁকা পাশের একটি তিনকোণা গঠনের মতো দেখায়। ত্রিকোণের প্রশস্ততম পাশটি নাশপাতির বড় প্রান্তের দিকে মুখ করা সম্মুখ-পশ্চাতে অবস্থিত। অন্য দুই পাশ ছোট প্রান্তে মিলিত হওয়ার জন্য পশ্চাৎ-অংকীয় দিকে প্রসারিত হয়। প্লেটের প্রশস্ত আড়াআড়ি সম্মুখ-পৃষ্ঠীয় কিনারা ব্লাস্টোপোরের পৃষ্ঠ-ওষ্ঠ, আর বাকি দুই কিনারা অংক-পার্শ্বীয় ওষ্ঠ গঠন করে। তাই ব্লাস্টোপোর অন্তত কিছু সময়ের জন্য তিনকোণা থাকে (চিত্র ১৮, জ)।

হাইপোব্লাস্টিক প্লেট আরও চাপা হতে থাকে ও প্রভাবিত কোষগুলো ইনভেজিনেশন প্রক্রিয়ায় ভিতরে প্রবেশ করে। সব পাশেই কোষের চলন একরকম না, বরং প্রশস্ত আড়াআড়ি পৃষ্ঠ-ওষ্ঠে সবচেয়ে বেশি, পিছনে পশ্চাৎ-পার্শ্বীয় ওষ্ঠে কম হয়। এসময় ওষ্ঠ অঞ্চলগুলোতে, বিশেষ করে পৃষ্ঠ-ওষ্ঠ অংশে সক্রিয় কোষ বিভক্তি ও ইনভলিউশন চলতে থাকে। হাইপোব্লাস্টিক প্লেটের কোষগুলো (যাদের ভিতরের প্রান্ত গোল) স্তম্ভাকার, অন্যদিকে, এপিব্লাস্ট কোষ ঘনক্ষেত্রাকার ধারণ করে (চিত্র ১৮, খ)। গ্যাস্ট্রুলা-কোষের আকারের এসব ও আরও অন্যান্য পরিবর্তনই সম্ভবত তাৎক্ষণিক ইনভলিউশনের কারণ। এ প্রক্রিয়া চলার সময় পৃষ্ঠ-ওষ্ঠের ঠিক সামনে কোষের ছয়টি আড়াআড়ি সারির মধ্যে তিনটি সারি ওষ্ঠের কিনারার উপর এবং আর্কেন্টেরনের ছাদে উঠে যায়। এভাবে ওরা হাইপোব্লাস্টের অংশে

পরিণত হয়, বাকি তিনটি সারি এপিব্লাস্টের অংশ হিসেবে থেকে যায়। প্রথম কোষগুলো নটোকর্ডের উৎস, আর শেষেরগুলো নিউরাল নলের উৎস হিসেবে কাজ করে।

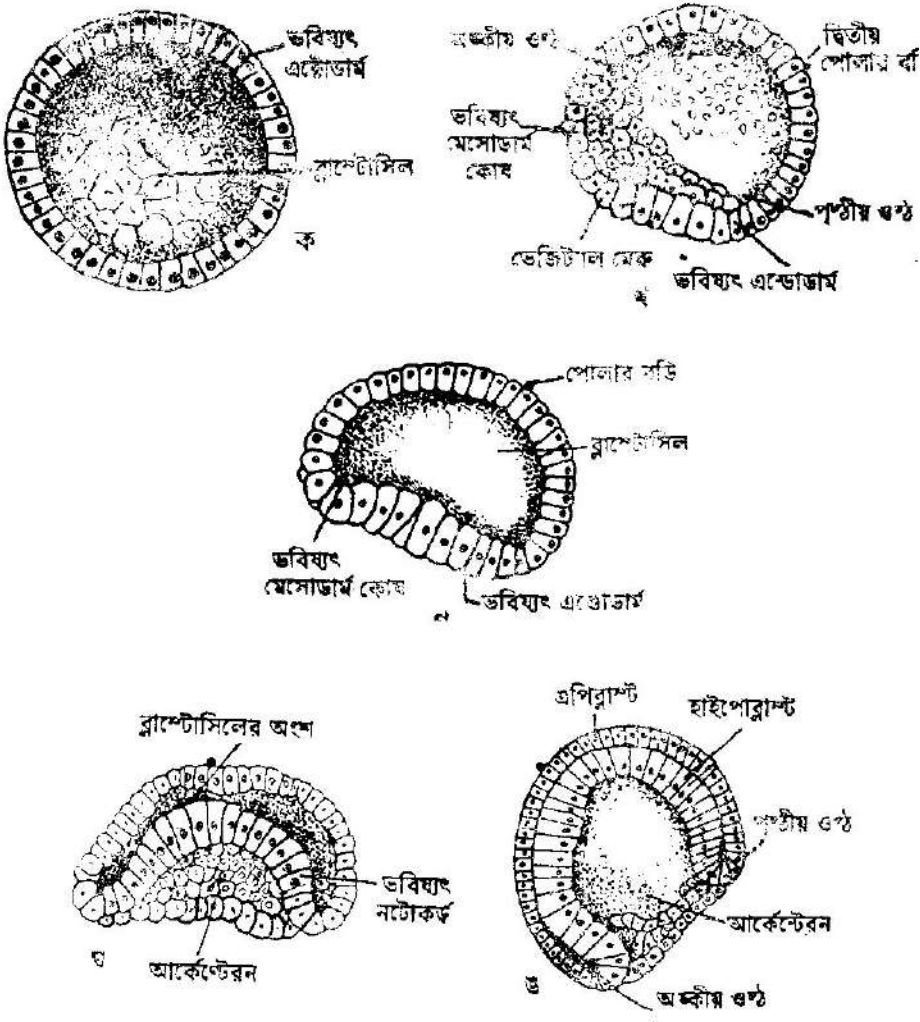

চিত্র : ১৮ অ্যাম্ফিঅক্সাসের গ্যাস্ট্রুলেশন প্রক্রিয়া : (ক) ব্লাস্টুলা, (খ) ও (গ) ইনভেজিনেশন আরম্ভ (ঘ) প্রাগ্রসর ইনভেজিনেশন (ঙ) ব্লাস্টোপোরের সংকোচন

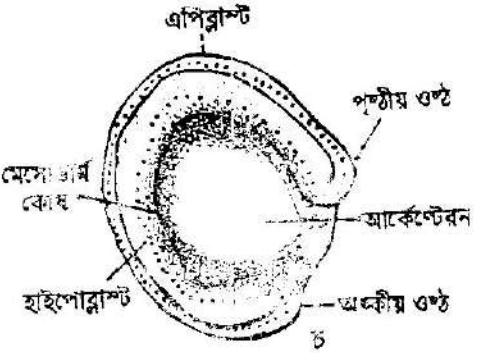

চিত্র ১৮ : অ্যামিফঅক্সাসের গ্যাস্ট্রুলেশন প্রক্রিয়া : (চ) ব্লাস্টোপোরের সংকোচন:

এপিবলি ঃ গ্যাস্ট্রুলেশনের কিছু অংশ এপিবলি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। এতে অঙ্ক-পার্শ্বীয় ওষ্ঠ পিঠের দিকে বৃদ্ধি পায়, একই সময় পৃষ্ঠ-ওষ্ঠ আরও বাঁকা হয়। প্রকৃত তিনকোণা ব্লাস্টোপোর ডিম্বাকার ধারণ করে। এর পিঠ তখন পৃষ্ঠপার্শ্বীয় ওষ্ঠ ও তলদেশ অঙ্ক-পার্শ্বীয়ওষ্ঠ গঠন করে। সব অংশ পরস্পরের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তবে পিঠের ও তলদেশের অংশের চেয়ে পাশের অংশ তাড়াতাড়ি

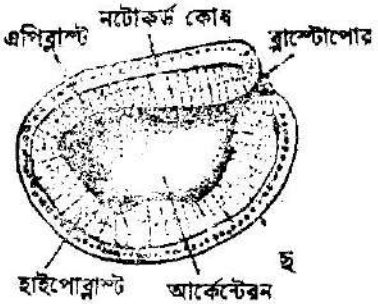

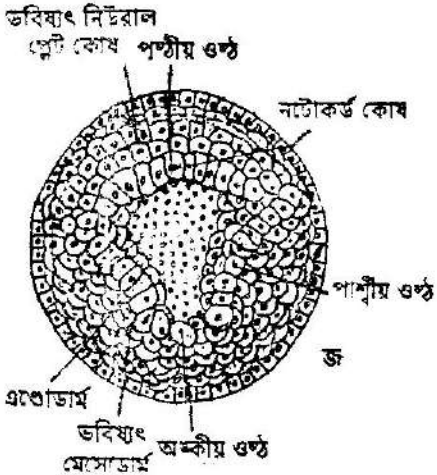

চিত্র ১৮ : অ্যামিফঅক্সাসের গ্যাস্ট্রুলেশন প্রক্রিয়া : (ছ) পূর্ণ গ্যাস্ট্রুলা এবং (জ) ব্লাস্টোপোরের দিক থেকে দৃশ্যমান গ্যাস্ট্রুলা (Balinisky, ১৯৮১, অনুসরণে)।

বৃদ্ধি পায়। এ কারণে ডিম্বাকার ব্লাস্টোপোর একটি ছোট ছিদ্রে পরিণত হয়। তখন ওষ্ঠ ও অন্যান্য স্থানের সক্রিয় কোষ বিভক্তির ফলে সম্পূর্ণ গ্যাস্ট্রুলা লম্বা আকার ধারণ করে। এভাবে আবির্ভূত দুই স্তরবিশিষ্ট নলাকার দেহের বাইরের স্তরটি এপিব্লাস্ট ও ভিতরেরটি হাইপোব্লাস্ট নামে পরিচিত হয় (চিত্র ১৮, চ, ছ)।

কনভারজেন্স: আগের বই-পুস্তকে অ্যামিফঅক্সাসে কনভারজেন্স প্রক্রিয়ায়ও গ্যাস্ট্রুলেশন হয় বলে উল্লেখ থাকলেও কনক্লিন (Conklin, ১৯৩২) তা অস্বীকার

করেছেন। তবে তিনিও মনে করেন যে, ব্লাস্টোপোর-ঠোঁটের ভিতরে এবং এর আশে-পাশের অংশগুলো কনভারজেন্সের মতই এক প্রক্রিয়ায় ভ্রূণীয় পদার্থের সঞ্চালন ঘটায়।

গ্যাস্ট্রুলেশন চলার সময় এক্টোডার্ম কোষে সিলিয়া আবির্ভূত হয়। সিলীয় আন্দোলনে ভ্রূণ ডিম্বাণুঝিল্লীর ভিতরে ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে।

মুখ্য অঙ্গঅঙ্কুর

গ্যাস্ট্রুলার ভিতরে ও বাইরে জার্মিনাল (ভ্রূণীয়) স্তরগুলোর অবস্থান গ্রহণের পরপরই পরিস্ফুটনের পরবর্তী ধাপ শুরু হয়। এই ধাপে প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গের প্রতিনিধিত্বকারী এপিথেলিয়াম স্তর বিভিন্ন আকারের কোষপিণ্ডে আলাদা হয়ে যায়। এদের মুখ্য অঙ্গঅঙ্কুর বলে, যেমন–নিউরাল নল, নটোকর্ড, মেসোডার্মীয় খণ্ড বা সিলোমীয় থলি ইত্যাদি।

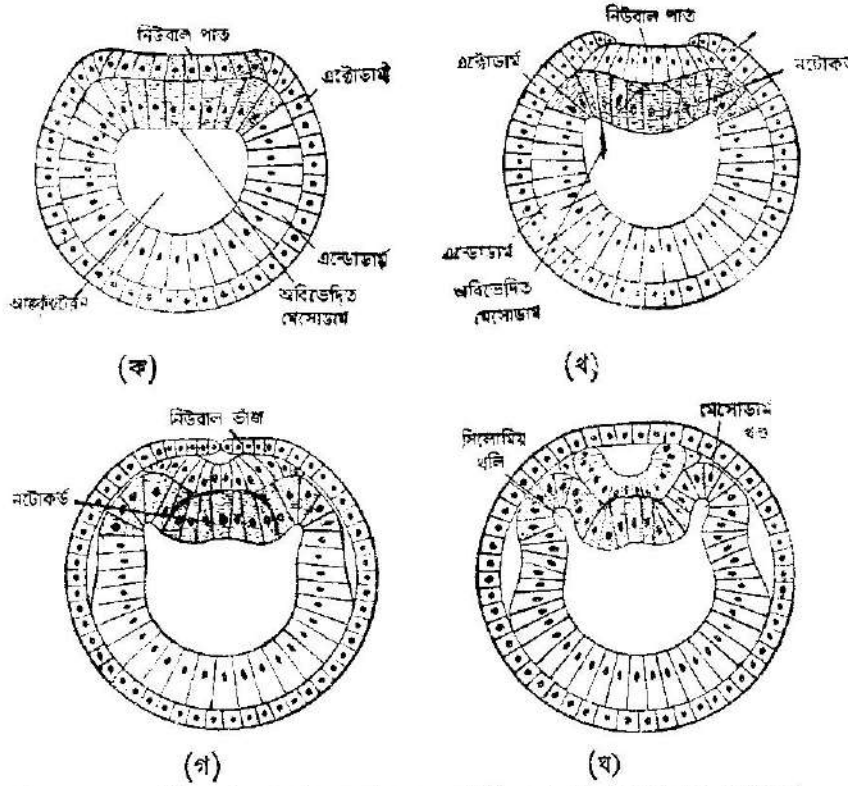

চিত্র : ১৯ : অ্যাম্ফিঅক্সাস ভ্রূণের অণুপ্রস্থচ্ছেদের প্রাথমিক অঙ্গাংশ বা স্নায়ুরজ্জু, নটোকর্ড ও মেসোডার্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে (Huettnet, ১৯৪৯ অনুসরণে)।

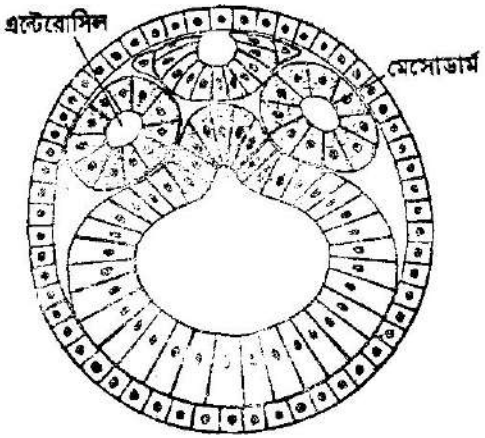

(ঙ)

(চ)

চিত্র ১৯ : অ্যামিফঅক্সাস ভ্রূণের অনুপ্রস্থচ্ছেদে প্রাথমিক অঙ্গাংশ বা স্নায়ুরজ্জু, নটোকর্ড ও মেসোডার্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া দেখানো হয়েছে (Huettner, ১৯৪৯ অনুসরণে)।

নিউরাল নল সৃষ্টি

গ্যাস্ট্রুলা দশার শেষ পর্যায়ে পিঠের মধ্যরেখায় অবস্থিত নিউরাল এক্টোডার্ম কোষগুলো পুরু ও লম্বা হয়ে একটি চাপা প্লেট গঠন করে। একে নিউরাল প্লেট (neural plate) বলে (চিত্র ১৯)। প্লেটটি ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকে।

তখন পাশের মুক্ত এক্টোডার্ম প্রান্ত উপরে উঠে নিউরাল ভাঁজ (neural plate) তৈরি করে। এভাবে দুই ভাঁজের মাঝখানে যে খাতের মতো সৃষ্টি হয় তাকে নিউরাল খাদ (neural groove) বলে (চিত্র ১৯)।

নিউরাল ভাঁজদুটি ব্লাস্টোপোর প্রান্তে আবির্ভূত হয়ে সামনে এগিয়ে আসে এবং ব্লাস্টোপোরকে ঘিরে ফেলে ও পরে মধ্যরেখায় একীভূত হয়। নিউরাল প্লেটও তখন নিজেকে গুটিয়ে নেয়। এরও দু'পাশের কিনারা উপরে উঠে মধ্য-রেখায় একীভূত হয়। একে নিউরাল নল (neural tube) বলে। নিউরাল নলই পরে প্রাণীর সুষুম্না রজ্জুতে পরিণত হয়। এর ভিতরের লম্বালম্বি গহ্বরকে নিউরোসিল (neurocoel) বলে। নলটি কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সামনের প্রান্তে নিউরোপোর (neuropore) নামের একটি খুব ছোট ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত হয়। পিছনদিকে নিউরোসিল ব্লাস্টোপোরের একটি অংশ দিয়ে আর্কেন্টেরনে উন্মুক্ত হয়। এই অংশকে নিউরেন্টেরিক নালী বলে (চিত্র ২০) মধ্য সৃষ্টির আগে পর্যন্ত নিউরোপোর ও নিউরেন্টেরিক নালী এভাবেই থাকে।

নটোকর্ড সৃষ্টি

নিউরাল নলের সাথে নটোকর্ডের ও পরিস্ফুটন শুরু হয়ে যায়। নিউরাল নলের ঠিক নিচে আর্কেন্টেরনের ছাদে মধ্যপিঠে অবস্থিত কর্ডা কোষগুলো (chorda cells) এণ্ডোডার্ম থেকে বহিঃবৃদ্ধি ঘটিয়ে ফিতার মতো আকার ধারণ করে। প্রথমে তা ১২-১৪ কোষ দীর্ঘ ও প্রস্থে তিন কোষের সমান থাকে। ফিতার দুই প্রান্ত নিচের দিকে ভাঁজ হতে থাকে। এ সময় ভ্রূণ লম্বা হয় এবং ব্লাস্টোপোরের মধ্য রেখায় পৃষ্ঠ-ওষ্ঠের কাছের একটি অঞ্চল থেকে অনবরত নটোকর্ডীয় কোষ সৃষ্টি হতে থাকে। ভাঁজরত কোষকালি থেকে উৎপন্ন কোষও এতে যোগ দেয়। সবশেষে দুই ভাঁজের কোষগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে একটি কলানিমিত নিরেট দণ্ডে পরিণত হয়। এটিই নটোকর্ড (চিত্র ১৯)। প্রথম জোড়া সিলোমীয় থলির অংশে তা সৃষ্টি হয়ে সামনে পিছনে লম্বা হয়। নবম ও দশম মেসোডার্মীয় খণ্ড সৃষ্টির পর নটোকর্ড এণ্ডোডার্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়।

নটোকর্ডের কোষগুলো প্রথমে চাকতির মতো থাকে, পরে এদের নিউক্লিয়াই ও সাইটোপ্লাজম অদৃশ্য হয়ে এক ধরনের স্বচ্ছ জেলীর মতো পদার্থে পূর্ণ গহ্বরসমন্বিত কোষে পরিণত হয় এবং কোষের জেলী গঠনকে অবলম্বন দানে এগিয়ে আসে। পিছন-দিকে নিউরেন্টেরিক নালীর কাছে এসে নটোকর্ড থেমে গেলেও সামনে তা মস্তিষ্ককেও ছাড়িয়ে যায়। অন্যান্য কর্ডেটের নটোকর্ডের বৃদ্ধি মধ্য মস্তিষ্কের নিচ পর্যন্ত ঘটে, কিন্তু তত্তোটা সামনে অগ্রসর হয় না।

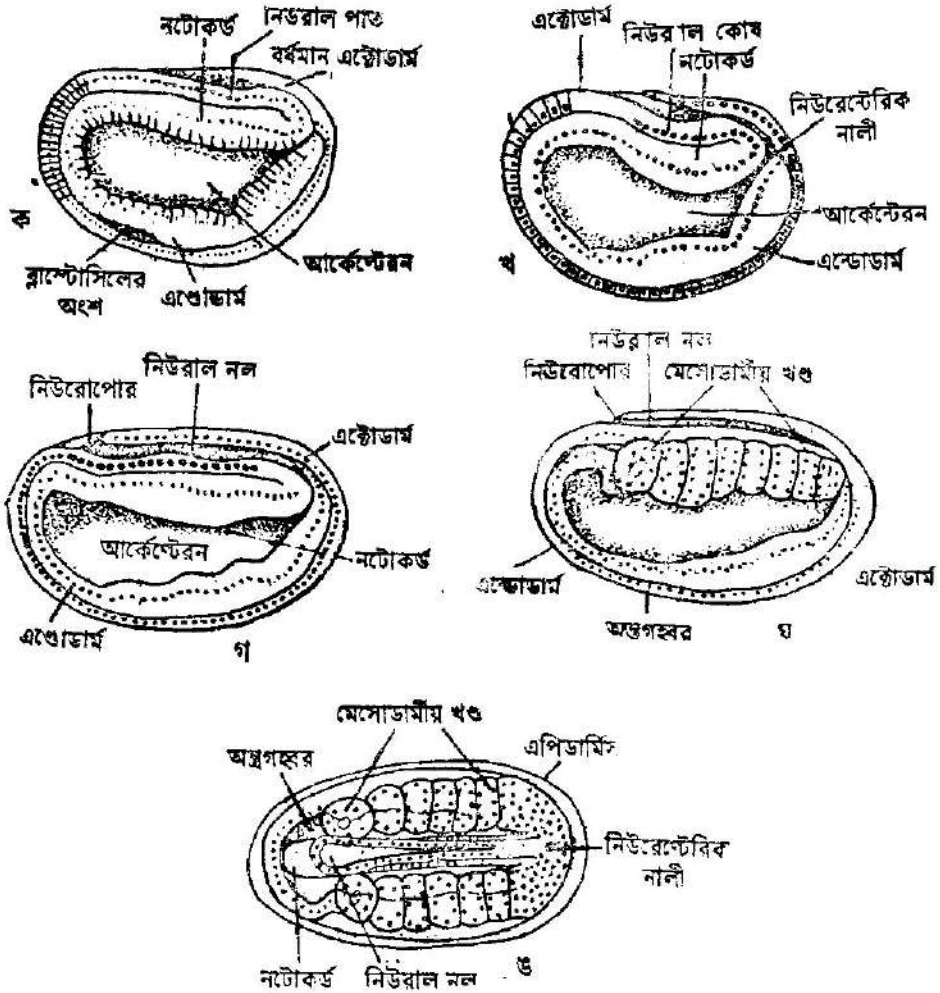

চিত্র ২০ : অ্যামিফঅক্সাসের নিউরুলেশন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ (ক) ও (খ) নিউরুলেশনের প্রাথমিক পর্যায় (গ) প্রায় সম্পূর্ণ নিউরুলা : (ঘ) পরবর্তী পর্যায় ; (ঙ) পূর্ণ নিউরুলা (Balinsky, ১৯৮১ অনুসরণে)।

নটোকর্ডের চারদিকে মেসোডার্মীয় স্ক্লেরোটোম থেকে তন্তুময় যোজক কলার এক আবরণ এসে নটোকর্ডকে মুড়ে দেয়। এই নটোকর্ডীয় আবরণ (Notochordal sheath) সৃষ্টির সাথে সাথে নটোকর্ডের পরিস্ফুটন সম্পন্ন হয়।

মেসোডার্মীয় খণ্ড বা সিলোমীয় থলি সৃষ্টি

নটোকর্ড ও এণ্ডোডার্ম থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া মেসোডার্ম অংশ একসারি কোষপিণ্ডে বিভক্ত হয়। পিণ্ডের কোষগুলো ঘনক্ষেত্রের মতো। কোষপিণ্ডগুলো দু-পাশে এবং দেহের দৈর্ঘ্য অনুসরণ করে পরস্পরের পিছনে বিন্যস্ত হয়। মেসোডার্ম কোষের এ পিণ্ডগুলোকেই মেসোডার্মীয় খণ্ড (mesodermal somite) বলে।

নটোকর্ড ও এণ্ডোডার্ম থেকে মেসোডার্ম কোষ আলাদা হয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মেসোডার্মীয় ফালির ভিতরের দিকে (অর্থাৎ আর্কেন্টেরনমুখী তলে) একটি লম্বা খাদের আবির্ভাব হয়। এ খাদ প্রত্যেকটি মেসোডার্মীয় খণ্ডকে অতিক্রম করে যায়, তাই প্রত্যেকটিতেই পকেটের মতো অন্তর্প্রবেশের সৃষ্টি হয়। একই সময় বাইরের দিক থেকে আসা ফাটল খণ্ডগুলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এভাবে খণ্ডগুলো নটোকর্ড ও এণ্ডোডার্ম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেলে প্রত্যেকটির পকেটের মতো অন্তর্প্রবেশও আর্কেন্টেরন গহ্বর থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং মেসোডার্মীয় খণ্ডের ভিতরে ছোট গহ্বরে পরিণত হয় (পরিস্ফুটনের পরবর্তী ধাপগুলোতে গহ্বর বড় হয়ে পূর্ণবয়স্ক প্রাণীর গৌণ সিলোম সৃষ্টি করে)। এভাবে প্রত্যেকটি মেসোডার্মীয় খণ্ড সিলোমীয় থলি (coelomic pouch)-তে পরিণত হয় (চিত্র ১৯ ও ২২)।

আর্কেন্টেরন গহ্বর থেকে যে মেসোডার্মীয় খণ্ডের গহ্বরের উৎপত্তি হয় তা একেবারে সামনের দু'তিনটি খণ্ডে স্পষ্ট দেখা যায়। পিছনের খণ্ডগুলো প্রথমে নিরেট থাকে, পরে মধ্যখানে কোষগুলো আলাদা হয়ে গেলে গহ্বর সৃষ্টি হয়। এভাবে ৬১ জোড়া পর্যন্ত মেসোডার্মীয় খণ্ডের উৎপত্তি হয়।

সিলোমীয় থলি আর্কেন্টেরন থেকে মুক্ত হয়ে এক্টোডার্ম ও এণ্ডোডার্মের মাঝখানে একসারি থলিতে পরিণত হয়। থলিগুলো জোড় এবং খণ্ডকীয়ভাবে সাজানো থাকে। এদের প্রাচীর থেকে মেসোডার্ম এবং পরে গহ্বরগুলোর একীকরণের মধ্য দিয়ে সিলোমের (এন্টারোসিল) উৎপত্তি হয়।

নটোকর্ড ও মেসোডার্মীয় খণ্ড যখন এণ্ডোডার্মীয় অংশ থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয় তখন এণ্ডোডার্মের মুক্ত প্রান্ত পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে পিঠের মধ্যরেখায় মিলিত হয়। এই গহ্বর পরে পৌষ্টিক নালীর গহ্বরে পরিণত হয় (চিত্র ১৯ চ)।

এ প্রসঙ্গে মেসেডোর্মের একধরনের শ্রেণীবিন্যাসের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেখা যায় যে, প্রথমে আট বা দশ জোড়া খণ্ড উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে আর্কেন্টেরন প্রাচীরে অবস্থিত মেসোডার্ম ভাঁজ সৃষ্টির মাধ্যমে গঠিত হয়,

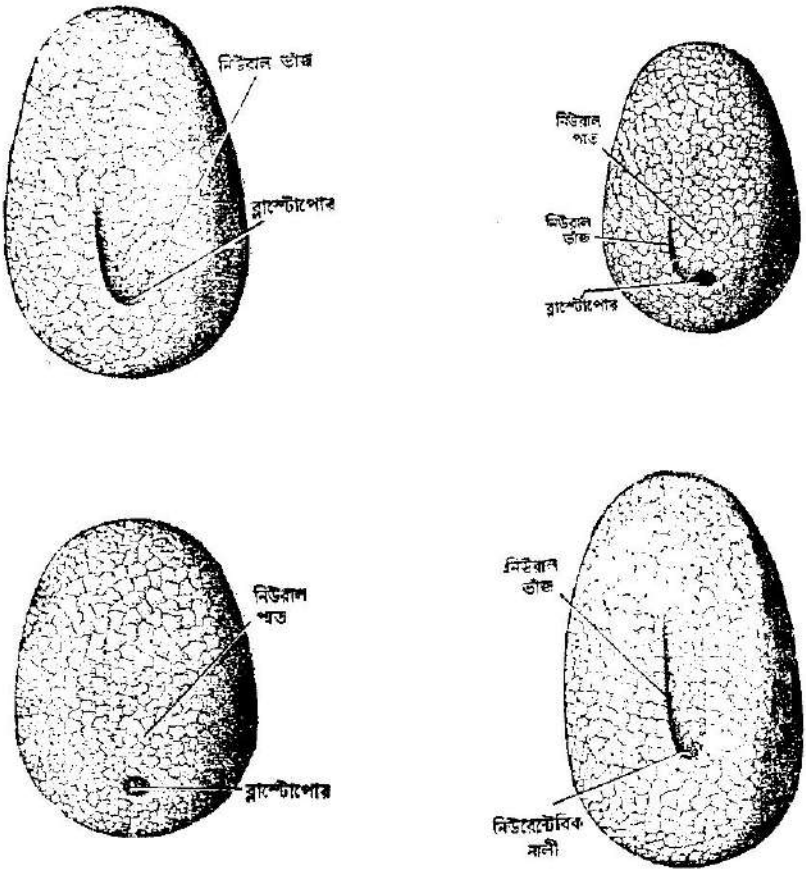

চিত্র ২১ : অ্যামিফঅক্সাসের গ্যাস্ট্রুলায় নিউরাল ভাঁজ সৃষ্টিতে ব্লাস্টোপোরের উপরে এক্টোডার্মের বহিঃবৃদ্ধি (Huettner, ১৯৪৯ থেকে)।

আর পরবর্তী খণ্ডগুলো ভ্রূণ যখন লম্বা হয় তখন ব্লাস্টোপোর ওষ্ঠের পৃষ্ঠ-পার্শ্বীয় অঞ্চলের মেসোডার্ম থেকে সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে, প্রথমোক্ত খণ্ড-মেসোডার্ম (somite-mesoderm)-কে গ্যাস্ট্রাল (gastral) আর শেষোক্তকে পেরিস্টোমিয়াল (peristomial) মেসোডার্ম নামে অভিহিত করা হয়। কনক্লিন (Conklin, ১৯১২) মন্তব্য করেছেন যে, সব মেসোডার্মই প্রথমে ব্লাস্টোপোরের ঠোঁটে থাকে, তাই এই ধরনের শ্রেণী-বিন্যাস অযৌক্তিক, অর্থাৎ সব মেসোডার্মই প্রকৃতপক্ষে পেরিস্টোমিয়াল।

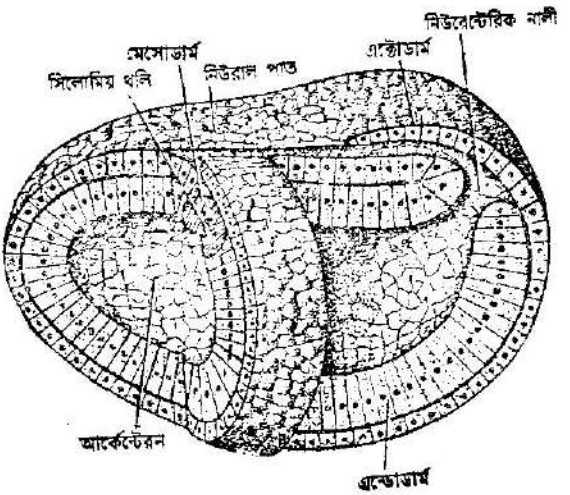

চিত্র ২২ ক : অ্যাম্ফিঅক্সাসের ভ্রূণের বেসোডার্মীয় থলি সৃষ্টি, (Huettner, ১৯৪৯ অনুসরণে)।

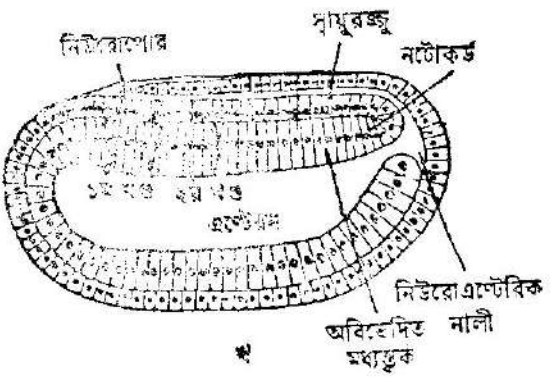

চিত্র ২২ খ : অ্যাম্ফিঅক্সাস ভ্রূণের দুই খণ্ডীয় দশা (McEwen, ১৯৬৯ অনুসরণে)।

পৌষ্টিক নালীর সৃষ্টি

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নটোকর্ড এবং মেসোডার্মীয় খণ্ডগুলো যখন এণ্ডোডার্মীয় অংশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেয়, তখন এণ্ডোডার্মের মুক্ত প্রান্ত পরস্পরের মুখোমুখি এগিয়ে এসে পিঠের মধ্যরেখায় একীভূত হয়ে যায়। এভাবে এণ্ডোডার্ম একটি বদ্ধ থলিতে রূপান্তরিত হয়, আর থলির গহ্বর পৌষ্টিক নালীর গহ্বরে পরিণত হয়।

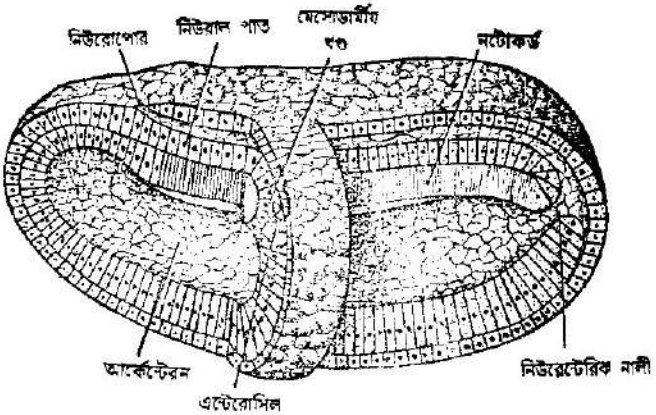

চিত্র ২২ গ : অ্যাম্ফিঅক্সাস ভ্রূণের পৃথকীকৃত মেসোডার্মীয় থলি (Huettner, ১৯৪৯ অনুসরণে)।

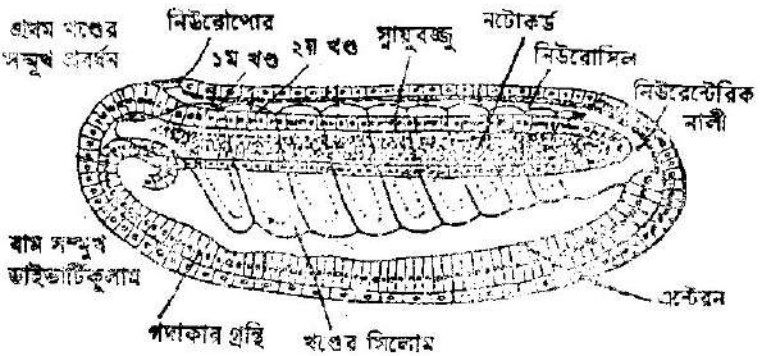

চিত্র ২৩ : সম্মুখ অন্ত্র ডাইভার্টিকুলাসহ অ্যাম্ফিঅক্সাস ভ্রূণ (নয় দেহ খণ্ডীয় অবস্থা) (McEwen, ১৯৬৯ অনুসরণে)।

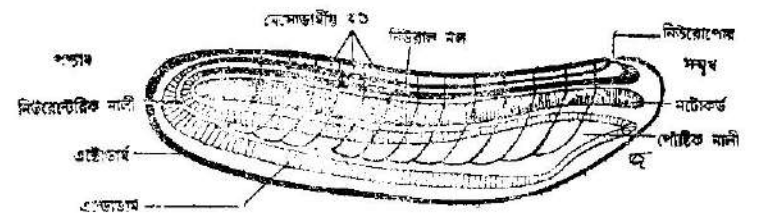

চিত্র ২৪ ক : দ্বাদশ খণ্ড পর্যায়ের অ্যাম্ফিঅক্সাস ভ্রূণ (Freeman and Bracegirdle, ১৯৭৮ অনুসারে)।

অন্ত্রের সম্মুখ প্রান্তে আটটি মেসোডার্মীয় খণ্ড সৃষ্টির পর একটি প্রশস্ত, পৃষ্ঠীয় উপবৃদ্ধি বের হয়ে নটোকর্ডের দুই ধার ঘেঁষে উপরে উঠে যায়। পরে তা ডান ও বাম পৃষ্ঠীয় ডাইভার্টিকুলায় বিভক্ত হয়। বাম ডাইভার্টিকুলামটি ছোট ও পুরু, এবং এক্টোডার্মের একটি গর্তের সাথে মিলে প্রি-ওরাল গর্ত (pre-oral pit) নামে একটি সংবেদ অঙ্গ সৃষ্টি করে (চিত্র ২৪, খ)। অন্যদিকে, ডান ডাইভার্টিকুলাম বড় ও পাতলা প্রাচীরে মোড়ানো এবং তা থেকে প্রি-ওরাল গহ্বর (pre-oral cavity) সৃষ্টি হয়।

চিত্র ২৪ খ : সপ্তদশ খণ্ড পর্যায়ে অ্যাম্ফিঅক্সাস ভ্রূণ (Freeman and Bracegirdle, ১৯৭৮ অনুসরণে)।

সম্মুখ ডাইভার্টিকুলাম আলাদা হয়ে যাওয়ার পর অন্ত্রের সামনের অংশের মেঝের কোষগুলো স্তম্ভাকার ধারণ করে এবং একটি লম্বা গর্তের সৃষ্টি করে। একে এণ্ডোস্টাইল বা হাইপোফ্যারিঞ্জিয়াল খাদ (endostyle or hypopharyngeal groove) বলে।

আরও পরে পৌষ্টিক নালী থেকে ফাঁপা উপবৃদ্ধি বের হলে যকৃতের উৎপত্তি হয়। গলবিল গঠনের জন্য অন্ত্রের সামনের অংশ বিশাল আকার ধারণ করে।

লার্ভার গঠন

নিষেকের ৯২ ঘণ্টা পর যখন দুই জোড়া দেহখণ্ড সৃষ্টি হয় তখন লম্বা ও দুই পাশে চাপা ভ্রূণ নিষেক ঝিল্লী ভেদ করে বেরিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি আরও সাতটি খণ্ড সৃষ্টি হয়ে দেহখণ্ডের সংখ্যা যখন নয়টিতে এসে দাঁড়ায় তখন ভ্রূণকে লার্ভা বলে।

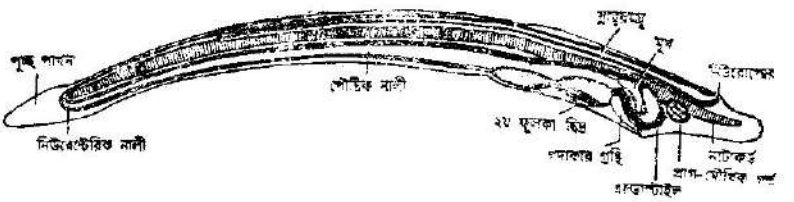

চিত্র ২৪গ : দুটি ফুলকা ছিদ্র পর্যায়ের অ্যাম্ফিঅক্সাস লার্ভা (Freemen and Bracegirdle, ১৯৭৮ অনুসরণে)।

অ্যাম্ফিঅক্সাসের তরুণ লার্ভায় মুখ ও পায়ু থাকে না, তাই তারা খেতেও পারে না। দেহের সমস্ত এপিডার্মিস সিলিয়ায় আবৃত। সিলীয় আন্দোলনে লার্ভা চলন সম্পন্ন করে, বেশ ভাল করেই সাঁতরাতে পারে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে পিছন দিকে দেহখণ্ডের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এভাবে দেহ লম্বা হয়। নটোকর্ড প্রসারিত হয়ে সামনের প্রান্তে একেবারে শীর্ষে পৌঁছায়। সামনের প্রান্ত সূঁচালো হয়, পিছনের প্রান্তে পৌচ্ছিক পাখনার আবির্ভাব ঘটে (চিত্র ২৪ ও ২৫)।

লার্ভার পরিস্ফুটন

পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য লার্ভাকে অনেকগুলো পরিস্ফুটনগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। নিচে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

(১) মুখ: লার্ভার দেহে ১৬-১৮ জোড়া মেসোডার্মাল খণ্ডের উৎপত্তি হলে দেহের সামনের প্রান্তে দ্বিতীয় খণ্ডের লেভেলে মুখের সৃষ্টি হয়। মাথার তলায় কিছুটা বাম পাশে এক্টোডার্ম এণ্ডোডার্মের সাথে একীভূত হয়ে যায়। এই অংশে চেরাছিদ্রের মতো মুখছিদ্রের আবির্ভাব ঘটে। মুখের চারধারে সিলিয়া থাকে। পরিস্ফুটনের পরবর্তী ধাপগুলোতে মুখ মধ্য-তলীয় অবস্থানে সরে আসে।

দ্রুত ভেলাম ও ওরাল হুড আবির্ভূত হয় এবং প্রি-ওরাল পিট থেকে হুইল অঙ্গ, হ্যাশেচকের নেফ্রিডিয়াম ও হ্যাশেচকের পিট বা গর্তও সৃষ্টি হয় (চিত্র ২৬)।

(২) মধ্য-অন্ত্র ডাইভার্টিকুলাম (Midgut diverticulum): এ অঙ্গটি মধ্য অন্ত্র থেকে একটি ফাঁপা উপবৃদ্ধির মতো সৃষ্টি হয়।

(৩) ফুলকা-ছিদ্র: প্রথম ফুলকা-ছিদ্রটি মধ্যতলীয়ভাবে সৃষ্টি হয়ে ডানদিকে সরে যায়। মুখের কাছাকাছি আর্কেন্টেরনের মেঝের একটি অবতল অংশ সৃষ্টি হয়ে পরে গদাকার গ্রন্থিতে পরিণত হয়। আসলে এটি একটি রূপান্তরিত ফুলকা ছিদ্র।

শুরুতে ফুলকা ছিদ্রের পরিস্ফুটন পেশীখণ্ড বা মায়োমিয়ারের সাথে সামঞ্জস্য-পূর্ণ থাকে। প্রথমে ১৪টি ফুলকা-ছিদ্রের এক অনুলম্ব সারি গঠিত হয়। ৮টি ফুলকা ছিদ্রের আরেকটি অনুলম্ব সারি সৃষ্টি হয়ে প্রথম সারির পিঠের দিকে অবস্থান নেয়। এভাবে, ডানদিকে দুটি সমান্তরাল ফুলকা ছিদ্রের সারি গঠিত হয়, কিন্তু বামপাশে একটি সারিও থাকে না। তবে পরে তলদেশীয় সারি বামপাশে সরে আসে এবং প্রথম ও শেষ পাঁচটি ফুলকা-ছিদ্র অদৃশ্য হয়ে যায়। এর জন্য ফুলকা-ছিদ্রের সংখ্যা ও সাম্যতায় কোন বৈষম্য থাকে না।

প্রথমে প্রত্যেকটি ফুলকাই সরল থাকে, কিন্তু পরে বিশেষ দণ্ডের উপস্থিতির জন্য তা মুখ্য ও গৌণ ফুলকা-ছিদ্রে রূপ নেয় (চিত্র ২৬)।

চিত্র ২৫ : তিনটি ফুলকা ছিদ্র দশায় অ্যাম্ফিঅক্সাস লার্ভা (Freeman and Bracegirdle, ১৯৭৮ অনুসরণে)।

চিত্র ২৬ : অপরিণত বয়স্ক অ্যাম্ফিঅক্সাস (Freeman and Bracegirdle, ১৯৭৮ অনুসরণে)।

(৪) নেফ্রিডিয়া ঃ আদি ফুলকা-ছিদ্রের নিচের কিনারায় যে এডোস্টার্ম কোষের একটি পেয়ালার মতো পিণ্ড থাকে তা থেকে নেফ্রিডিয়া পরিস্ফুটিত হয়। এগুলো তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পেয়ে ফাঁপা হয়। ফাঁপার ভিতরে সোলেনোসাইট (solenocyte) উৎপন্ন হয়।

(৫) অন্যান্য ঃ বয়সের সাথে লার্ভাও লম্বা হয়, এর সম্মুখ প্রান্ত সুঁচালো এবং পিছনের প্রান্তে পৌচ্ছিক পাখনা আবির্ভূত হয়। নতুন নতুন দেহখণ্ড পিছনে সংযোজিত হয়; নটোকর্ড প্রসারিত হয়ে সম্মুখ প্রান্তের শীর্ষে এসে পৌঁছায়; অক্ষিবিন্দু ও ঘ্রাণজ বা অলফেক্টরি (olfactory) গর্তের সৃষ্টি হয় এবং পিছনের প্রান্তে তলীয়-দেশের খানিকটা বাম পাশে পায়ুর উদ্ভব ঘটে।

(৬) অ্যাট্রিয়াম ঃ ফুলকা-ছিদ্রের সৃষ্টির সময়ই অ্যাট্রিয়ামও আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে তা ফুলকা-ছিদ্রের পিছনে দেহের তলীয়দেশে একজোড়া অনুলম্ব ভাঁজ হয়ে পরিস্ফুট হয়। এদের মেটাপ্লিউরাল ভাঁজ (metapleural fold) বলে। ফুলকা-ছিদ্রের পিঠ ধরে তারা এগিয়ে যায়।

প্রত্যেকটি ভাঁজের ভিতরের তলীয়দেশ থেকে একটি করে উপঅ্যাট্রিয়াল রিজ (subatrial ridge) বেরিয়ে মধ্যরেখায় অগ্রসর হয়। পরে তলীয় দেহপ্রাচীরের নিচে একীভূত হয়ে এক্টোডার্মে আবৃত গঠন একটি নল করে। এটিই হচ্ছে অ্যাট্রিয়াম। প্রথমে এর দু'দিকই খোলা থাকে, পরে সামনের ছিদ্র বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু পিছনেরটি অ্যাট্রিওপোর হিসেবে থেকে যায়।

অ্যাট্রিয়াম ধীরে ধীরে দেহের দু'পাশে উপরের দিকে বেড়ে উঠে। লার্ভা যখন প্রায় পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় পৌঁছায় তখন অ্যাট্রিয়াম স্প্ল্যাংকনোসিলকে জননাঙ্গের চারদিকে সংকুচিত করে আশ পাশ দখল করে নেয়। ফুলকা-ছিদ্রও অ্যাট্রিয়ামে উন্মুক্ত হয়।

লার্ভার অপ্রতিসমতা

পূর্ণাঙ্গ অ্যাম্ফিঅক্সাস দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণী, কিন্তু লার্ভায় কয়েকটি অঙ্গের বিন্যাসের জন্য তা অপ্রতিসমতা প্রদর্শন করে। এ ধরনের কয়েকটি অঙ্গের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো।

(১) মুখ প্রথমে দেহের সামনের প্রান্তে মধ্যতলীয় অক্ষের পরিবর্তে কিছুটা বাম পাশে আবির্ভূত হয়।

(২) অন্ত্রের সামনের অংশ থেকে যে দুটি ডাইভার্টিকুলাম বের হয় তাদের মধ্যে ডান ডাইভার্টিকুলাম বামটির চেয়ে বড়।

(৩) ফুলকা-ছিদ্রও অপ্রতিসমভাবে আবির্ভূত হয়। ফুলকা-ছিদ্রের দুই সেটিই প্রথমে ডানদিকে পরিস্ফুট হয়। পরে এদের সমতা ফিরে আসে।

রূপান্তর

তিন মাস প্ল্যাঙ্কটন খেয়ে লার্ভা ধীরে ধীরে বড় হয়। অবশেষে নিমজ্জিত হয়ে সমুদ্রের তলায় এসে পড়ে। এখানেই এদের রূপান্তর ঘটে এবং রূপান্তর শেষে দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম পূর্ণাঙ্গ অ্যাম্ফিঅক্সাসে পরিণত হয়। এ সময় সংঘটিত প্রধান পরিবর্তনগুলো হচ্ছে :

(১) মুখ মধ্যরেখায় সরে আসে এবং ছোট হয়;

(২) মুখের চারদিকে ত্বকের একটি ভাঁজ থেকে ওরাল হুডের সৃষ্টি হয়;

(৩) গলবিল-প্রাচীরে এণ্ডোস্টাইল পরিস্ফুট হয়ে মেঝের দিকে সরে যায় এবং V-আকৃতি ধারণ করে।

(৪) ফুলকা-ছিদ্রের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং ওরা খাড়াভাবে লম্বা হয়;

(৫) পৌচ্ছিক-পাখনার বিলোপ ঘটে; এবং

(৬) পেশীখণ্ডের তলীয় অংশের বাইরের দিক থেকে জনন অঙ্গ উৎপত্তি লাভ করে।

পরিস্ফুটনের ভ্রূণতত্ত্বীয় গুরুত্ব

অ্যাম্ফিঅক্সাসের পরিস্ফুটন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর প্রাথমিক ভ্রূণীয় পর্যায়গুলো (ক্লিভেজ, ইনভেজিনেশন, মেসোডার্ম সৃষ্টি প্রভৃতি) একদিকে যেমন ইকাইনোডার্মগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তেমনি প্রক্রিয়াগুলোকে মেরুদণ্ডী পরিস্ফুটনের সরলতম রূপ বলেও বিবেচনা করা যায়। অকর্ডেট ও কর্ডেটদের মধ্য সম্ভাব্য সম্পর্ক খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা হিসেবে অ্যাম্ফিঅক্সাসের পরিস্ফুটন প্রণালীর খুঁটিনাটি আমাদের জানা উচিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যাঙের পরিস্ফুটন

সোনা ব্যাঙের (*Rana* sp) ভ্রূণতত্ত্বকে একটি আদর্শ বা প্রকৃত মেরুদণ্ডীর পরিস্ফুটনের প্রথম উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর কয়েকটি কারণ হচ্ছে: (১) এর প্রাথমিক ইতিহাস অ্যাম্ফিঅক্সাস ও উচ্চতর প্রাণীদের মধ্যবর্তী পরিবর্তনকালীন অধ্যায়কে চমৎকারভাবে প্রদর্শন করে। (২) এর পরিস্ফুটন বিবর্তনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে একটি সম্পূর্ণ জলচর ও ফুলকা-শ্বসনে অভিযোজিত মেরুদণ্ডী ফুসফুসীয় শ্বসনে অভিযোজিত ও স্থলচর হিসেবে উভচরদের চমৎকার চিত্র ফুটিয়ে তোলে। (৩) এতে প্রায় সব মৌলিক মেরুদণ্ডী তন্ত্রগুলো পরিস্ফুটিত হয় এবং তা অনেক ক্ষেত্রে আদি প্রকৃতি বজায় রাখে। এসব আদি প্রকৃতির গঠনকে সহজেই অন্য প্রাণীদের সাথে তুলনা করে জটিলতার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জানা যায়। (৪) স্বাভাবিক পরিবেশেই এর পরিস্ফুটন সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করা যায়। (৫) প্রাণীটি সুলভ, পরিচালনে সহজ, তাছাড়া গবেষণাগারে সহজেই লালন-পালন করা যায়।

এ অধ্যায়ে উওগোনিয়া থেকে শুরু করে ভ্রূণীয় স্তর সৃষ্টি পর্যন্ত আলোচনা করা হবে।

উওগোনিয়া

জনন ঋতুতে ডিম্বাশয় থেকে সব পরিণত ডিম্ব দেহ-নির্গত হলে কিছু সংখ্যক উওগোনিয়া পূর্ণোদ্যমে ভাগ হয়ে পরবর্তী জনন ঋতুর জন্য ডিম্বাণু উৎপাদনে সক্রিয় হয়। অনেকগুলো উওগোনিয়ামের মাঝ থেকে একটিমাত্র কোষ ডিম্বাণুতে পরিণত হয়, বাকিগুলো এর ফলিকল নির্মাণ করে। এর পর পরই ডিম্বাণুর বৃদ্ধি ও ঝিল্লী সৃষ্টি শুরু হয় (চিত্র ২৭)।

বৃদ্ধি

তরুণ ডিম্বাণু বা উওসাইট বৃদ্ধি দশায় উপনিত হয়ে কুসুম সঞ্চয় শুরু করে দেয়। এ প্রক্রিয়ার আগে নিউক্লিওলাই নিউক্লীয় ঝিল্লীর নিচে চলে আসে। সাইটোপ্লাজমেও ক্ষার-আকর্ষী (basophilic) নিউক্লিয়াইয়ের আবির্ভাব ঘটে। ওরা

প্রথমে কোষঝিল্লীর প্রান্তে ও পরে নিউক্লিয়াসের পরিধিতে গিয়ে হাজির হয়। তখন উওসাইট তলের ঠিক নিচে দানার মতো কুসুমের সৃষ্টি হয়। সম্ভবত গলজি বস্তু, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস থেকে কুসুম কণা উৎপন্ন হয়। দানার স্তর ধীরে

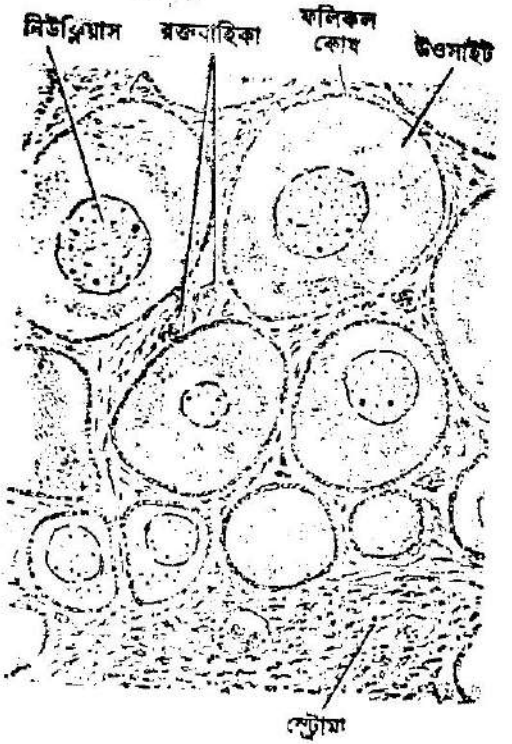

চিত্র ২৭ : উওসাইটসহ ডিম্বাশয়ের একাংশের প্রস্থচ্ছেদ (Huettner, ১৯৪৯ থেকে)।

ধীরে চওড়া হয়, দানাগুলোও বড় হয় (চিত্র ২৮ খ, ঘ, ঙ)। শেষে সমগ্র সাইটো-প্লাজমই কুসুমে ভরে যায়, তবে ভবিষ্যত ভেজিটাল মেরুতে কণাগুলো বেশি ঘনীভূত থাকে। মেরু সৃষ্টির কারণ অবশ্য জানা যায়নি। তবে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় বেশ আগে থেকেই। তখন রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিনের নতিমাত্রা (gradient) প্রতিষ্ঠিত হয়। নিউক্লিয়াস প্রাণী মেরুতে সরে যায়, এবং প্রাণীঅর্ধের নিচে রঞ্জক কণা জমা হয়। রঞ্জক কণা তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায়। নিরক্ষরেখার নিচে তা হালকা হয়ে ভেজিটাল মেরুতে সাদাটে বর্ণ ধারণ করে। এসময়

ডিম্বাণু দুটি ঝিল্লী অর্জন করে। নিচের ঝিল্লীটি অত্যন্ত নমনীয় এবং ডিম্বাণুর গায়ে সেঁটে থাকে। ডিম্বাণুর নিজের সৃষ্টি এই ঝিল্লীকে ভিটেলাইন ঝিল্লী (vitelline membrane) বলে। বাইরের ঝিল্লীটি পাতলা, কিন্তু শক্ত এবং তা ফলিকল থেকে সৃষ্ট। এই গৌণ ঝিল্লীর নাম কোরিওন (chorion)।

ডিম্বাণুর বৃদ্ধি ও ঝিল্লী অর্জনের সময় নিউক্লিয়াস বিভিন্ন পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে প্রথম পরিপক্বতা বিভাজনের পর্যায়ে চলে যায়। জাইগোটিন (চিত্র ২৮, ক)-এর পর ক্রোমাটিন সূত্রগুলো কিছুটা কম দৃশ্যমান হয়, ফলে প্রথম পরিপক্বতা বিভাজনের জন্য পরে যখন হেটেরোক্রোমোজমের আবির্ভাব ঘটে তখন ওরা ক্রোমোটিন নিউক্লিওলাই থেকে এসেছে মনে হয়। এমনটি হওয়ার কথা নয়। সম্ভবত স্বাভাবিক নিয়মেই ওরা ক্রোমোনেমা সূত্র থেকেই আবির্ভূত হয় (চিত্র ২৮, গ, ঘ, ঙ, চ)। শীতঘুমে যাওয়ার আগেই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ডিম্বপাত

বসন্ত এলেই ব্যাঙের ডিম্বপাত হয়। তখন পুরুষ ও স্ত্রী ব্যাঙকে জোড় বেঁধে আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। এ আলিঙ্গনকে অ্যামপ্লেক্সাস (amplexes) বা যৌনালিঙ্গন বলে। ডিম ছাড়ার সবটুকু সময় জুড়ে ওরা এভাবে থাকে। এক সময় মনে করা হত যে, পুরুষ ব্যাঙের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হলে স্ত্রী ব্যাঙ উত্তেজিত হয়ে ডিম পাড়ে, আর পুরুষ ব্যাঙেরও শুক্রাণু স্খলন ঘটে। রাঘ (Rugh, ১৯৩০) দেখিয়েছেন যে, ডিম ছাড়ার জন্য এসবের প্রয়োজন নেই। তিনি প্রমাণ করেছেন, পিটুইটারি গ্রন্থির অন্যতম নিঃসরণ বৃদ্ধি পেলেই ডিম্বপাত হয়। কুচি-কুচি করে কাটা পিটুইটারি গ্রন্থি স্ত্রী ব্যাঙের দেহে সূঁচ দিয়ে প্রবেশ করালে যে কোন সময়ই ওর ডিম্বপাত ঘটানো যায়, অবশ্য তখন যদি পরিণত ডিম্বাণু থাকে তাহলেই তা সম্ভব হবে।

ডিম্বপাতের প্রক্রিয়াটি হচ্ছে — ডিম্বাশয়িক ফলিকল বিদীর্ণ হলে (চিত্র ২৯) পরিণত ডিম্বাণু ডিম্বাশয়ের এপিথেলীয় আবরণ ভেদ করে সিলোমে এসে পড়ে। পেরিটোনিয়ামের সিলিয়া আন্দোলিত হয়ে ডিমগুলোকে ডিম্বনালীর চুঙ্গি বা ইনফাণ্ডিবুলামের দিকে তাড়িত করে। এ অংশটিও সিলীয় এবং এই সিলিয়াও একইভাবে ডিমকে ডিম্বনালীর ভিতরে পাঠিয়ে দেয়।

প্রথম পরিপক্বতা বিভাজন

ডিম্বপাতের সময় নিউক্লীয় ঝিল্লী গলে যায়। এর কিছুক্ষণ পরেই প্রথম পরিপক্বতা বিভাজন ঘটে। তখন সেন্ট্রিওল, সেন্ট্রোজোম বা অ্যাস্টার কিছুই দেখা যায় না,

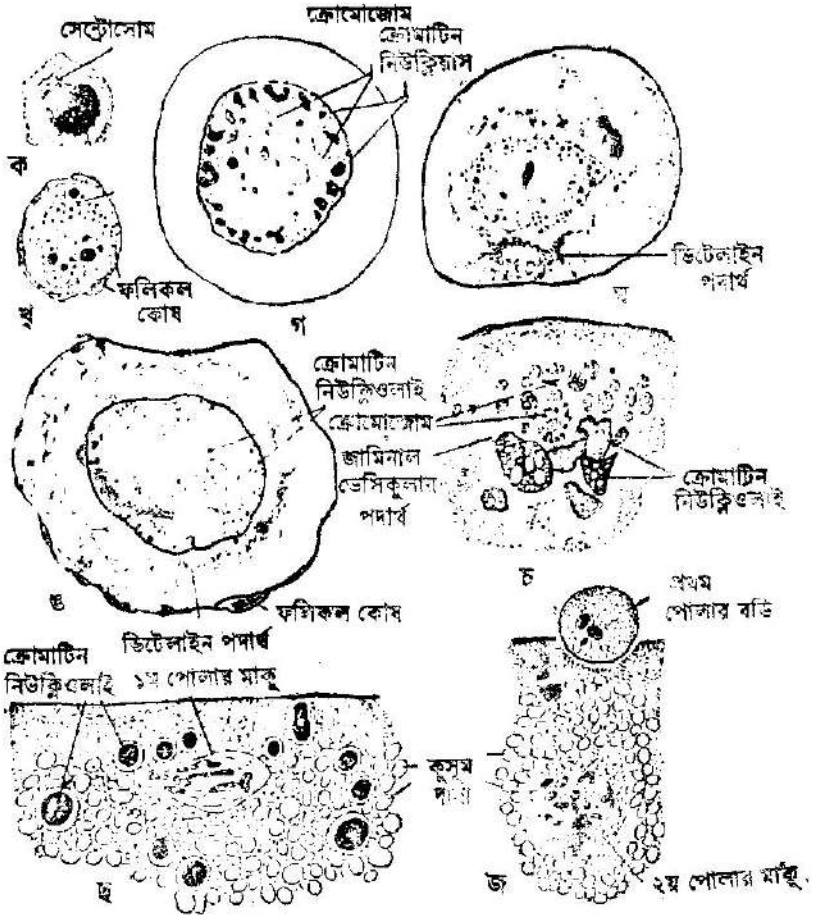

চিত্র ২৮ : ব্যাঙ *(Rana temporaria)*-এ ওজেনেসিস প্রক্রিয়া, (ক) প্রাথমিক ওওসাইট ; (খ) ভিটেলাইন পদার্থসহ প্রাথমিক ওওসাইট, (গ) পালকের মত ক্রোমোজোম ও ক্রোমাটিন নিউক্লিওলাইযুক্ত প্রাথমিক ওওসাইট ; (ঘ) বলয়াকৃতির ভিটেলাইন পদার্থসহ প্রাথমিক ওওসাইট (ঙ) প্রাথমিক ওওসাইটে দুটি অঞ্চলে সাইটোপ্লাজম, (চ) নিউক্লিয় ঝিল্লীবিহীন নিউক্লিয় অঞ্চল এবং ছোট ও বড় ক্রোমাটিন নিউক্লিয়াই ; (ছ) প্রাথমিক অবস্থানে প্রথম পোলার মাকু (জ) প্রথম পোলার বডি ও দ্বিতীয় পোলার মাকুর সৃষ্টি (McEwen, ১৯৬৯ অনুসরণে)

বরং তন্তুময় প্রোটোপ্লাজম থেকে মাকুর উৎপত্তি হয় এবং ক্রোমোজোমের বিভক্তি ঘটে। ডিম্বনালীর উপরের অংশে থাকার সময় প্রথম পোলার বডি বেরিয়ে কোরিওনিক

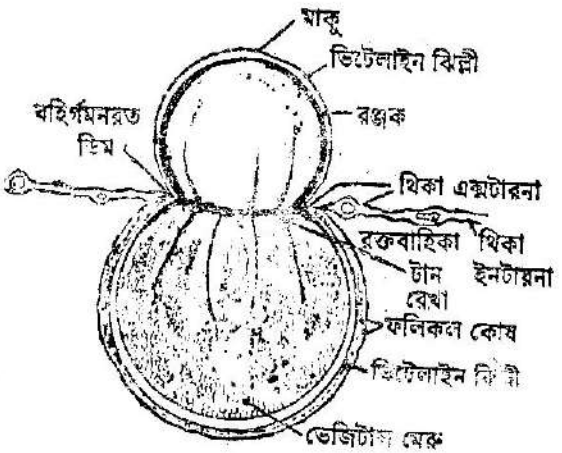

চিত্র ২৯ : ব্যাঙে ফলিকুলার আবরণ কাটিয়ে ডিম্বপাত।

ঝিল্লীর নিচে এসে অবস্থান নেয়। এর পরপরই দ্বিতীয় বিভক্তির জন্য মাকু সৃষ্টি হয় এবং বিভক্তি মেটাফেজ ধাপ পর্যন্ত এগিয়ে যায়। নিষেক না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই থাকে।

টারসিয়ারি ডিম্বঝিল্লী

ইনফাণ্ডিবুলাম থেকে জরায়ুর দিকে যাওয়ার পথে ডিম্বনালীর প্রাচীর থেকে ডিম্বাণুর চারদিকে ৩-৪ স্তর অ্যালবুমেনময় পদার্থ নিঃসৃত হয়ে টারসিয়ারি ডিম্বঝিল্লী নির্মাণ করে (চিত্র ৩০)। ডিম্বনালীর মধ্যে স্তরগুলোকে চিহ্নিত করা দুঃসাধ্য, তবে পানির সংস্পর্শে আসার সাথে সাথেই তা করা যায়।

ডিম প্রসব

ইনফাণ্ডিবুলামে প্রবেশের দু'ঘণ্টা পর ডিম্বাণু জরায়ুতে এসে পৌঁছে এবং জরায়ু ডিমে ভরে না যাওয়া পর্যন্ত দু'একদিন এখানেই থাকে। এর পরে পানিতে নির্গত হয়। কোন কোন ব্যাঙ এভাবে একবারই ডিম পাড়ে, যেমন আমেরিকার কাঠ ব্যাঙ (American Wood Frog)। অন্যান্য ব্যাঙে জরায়ু ডিমে

ভরে গেলেই তা প্রসব করে এবং এভাবে দীর্ঘ সময় ধরে ডিম ছাড়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। আমেরিকার ব্যাঙে তা কয়েকদিন, ইউরোপীয় ব্যাঙে সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলে। তবে শীতের জন্য এই প্রক্রিয়া সবসময়ই বিলম্বিত হয়।

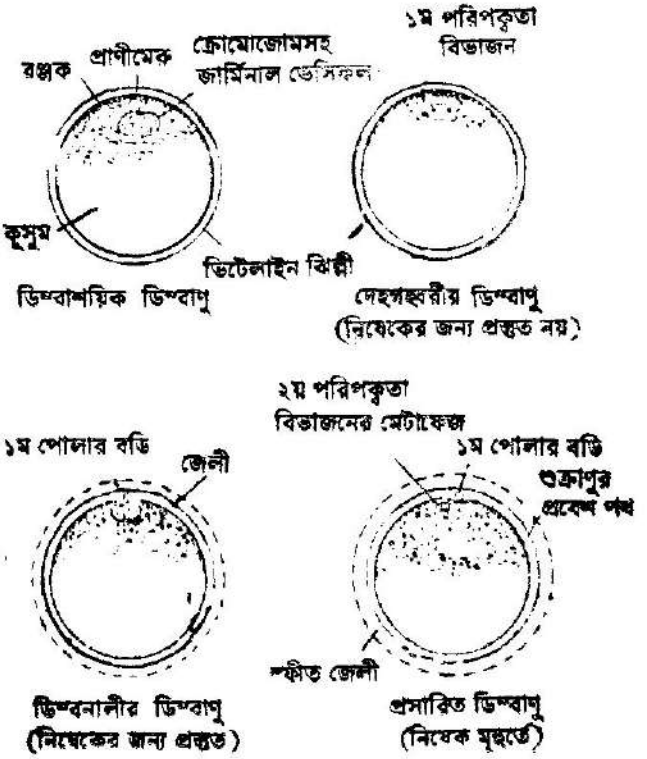

চিত্র ৩০ ক : ব্যাঙ *(Rana pipiens)* এর ডিম্বাণুর পরিপক্বতা।

ডিম ছাড়ার সময় জুড়ে পুরুষ ও স্ত্রী ব্যাঙ আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকে। যেসব ব্যাঙ অনেকবার ডিম পাড়ে তারা সাধারণত খুব ভোরে ডিম পাড়ে, কিন্তু পুরুষটি সারা দিন-রাতই স্ত্রীকে বাহুবন্ধনে ধরে রাখে এবং ডিম নির্গত হলে তাতে শুক্রাণু স্খলন করে। অ্যামপ্লেক্সাস ডিম্বপাতের সাথে সম্পর্কিত না হলেও ডিম ছাড়ার জন্য তা উদ্দীপকের কাজ করে। অ্যামপ্লেক্সাস না ঘটলে স্ত্রীর জরায়ু থেকে ডিম বের করার জন্য 'ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেয়া'-র ব্যবস্থা নিতে হয়।

এক ঋতুতে প্রসবিত ডিমের সংখ্যা প্রজাতি ও সদস্যভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে, যেমন ***Rana tamporaria***-য় ১,০০০—২,০০০, আবার ***Rana esculanta***য়- ৫,০০০ - ১০,০০০।

প্রশ্ন জাগতে পারে, পুরুষ ব্যাঙটি অ্যামপ্লেক্সাসে উদ্বুদ্ধ হয় কেন ? মনে হতে পারে যে, আশেপাশে স্ত্রী সদস্যকে দেখে বা তার জরায়ুতে ডিম আছে ভেবেই হয়তো মিলনালিঙ্গনের বাসনা জাগে। আসলে তা নয়। স্ত্রী প্রাণীতে ডিম্বপাতের মতই পুরুষে শুক্রাণু স্খলন সম্পূর্ণভাবে সম্মুখ পিটুইটারির নিঃসরণের উপর নির্ভরশীল (Rugh, ১৯৩৭)। এই নিঃসরণ শুধু পুরুষকে স্ত্রী ব্যাঙের বা সুবিধাজনক বস্তুর সাথে অ্যামপ্লেক্সাসেই উদ্বুদ্ধ করে না, শুক্রাশয়ের সার্টলি কোষ থেকে পরিণত শুক্রাণু স্খলনও উদ্দীপ্ত করে। হরমোনের প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির পূর্ব পর্যন্ত পুরুষ ব্যাঙ স্ত্রী ব্যাঙের দিকে ফিরেও তাকায় না, এমনকি ওর পেট ভরা ডিম থাকলেও না।

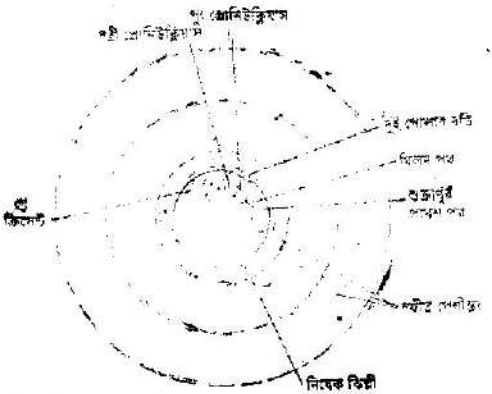

চিত্র১০ খ : ব্যাঙ ***(Ramna pipiens)*** এর ডিম্বাণুর নিষেক।

নিষেক

শুক্রাণুর প্রবেশ : স্ত্রী ব্যাঙ ডিম ছাড়ার পরপরই পুরুষটি সেগুলোর উপর বীর্য স্খলন করে। বীর্যে হাজার হাজার শুক্রাণু থাকে। ওরা ঝাঁক বেঁধে ডিম্বাণুদের ঘিরে ফেলে। এদের অনেকে ডিম্বাণুর বাইরের জেলী আবরণ ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করলেও একটিমাত্র সদস্যই কেবল আরও অগ্রসর হয়ে ডিম্বাণুর গায়ে পৌঁছতে পারে। শুক্রাণু যখন ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করে তখন ডিম্বাণুতে এমন এক পরিবর্তন সূচিত হয় যার ফলে বাকি শুক্রাণুদের পক্ষে জেলী আবরণ অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ব্যাঙে তাই বহুশুক্রাণুতা হচ্ছে

ব্যতিক্রমি ঘটনা, তবে কোন কারণে ঘটে গেলে পরিস্ফুটন গতি বেশ বিঘ্নিত হয়। ডিম্বাণুর প্রাণী মেরু দিয়েই শুক্রাণু প্রবেশ করে, তবে কোন কোন গ্রন্থকারের মতে, তা সংঘটিত হয় মেরু থেকে ৪০ ডিগ্রী দূর দিয়ে।

ব্যাঙের ডিম্বঝিল্লী নিষেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ডিম্বাণু যখন ডিম্বাশয় ছেড়ে সিলোমে মুক্ত (সিলোমীয় ডিম্বাণু) তখন তা ভিটেলাইন ঝিল্লীতে আবৃত থাকে। এ অবস্থায় ডিম্বাণুগুলোকে বের করে শুক্রাণুর কাছে রেখে দিলে তা নিষিক্ত হবে না। এর কারণ হচ্ছে, শুক্রাণু এ জাতীয় ডিমের ভিটেলাইন ঝিল্লী ভেদ করতে পারে না (Grey, Working and Hendrick, ১৯৭৭)। ডিম যখন ডিম্বনালীর সবচেয়ে উপরের অংশে থাকে তখন ভিটেলাইন ঝিল্লীতে ব্যাপক আঙ্গিক ও শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটে যায়। সিলোমে অবস্থানের সময় এই ঝিল্লী থাকে তন্তুময়। দুই তন্তুগুচ্ছের মাঝখানে থাকে অসংখ্য ফাঁকা স্থান। ডিম্বনালীতে আসার সাথে সাথে তা মসৃণ ও সূক্ষ্ম তন্তুর সমসংস্থ বিন্যাসের গঠন হয়ে উঠে। একই সময় তা শুক্রাণু-ভেদ্যও হয়। এ পরিবর্তনও নিষেকের জন্য যথেষ্ট নয়। ডিম্বনালীর মাঝের অংশে এসে গেলে ডিমের চারদিকে জেলীর আবরণ নিঃসৃত হয়। জেলী আবরণের কিছু উপাদান শুক্রাণুকে ডিম্বাণুতে প্রবেশের প্রয়োজনীয় অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে দেয়। ডিম্বাণু যতই পরিপক্ব বা এর ভিটেলাইন ঝিল্লী যতই ভেদ্য হোক না কেন জেলী সরিয়ে নিলে নিষেকের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়। জেলীর দ্রবণ যদি স্খলিত শুক্রাণুর পরিবেশে মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আবার ঠিকই নিষেক ঘটবে (Katagiri, ১৯৬৬)। প্রোনেজ উৎসেচকের ক্রিয়ায় ব্যাঙের সিলোমীয় ডিমের অভেদ্য আবরণকে সরিয়ে নিলে এবং শুক্রাণুর পরিবেশে জেলীর নির্যাস দিয়ে দিলে তখনও নিষেক ঘটতে দেখা যায় (Katagiri, ১৯৭৪)। এতেই প্রমাণ হয়, অন্যান্য কাজ ছাড়াও জেলীর আবরণ নিষেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

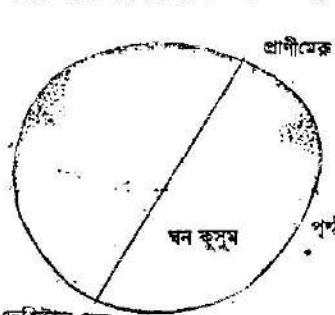

চিত্র ৩১ : ব্যাঙের পরিপক্ব ডিমে কুসুম ও রঞ্জক পদার্থের বিস্তৃতি।

পেরিভিটেলাইন স্ফাঁক সৃষ্টি : শুক্রাণু প্রবেশ করলে ডিম্বাণু কিছু পরিমাণ তরল পদার্থ ছেড়ে দেয়। এই তরল ডিম্বাণু-তল ও কোরিওনের মাঝখানে এসে

জমা হয়। ঘটনাটি সম্ভবত ভিটেলাইন ঝিল্লীর ভিতরেই ঘটে, তাই তরলে পূর্ণ এই স্থানকে পরিভেটোলাইন ফাঁক বলে। এই ফাঁকার সৃষ্টি হলে ডিম্বাণু তার আবরণ থেকে আলগা হয়ে যায় এবং এর ভিতরে ঘূর্ণনে রত হয়।

প্রবেশ পথ ঃ সম্পূর্ণ শুক্রাণুই দু'ই-এক মিনিটের মধ্যে ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে। লেজটি ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু মাথা ও মধ্যখণ্ড একটি পথ ধরে (যা ডিম্বাণুর একটি ব্যাসার্ধ) এগিয়ে যায়, পিছনে পড়ে থাকে এক রঞ্জিত দাগচিহ্ন। দাগটিই হচ্ছে শুক্রাণুর প্রবেশ পথ (চিত্র ৩২ ক)। তখন এক পর্যায়ে শুক্রাণুর অংশ দুটি

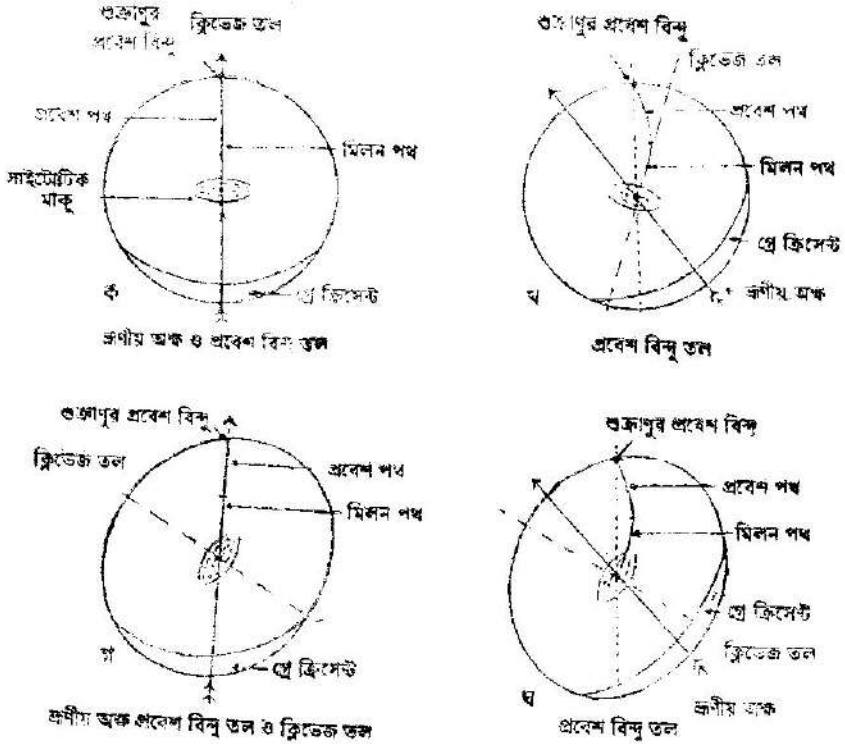

চিত্র ৩২ ঃ ব্যাঙের একটি নিষিক্ত ডিম্বাণুতে অক্ষগুলোর কতিপয় সম্ভাব্য সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। তীর চিহ্ন ভবিষ্যৎ ভ্রূণের অনুলম্ব অক্ষ নির্দেশক (McEwen, ১৯৬৯ অনুসরণে)

ঘুরে যায়, এতে মধ্যখণ্ড সামনে চলে আসে আর মাথাটি বড় হয়ে একটি আদর্শ নিউক্লিয়াস গঠন করে।

দ্বিতীয় পরিপক্বতা বিভাজনঃ শুক্রাণুর প্রবেশে উদ্দীপ্ত হয়ে ডিম্বাণু তার দ্বিতীয় পরিপক্বতা বিভাজন সম্পন্ন করে নেয়। আগেই বলা হয়েছে যে নিষেকের পূর্ব পর্যন্ত ডিম্বাণু নিউক্লিয়াস এ বিভক্তির মেটাফেজ ধাপে এসে থেমে থাকে। দ্বিতীয় পোলার বডি মুক্ত হওয়ার পর নিউক্লিয়াস ডিম্বাণু-তল থেকে অক্ষের এক অবস্থানে সরে আসে। শুক্রাণু-নিউক্লিয়াস তখন ওর দিকে ধাবিত হয়।

মিলন পথ ও একীভবনঃ শুক্রাণু যখন ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করে তখন তা সরাসরি ডিম্বাণু-নিউক্লিয়াসের দিকে অগ্রসর হয় না। ডিম্বাণু-নিউক্লিয়াস দ্বিতীয় পরিপক্বতা বিভাজন শেষে নির্দিষ্ট জায়গায় অবস্থান নিলে শুক্রাণু তখন সেদিক লক্ষ্য করে ধাবিত হয়। এসময়কার চলার পথকে মিলন পথ বলে এবং এই পথও প্রবেশ পথের মতই রঞ্জিত দাগ রেখে যায় (চিত্র ৩২, ক)।

মিলন পথ ধরে এগিয়ে শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস ডিম্বাণু-নিউক্লিয়াসের কাছে গিয়ে হাজির হয়। ইতোমধ্যে মধ্যখণ্ড একটি বিভক্তি কেন্দ্র ও অ্যাস্টার গঠন করে এবং প্রোনিউক্লিয়াই দুটির একীভবনের আগেই তা দ্বিধাবিভক্ত হয়। বিভক্তিটি ঘটে মিলন পথের সমকোণে, এবং নিউক্লিয়াই দুটি যখন কাছে আসে তখন বিভক্তি-কেন্দ্রের অক্ষ ও তাদের মিলনতল সমস্থানিক হয়ে যায় (চিত্র ৩২ ক,খ)।

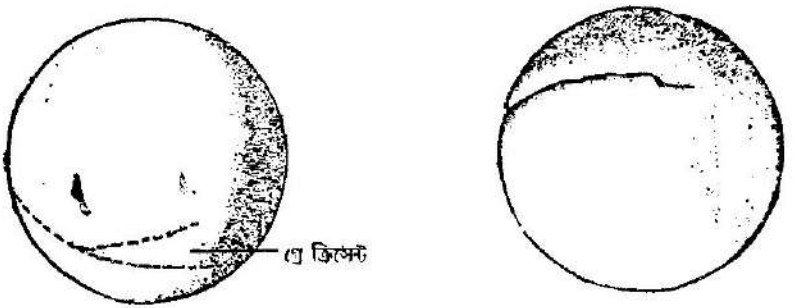

চিত্র ৩৩ ক: ব্যাঙের জাইগোটের ক্লিভেজ; (ক) জাইগোট ও (খ) প্রথম ক্লিভেজ (Huettner, 1949 অনুসরণে)।

শুক্রাণু প্রবেশ পথ ধরে চলার সময় ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় তাতে কুসুম ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যে পৃথকীকরণ ঘটে যায়। সাইটোপ্লাজম শুক্রাণুর দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে শুক্রাণু প্রবেশের উল্টো দিক থেকে রঞ্জক দানাগুলো প্রত্যাহৃত হয়। এতে ঐ অংশে একটি হালকা স্বচ্ছ অংশ আবির্ভূত হয়। এর নাম গ্রে ক্রিসেন্ট (grey crescent)।

ক্লিভেজ

নিষেকের পর ডিম্বাণুটি ১.৬ মি. মি. ব্যাসবিশিষ্ট হয়। এর উপরের কালচে বর্ণের অর্ধকে প্রাণী মেরু এবং নিচের সাদাটে অর্ধকে ভেজিটাল মেরু বলে। নিষেকের ২-৩ ঘন্টা পর ক্লিভেজ শুরু হয়। সবকটি বিভক্তি মাইটোটিক এবং ডিমটি মেসোলেসিথাল হওয়ায় কিছু সমান ও কিছু অসমান হলোব্লাস্টিক ধরনের হয়।

প্রথম বিভক্তি (চিত্র ৩৩ খ) প্রাণী-মেরুতে শুরু হয়ে জাইগোটের মধ্যঅক্ষ বরাবর ধীরে ধীরে ভেজিটাল মেরুর দিকে ধাবিত হয়ে দুটি সমান আকৃতির ব্লাস্টোমিয়ার উৎপন্ন করে।

দ্বিতীয় বিভক্তি (চিত্র ৩৩ গ) প্রথমটির আধঘন্টা পর ও সমকোণে, কিন্তু মধ্যঅক্ষ ধরেই সংঘটিত হয়, এতে প্রথম ব্লাস্টোমিয়ার দুটি বিভক্ত হয়ে চারটি সমান আকৃতির ব্লাস্টোমিয়ার সৃষ্টি করে। প্রত্যেকটি কোষের উপরের অর্ধেক কালচে এবং নিচের অর্ধেক সাদাটে।

তৃতীয় বিভক্ত (চিত্র ৩৩ ঘ) নিরক্ষীয় তলে, কিন্তু নিরক্ষরেখার সামান্য উপরে প্রাণী মেরুতে সংঘটিত হওয়ায় আটটি অসমান কোষের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে প্রাণী মেরুর ব্লাস্টোমিয়ার-চারটি ছোট, ওদের মাইক্রোমিয়ার বলে। অন্যদিকে, ভেজিটাল মেরুর বড় ব্লাস্টোমিয়ার চারটিকে ম্যাক্রোমিয়ার বলে।

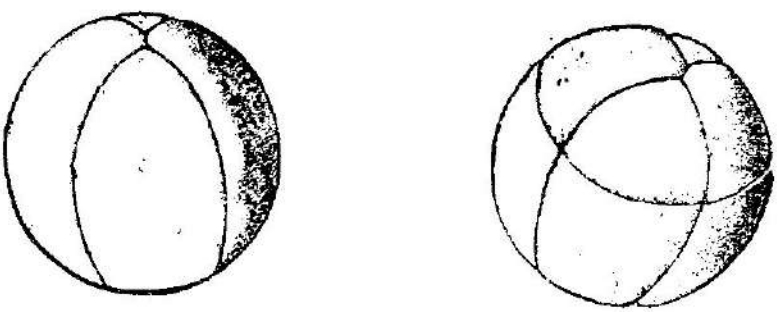

চিত্র ৩৩ খ: ব্যাঙের জাইগোটের ক্লিভেজ; (গ) দ্বিতীয় ক্লিভেজ ও (ঘ) তৃতীয় ক্লিভেজ (Huettner, 1949p অনুসরণে)।

চতুর্থ বিভক্তি (চিত্র ৩৩ঙ) ঘটে মধ্যঅক্ষ বরাবর যা প্রথমে মাইক্রোমিয়ারকে বিভক্ত করে, এবং পরে খুব ধীরে ধীরে ভেজিটাল মেরুর কুসুমপূর্ণ ম্যাক্রোমিয়ারের

দিকে অগ্রসর হয়। এতে ১৬টি কোষের সৃষ্টি হয়, উপরের আটটি ছোট ও রঞ্জিত, এবং নিচের আটটি বড় ও সাদাটে।

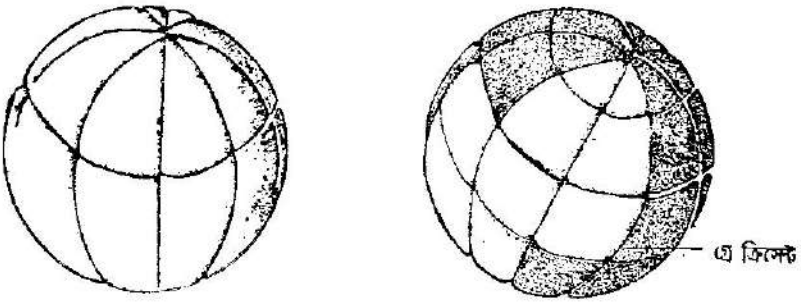

চিত্র ৩৩ গ: ব্যাঙের জাইগোটের ক্লিভেজ (ঙ) চতুর্থ ক্লিভেজ এবং (চ) পঞ্চম ক্লিভেজ (ষোলকোষী দশা) (Huettner, ১৯৪৯ অনুসরণে)।

পঞ্চম ক্লিভেজ শেষে ৩২টি ব্লাস্টোমিয়ার উৎপন্ন হয়। এগুলো চারটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে। প্রত্যেকটি স্তরে থাকে আটটি করে কোষ। উপরের দুটি স্তরের কোষ প্রায় সমান আকৃতির ও রঞ্জিত। তৃতীয় স্তরেরগুলো উপরের ও নিচের সারির কোষগুলোর মাঝামাঝি আকৃতির। এরাও রঞ্জিত, তবে উপরের দুই স্তরের চেয়ে কম। একেবারে নিচের স্তরের কোষগুলো সবচেয়ে বড়, কিন্তু বর্ণহীন। এ সময় থেকেই কোষগুলোর বিভক্তি অনিয়মিত ও অসমান হতে থাকে। কুসুমহীন ও কম কুসুমপূর্ণ অঞ্চলে বিভক্তি দ্রুত ঘটে। এ কারণে প্রাণী মেরুতে কোষের সংখ্যা ভেজিটাল মেরুর চেয়ে অনেক বেশি হয়।

ব্লাস্টুলা

জাইগোট যখন ৩২-কোষী পর্যায়ে উপনীত হয় তখন আর একে একটি ডিম্বাণু বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। বিভক্তিরত এ গোলকটিকে তখন ব্লাস্টুলা (চিত্র ৩৪) নামে অভিহিত করা হয়। এর ভিতরে যে তরলে পূর্ণ একটি গহ্বর থাকে, তাকে ব্লাস্টোসিল বলে। ব্লাস্টোসিলের উৎপত্তির প্রক্রিয়াটি (চিত্র ৩৫) হচ্ছে নিম্নরূপ :

প্রথম থেকেই ব্লাস্টোমিয়ারগুলো নিবিড় হয়ে পরস্পর চাপাচাপি করে থাকে। এতে এদের স্পর্শতলও চাপা হয়ে যায় এবং ভিতরের প্রান্তগুলো সামান্য বেঁকে যায়। আট ও ষোলকোষী দশায় প্রান্তগুলো প্রায় গোল হয়ে গেলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন

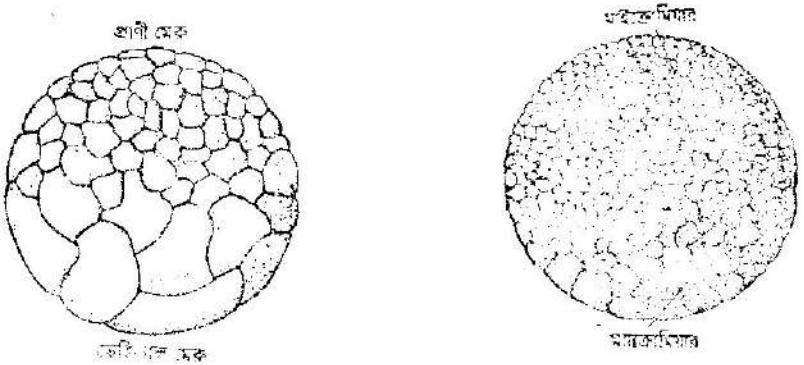

চিত্র ৩৪ : ব্যাঙের ব্লাস্টুলা (ক) প্রাথমিক পর্যায় ও (খ) পরবর্তী পর্যায় (Huettner, ১৯৪৪ থেকে)

হয়ে যায়। এভাবে ব্লাস্টোসিলের উৎপত্তি হয়। প্রাণী মেরুর কোষগুলো ছোট হওয়ায় গহ্বরটি ব্লাস্টুলার নিরক্ষরেখার কিছুটা উপরে থাকে (চিত্র ৩৫)। গ্যাস্ট্রুলেশন শুরুর পূর্ব পর্যন্ত ব্লাস্টোমিয়ারদের ভিতর পারস্পরিক আসক্তনতা বেড়ে যাওয়ায় এবং চারপাশের ব্লাস্টোমিয়ার নিঃসৃত পানি ও অ্যালবুমেন সঞ্চয়ের ফলে ব্লাস্টোসিল আকারে বড় হয় (চিত্র ৩৫ ক, খ)।

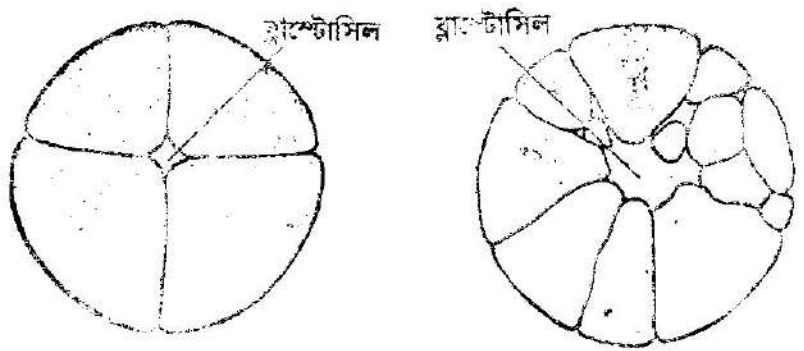

চিত্র ৩৫ : ব্যাঙের ভাইগোটের— (ক) আটকোষী পর্যায় ও (খ) প্রাথমিক পর্যায়ের ব্লাস্টুলার (৩২ কোষী) মধ্যরেখায় লম্বচ্ছেদ (ব্লাস্টোসিলের বৃদ্ধি লক্ষণীয় (McEwen, ১৯৬৯ থেকে)

ব্লাস্টোসিলের আকার বৃদ্ধি ছাড়াও এসময় আরেকটি ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। তা হচ্ছে, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ৩২-কোষী দশার পর থেকে

ক্লিভেজ অনিয়ত হয়ে পড়ে, তখন ভিতরের কোষগুলোও বিভক্ত হতে শুরু করে। এসময় প্রাণী মেরুর প্রায় কুসুমহীন কোষগুলো ভেজিটাল মেরুর কোষের চেয়ে দ্রুত বিভক্ত হয়। এদের কিছু কোষ নিরক্ষ অঞ্চলের দিকে পরিযাত্রী হলে ব্লাস্টোসিলের ছাদটি পাতলা হয়ে যায়। তখন তা এক বা দু'স্তরী কোষে, এবং দুই পাশ ও মেঝে কয়েক স্তরী কোষে নির্মিত থাকে (চিত্র ৩৫গ, ঘ)।

ব্লাস্টুলা কাল পেরিয়ে আসার পর ভ্রূণে নিচে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়:

(১) পানি শোষণের ফলে ব্লাস্টুলা জাইগোটের চেয়ে আকারে এক পঞ্চমাংশ বড় হয়।

(২) বহির্তলীয় রঞ্জককোষ নিচের দিকে সবখানে ছড়িয়ে সাদাটে অঞ্চলকে সীমিত করে ফেলে।

(৩) গ্রে ক্রিসেন্ট চিহ্নিত স্থানের বিপরীতে ব্লাস্টোসিল প্রাচীর বেশি পুরু।

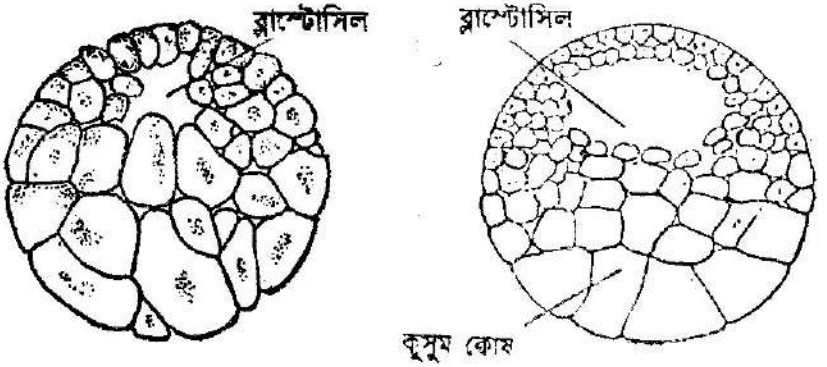

চিত্র ৩৫ : ব্যাঙের জাইগোটের— (গ) পরবর্তী পর্যায়ের ও (ঘ) শেষের দিকের ব্লাস্টুলার মধ্যরেখীয় লম্বচ্ছেদ। ব্লাস্টোসিলের বৃদ্ধি লক্ষণীয় (McEwen, ১৯৬৯ থেকে)

(৪) ব্লাস্টোসিলের ছাদ আলাদা হয়ে বাইরে এপিডার্মাল স্তর (epidermal layer) এবং ভিতরে স্নায়বিক স্তর (nervous layer) গঠন করে।

গ্যাস্ট্রুলেশন

ব্লাস্টুলেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভ্রূণ গ্যাস্ট্রুলা দশায় উপনীত হয়। বিভিন্ন কোষ পরিযায়ী ও পুনর্বিন্যস্ত হয়ে একস্তরী ব্লাস্টুলাকে দ্বিস্তরী এপিথেলিয়ামে

আবৃত গ্যাস্ট্রুলায় পরিণত করে। ব্লাস্টুলাকাল অতিক্রম করার পর ভ্রূণের ব্যাস হয় ১-২ মি. মি.। এতে কোষের সংখ্যা থাকে প্রায় ১৫,০০০। প্রাণী মেরুর কোষগুলো ভেজিটাল মেরুর চেয়ে ছোট ও কম কুসুমপূর্ণ। মহাকর্ষীয় কেন্দ্র ভেজিটাল মেরুতে থাকায় ভ্রূণের এই অংশটি নিম্নমুখী হয়ে থাকে।

গ্যাস্ট্রুলা দশায় উপনীত হতে ভ্রূণের বাইরে ও ভিতরে সংঘটিত জটিল ঘটনাবলীকে অর্থাৎ গ্যাস্ট্রুলেশন প্রক্রিয়াকে নিচে উল্লিখিত শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা যায়:

(১) এপিবলি;
(২) কনভারজেন্স;
(৩) রোটেশন;
(৪) ইনভেজিনেশন বা এমবলি;
(৫) ইনভলিউশন; এবং
(৬) ডিলেমিনেশন।

উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি প্রক্রিয়া বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত এবং বাকি তিনটি অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া।

গ্যাস্ট্রুলেশন শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রাণী মেরুর কালচে কোষগুলো নিরক্ষ-রেখার দিকে নামতে থাকে এবং এক পর্যায়ে রেখার নিচ পর্যন্ত নেমে যায়। গ্রে ক্রিসেন্টের নিচের সীমানা ধরে একটি উঁচু অর্ধচন্দ্রাকার খাঁজের সৃষ্টি হয়, একে ব্লাস্টোপোরের পৃষ্ঠ-ওষ্ঠ (dorsal lip) বলে। খাঁজটি প্রথমে ছোট থাকে, পরে আরও গভীর ও লম্বা হয়ে চক্রাকারে অন্য অংশে প্রসারিত হয় (চিত্র ৩৬, ক, খ,)। ওষ্ঠটি লম্বা হওয়ার সময় আরও দুটি বাহ্যিক প্রক্রিয়াও সাথে ঘটতে থাকে। প্রথম প্রক্রিয়ায় কালচে কোষগুলো ক্রমানুয়ে পৃষ্ঠ-ওষ্ঠের দিকে অগ্রসর হয় এবং পরিশেষে গাঢ় ও হালকা রঙের এলাকার মাঝখানে একটি সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করে (চিত্র ৩৬ ক, খ, গ)। দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় ওষ্ঠ সবখানে নিচের দিকে ভেজিটাল মেরুর কাছাকাছি নেমে যায়। ওষ্ঠের উৎপত্তিস্থলে চলনের গতি সবচেয়ে বেশি, দুপাশে থাকে কম। প্রথমোক্ত প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ পাশে বৃদ্ধির সময় খাদটি বাঁকা হয়ে অর্ধচন্দ্রের আকার ধারণ করে। পরে এর দু'প্রান্ত এক হয়ে একটি পূর্ণ বৃত্ত গঠন করে। দ্বিতীয় পদ্ধতির ধারাবাহিকতা হিসেবে অর্থাৎ ওষ্ঠের নিম্নগতি, সে সাথে রঞ্জিত এলাকারও, সাদা অঞ্চল ছোট হয়ে আসে, অবশেষে তা একটি গোল বিন্দুর মতো হয়ে পড়ে (চিত্র ৩৬ ঘ, ঙ, চ)।

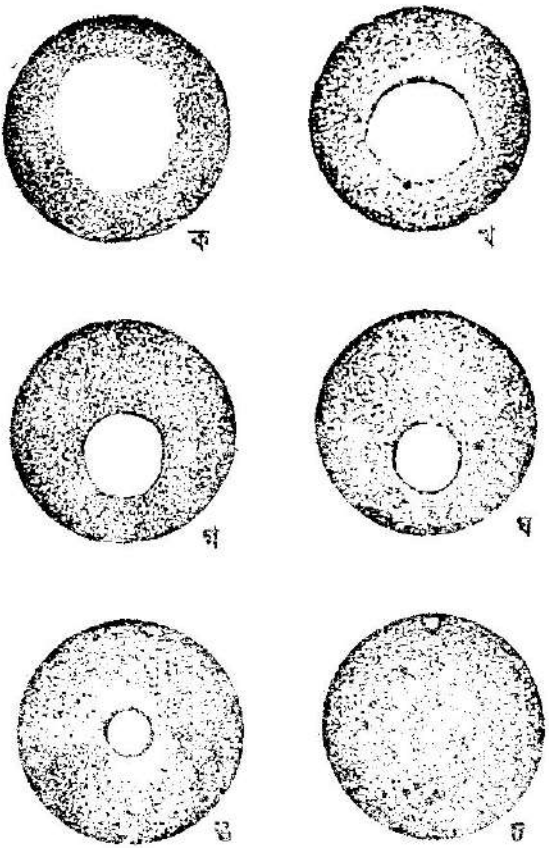

চিত্র ৩৬ : ব্লাস্টোপোর বন্ধ হওয়ার ধাপসমূহ (ক-ঙ) নিষিক্ত ডিম্বাণুকে ভেজিটাল মেরু থেকে দেখা ; (চ) অক্ষীয়দেশ থেকে দেখা (ঙ) সমগ্র ডিম্বাণুতে রোটেশন শুরু এবং (চ) রোটেশন সম্পন্ন (McEwen, ১৯৬৯ থেকে)

এপিবলি : উল্লিখিত সাদা অঞ্চল ব্লাস্টোপোরের অবস্থানটি দখল করে রাখে। খাঁদের প্রথম আবির্ভাব পৃষ্ঠ-ওষ্ঠের উপবৃদ্ধির সূচনাকেই নির্দেশ করে এবং খাঁদের পার্শ্বীয় প্রসারণও পার্শ্বীয় ওষ্ঠের অংশে একই প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয়। অবশেষে খাঁদের প্রান্তদুটি ভ্রূণের ভবিষ্যৎ পশ্চাৎ-তলীয়দেশে মিলিত হয় অর্থাৎ সমান নিম্নবৃদ্ধি যে ঘটছে তাও বোঝা যায়। যাহোক, এভাবে সৃষ্ট গোল গর্তটিকে

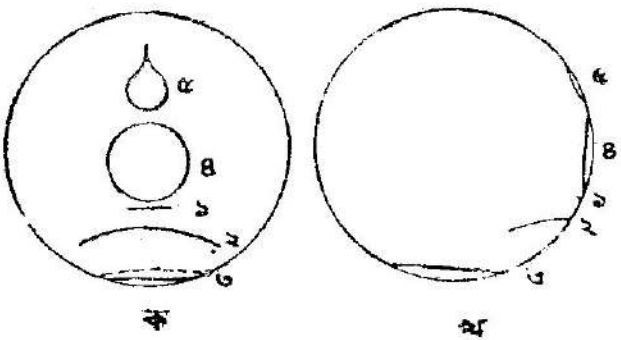

চিত্র ৩৭ : বিভিন্ন বয়সে ব্যাঙের গ্যাস্ট্রুলায় ব্লাস্টোপোরের অবস্থান (সমন্বিত চিত্র) (ক) পশ্চাৎ দৃশ্য এবং (খ) পার্শ্ব দৃশ্য (১-৫ সংখ্যা ব্লাস্টোপোরের অবস্থান ও আকার নির্দেশক) (McEwen, ১৯৬৯ থেকে)

ব্লাস্টোপোর (Blastopore) বলে এবং এর মুখে ছিপির মত করে কিছু কুসুমপূর্ণ যে ম্যাক্রোমিয়ার থাকে এদের সবাইকে একসাথে ইয়ক প্লাগ (yolk plug) বলে। ব্লাস্টোসিল ছাদের কোষগুলোর এ উপবৃদ্ধিকে এপিবলি বলে। এভাবে কোষগুলো পুনর্বিন্যস্ত হওয়ায় ছাদটি পাতলা হয়ে যায় (চিত্র ৩৯)।

কনভারজেন্স : এ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক গ্যাস্ট্রুলার পিঠ ও পাশ থেকে কোষগুলো ব্লাস্টোপোরের দিকে ধাবিত হয় এবং ঠোঁটদুটির সংকোচন ঘটে। এর ফলে ভবিষ্য নিউরো-এক্টোডার্ম একটি মেডুলারি ভাঁজ (medullary fold) সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পিঠের মধ্যরেখায় পৌঁছায়।

রোটেশন : এপিবলি চলার সময় এ প্রক্রিয়ায় সমগ্র গ্যাস্ট্রুলা ডিম্বাণুর প্রকৃত মধ্যরেখীয় তলের সমকোণে অবস্থিত অনুভূমিক অক্ষ ধরে ঘুরতে থাকে। ফলে ভেজিটাল মেরুর কাছাকাছি সৃষ্ট ব্লাস্টোপোর পিছনে স্থায়ী হয় এবং পৃষ্ঠ ও অঙ্কীয় ওষ্ঠ প্রকৃত পৃষ্ঠ ও অঙ্কীয় রূপেই আবির্ভূত হয় (চিত্র ৩৭ ও ৩৮)।

উপরে উল্লিখিত বাহ্যিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ভ্রূণের ভিতরেও নানা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ইনভেজিনেশন বা এমবলি : এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে ব্লাস্টোসিলের মেঝে উপরের দিকে ঠেলে উঠতে থাকে। এই চলন প্রথমে পৃষ্ঠ ওষ্ঠের খুব কাছাকাছি পিঠের অংশে শুরু হয়, পরে ব্লাস্টোসিলের কিনারা ধরে প্রসারিত হয় (চিত্র ৪০ খ/৩৯ খ)।

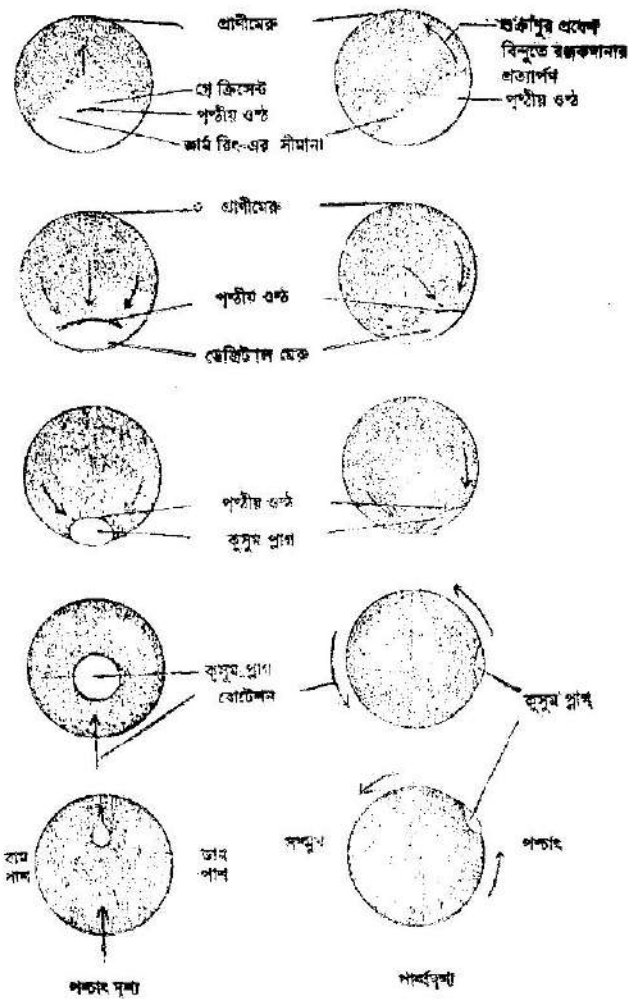

চিত্র ৩৮ : বিভিন্ন বয়সে ব্যাঙের গ্যাস্ট্রুলার ব্লাস্টোপোরের অবস্থান ও ডিম্বাণু রোটেশন (Balinsky, ১৯৭০ অনুসরণে)

কখনও বা কোষের এই উর্ধ্বমুখী চলন আরও বেশি কেন্দ্রমুখি হওয়ায় ব্লাস্টোসিল সংকুচিত হয়ে অর্ধচন্দ্রাকার ধারণা করে। ব্লাস্টোসিল সম্পূর্ণ দখল না করা পর্যন্ত কোষগুলো এভাবে বেড়েই চলে। শেষ পর্যায়ে ব্লাস্টোসিল অতি সংকীর্ণ একফালি

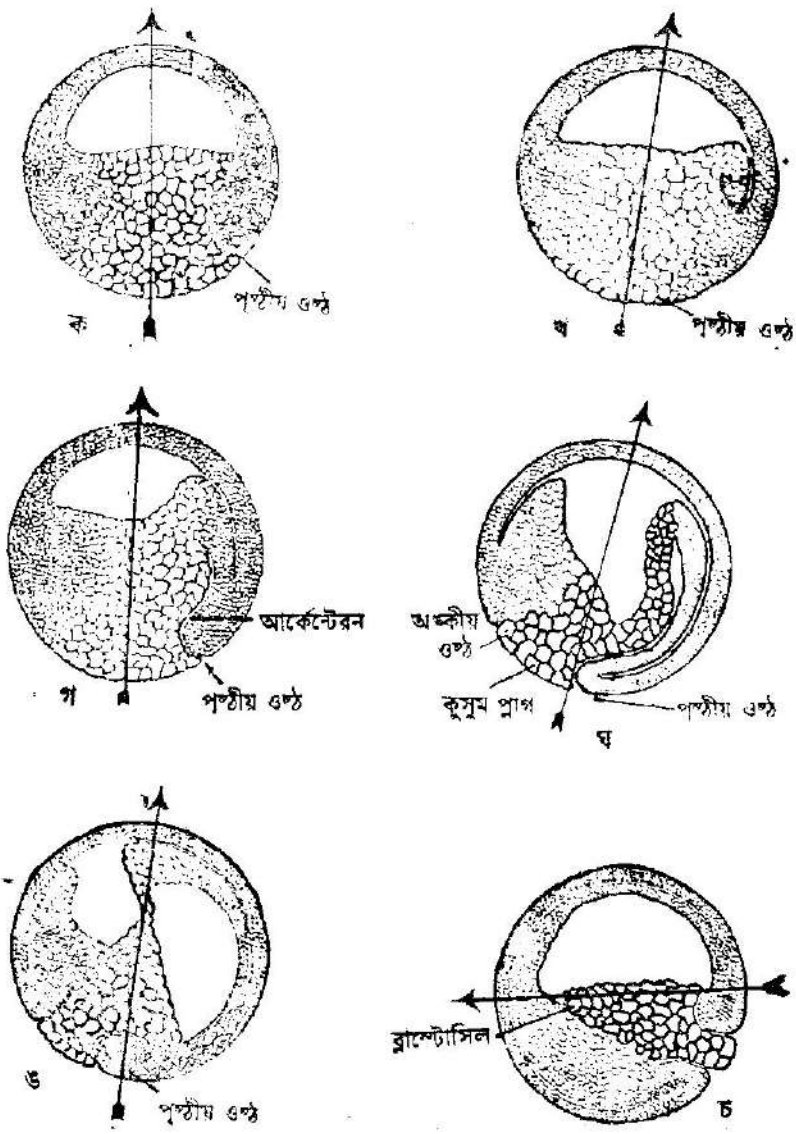

চিত্র ৩৯ : ব্লাস্টোপোর সৃষ্টি ও বন্ধ হওয়া এবং ব্লাস্টুলার রোটেশন (ক-ছ) রোটেশনের আগে ; (ঙ) রোটেশনরত এবং (চ) রোটেশনের পরে তীর চিহ্ন ডিম্ব অক্ষ নির্দেশ করে। এর মাথাটি প্রাণী মেরু (Huettner, ১৯৪৯ থেকে)

গহ্বরে রূপ ধারণ করে এপিব্লাস্ট (epiblast) নামক বাইরের কোষস্তরকে হাইপোব্লাস্ট (hypoblast) নামক ভিতরের কুসুমপূর্ণ কোষস্তর থেকে আলাদা করে (চিত্র ৩৮, চিত্র ৩৯ গ, ঘ, ঙ, চ)।

এপিবলি সংঘটিত হওয়ার সময়ই ইনভেজিনেশনেও ঘটে। এ দুই পদ্ধতির মিলিত উদ্যোগে একটি নতুন গহ্বরের সৃষ্টি হয় যা ব্লাস্টোসিলকে প্রতিস্থাপিত করে। এ গহ্বরের নাম আর্কেন্টেরন। আর্কেন্টেরনের ছাদ পাতলা হাইপোব্লাস্ট স্তরে এবং মেঝে কুসুমপূর্ণ কোষের প্রধান পিণ্ডে গঠিত।

ইনভলিউশন ঃ ওষ্ঠ সংলগ্ন কোষে এবং ইয়ক প্লাগ কোষের আকৃতির পরিবর্তন হওয়ায় ইনভলিউশন ঘটে। মধ্যরেখীয় পৃষ্ঠ-ওষ্ঠে তা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে, দু'পাশে কমে যায়, আর অংকীয় ওষ্ঠে প্রায় কিছুই ঘটে না। এ প্রক্রিয়ায় ব্লাস্টোপোর ওষ্ঠের বাইরের, পাশের ও পিঠের কোষগুলো ভিতরে ঢুকে আর্কেন্টেরনের অন্তঃপ্রাচীরের ছাদ ও দু'পাশ গঠন করে, মেঝে তৈরি হয় ভেজিটাল অঞ্চলের বহির্দেশীয় কোষে। শেষের কোষগুলো ইনগ্রেশন (ingression) নামে পরিবর্তিত ইনভেজিনেশন প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায় (Schectman, ১৯৩৪; কিন্তু Ballar, ১৯৫৫ তা অস্বীকার করেছেন)।

ডিলেমিনেশন ঃ অনেকে (যেমন–Brachet) মনে করেন যে, ব্যাঙে ডিলেমিনেশন প্রক্রিয়াও সংঘটিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় ইনভেজিনেশনের সাথে সাথে ব্লাস্টোসিলের কিনারা ঘেঁষে অবস্থিত হাইপোব্লাস্ট কোষ উপরে ঠেলে উঠে এবং ধীরে ধীরে ব্লাস্টোসিল দখল করে নেয়। ব্লাস্টোসিলটি সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত না হয়ে হাইপোব্লাস্ট ও এপিব্লাস্টের মাঝখানে সংকীর্ণ হয়ে থেকে যায়। উপরের দিকে ঠেলে উঠার সাথে সাথে পৃষ্ঠ-ওষ্ঠ সংলগ্ন কোষগুলো ভিতরের দিকেও নামতে থাকে। এ প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে ওষ্ঠে। এর ফলে হাইপোব্লাস্ট কোষস্তর এপিব্লাস্ট থেকে পৃথক হয়ে যায়। এই পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াকে গ্যাস্ট্রুলার ক্লিভেজ (gastrular clevage) ও বলা হয়ে থাকে।

ভ্রূণীয় স্তরের পরিস্ফুটন

আর্কেন্টেরন পরিস্ফুটনের সময় ইনভেজিনেশন, ইনভলিউশন বা ডিলেমিনেশন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তার ছাদকে হাইপোব্লাস্ট বলে। হাইপোব্লাস্টটি এণ্ডোডার্মের একটি অংশ এবং তা নটোকর্ডসহ সম্পূর্ণ মেসোডার্ম নিয়ে গঠিত। হাইপোব্লাস্ট থেকে ডিলেমিনেশন প্রক্রিয়ায় স্তরগুলো বিন্যস্ত হয়। এভাবে আলাদা হয়ে যাওয়া

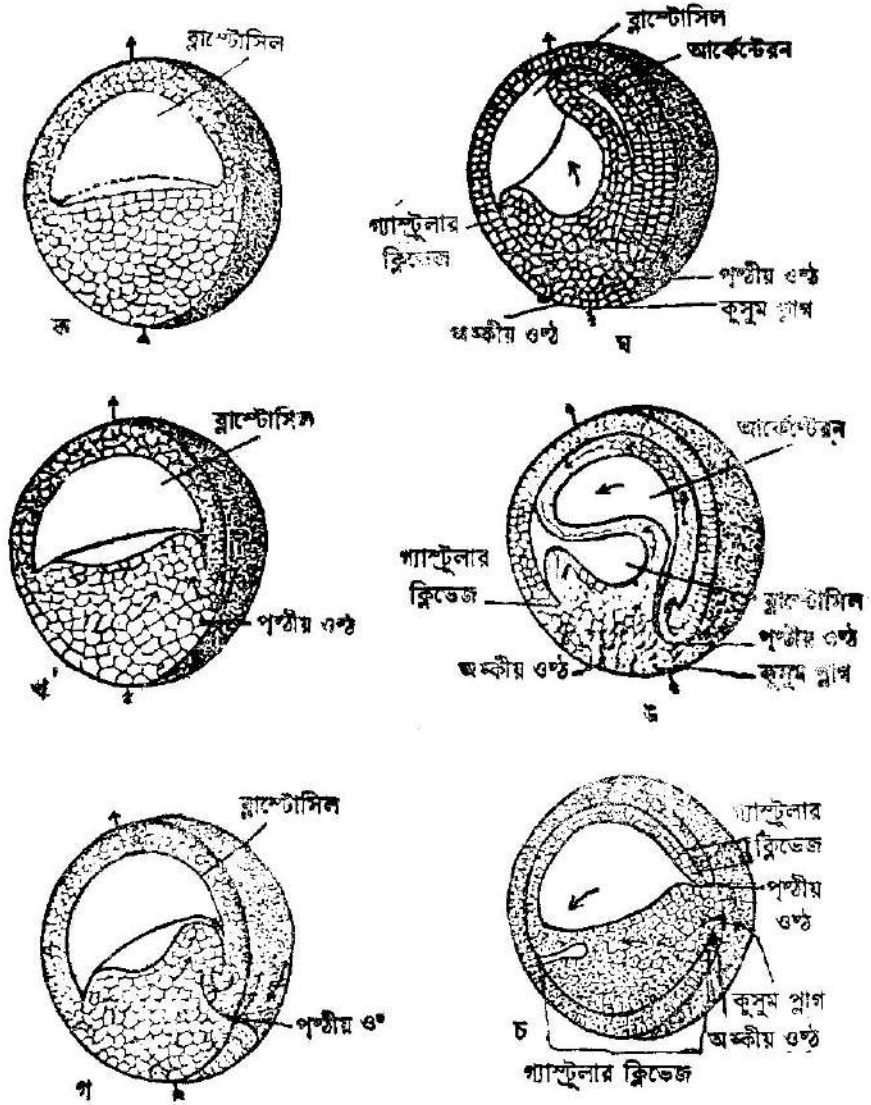

চিত্র ৪০ : ব্যাঙের গ্যাস্ট্রুলেশনের বিভিন্ন পর্যায় (ক) পরিণত ব্লাস্টুলা, (খ) গ্যাস্ট্রুলেশনের সূত্রপাত, (গ) ব্লাস্টোসিলের সংকোচন; (ঘ) আর্কেন্টেরনের আবির্ভাব, গ্যাস্ট্রুলার-ক্লিভেজের সূত্রপাত; এবং (চ) পরিণত গ্যাস্ট্রুলা (McEwen, ১৯৬৯ অবলম্বনে)।

নিচের কোষস্তর আর্কেন্টেরনের ছাদ ও পাশের এণ্ডোডার্ম গঠন করে, এবং নিচের দিকে কুসুমপূর্ণ কোষের সাথে অবিচ্ছিন্ন থাকে যা পরে মেঝের এণ্ডোডার্মে পরিণত হয়। আলাদা হয়ে যাওয়া উপরের স্তরটি ছাদের ও পাশের নতুন এণ্ডোডার্ম

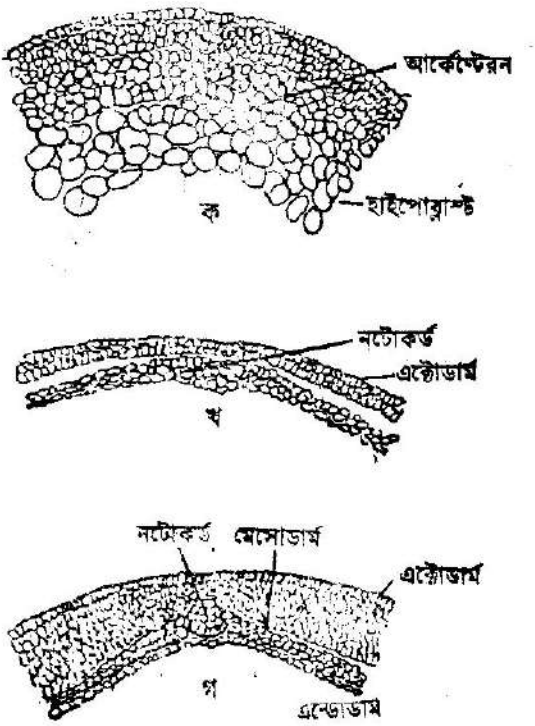

চিত্র ৪১ : ব্যাঙে তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের সৃষ্টি (McEwen, ১৯৬৯ অনুসরণে)।

ও এপিব্লাস্টের মাঝখানে অবস্থান করে। এই স্তরটিকে মেসোডার্ম বলে। আর মেসোডার্মের উপরের এপিব্লাস্টকে বলে এক্টোডার্ম।

মেসোডার্ম সব জায়গায় একই সাথে পৃথক হয় না। এই পৃথকীকরণ শুরু হয় দুই পাশে এবং তা ধীরে ধীরে মধ্যরেখায় পৌঁছায়। এখানে একফালি কোষ নিচের স্তরের সাথে কিছু সময় ধরে যুক্ত থাকে, পরে নিচের এণ্ডোডার্ম ও দুই পাশের মেসোডার্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়। এটি হচ্ছে নটোকর্ড (চিত্র ৪১)। পরে এণ্ডোডার্মীয় কুসুম পিণ্ড ও এক্টোডার্মের মাঝখানে পার্শ্বীয় নিম্নমুখী বৃদ্ধির

দরুন ভ্রূণের তলীয় অংশের মেসোডার্ম নির্মিত হয়। সামনের দিকে মেসোডার্ম কোন নির্দিষ্ট স্তরে সাজানো থাকে না, বরং শিথিল কোষে বিন্যস্ত থাকে। এর নাম মেসেনকাইম (mesenchyme)।

উল্লেখিত প্রক্রিয়া শেষে ভ্রূণের বেশির ভাগ জুড়ে মেসোডার্মটি এক্টোডার্ম ও এণ্ডোডার্মের মাঝখানে আলাদা স্তর হিসেবে অবস্থান করে। ব্লাস্টোপোর অঞ্চলে স্তর তিনটির কোষ কিছু সময়ের জন্য অবিভেদিত থাকে। ব্লাস্টোপোর বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সুবিন্যস্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়

মুরগির পরিস্ফুটন

মুরগি-ভ্রূণের পরিস্ফুটন নিয়ে যত ভ্রূণতত্ত্বীয় গবেষণা হয়েছে, অন্য কোন প্রাণী নিয়ে ততটা হয় নি। এখনও গবেষণা চলছে এর নানা দিক নিয়ে। ভ্রূণ-বিদ্যায় মুরগি-ভ্রূণের অবদান অসীম কারণ : (১) ডিম ও ভ্রূণ অত্যন্ত সুলভ, সারা বছরই পাওয়া যায়। (২) পরিস্ফুটনের অধিকাংশ ধাপই এতে দেখা যায়। (৩) অত্যন্ত গুরুত্ববহ বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লী, যা সরীসৃপে ও পরিবর্তিত রূপে স্তন্যপায়ীতেও পাওয়া যায়, তার অধ্যয়ন। (৪) ভ্রূণের সাধারণ পরিস্ফুটন আগে উল্লিখিত প্রাণী-গুলোর চেয়ে বেশি করে স্তন্যপায়ীর মতো।

এ অধ্যায়ে মুরগি-ভ্রূণে বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লী সৃষ্টি পর্যন্ত আলোচনা করা হবে।

উওগোনিয়া

আদি জননকোষের উৎপত্তি উওগোনিয়ারূপে তার সংখ্যাবৃদ্ধি মুরগির ভ্রূণীয় জীবনেই ঘটে থাকে। ডিমে তা দেয়ার পাঁচদিনের মাথায় আদি জননকোষের উৎপত্তি হয়। ডিম ফুটে বের হওয়ার সময় উওগোনিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রক্রিয়া থেমে যায়। তখন প্রত্যেকটি উওগোনিয়াম ফলিকল-কোষে বেষ্টিত হয়ে বৃদ্ধির আয়োজনে ব্যাপৃত হয় (চিত্র ৪২)। তখন ওদের উওসাইট বলে।

উওগোনিয়ার বৃদ্ধি কাল

ভিটেলাইন ঝিল্লী বা জোনা রেডিয়াটা (Vitelline membrane or zona radiata) : প্রত্যেকটি উওসাইট ভিটেলাইন ঝিল্লী নামক আবরণে বেষ্টিত হয়। আবরণটি ডিম্বাণু-তল নিঃসৃত কি-না সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ আছে। ঝিল্লীটি সামান্য স্থূল হলেই কিছু সংখ্যক নালিকায় বিদীর্ণ হয়। এ কারণে তা জোনা রেডিয়াটা নামেও অভিহিত। নালিকাপথে ডিম্বাণু ফলিকল কোষের মাধ্যমে পুষ্টি গ্রহণ করে।

জার্মিনাল ডিস্ক (Germinal disc) : নিউক্লিয়াস প্রথমে উওসাইটের কেন্দ্রেই থাকে, আর চারপাশের সাইটোপ্লাজমে জমা হয় কুসুম দানা। এদের চাপে পড়ে কুসুমহীন

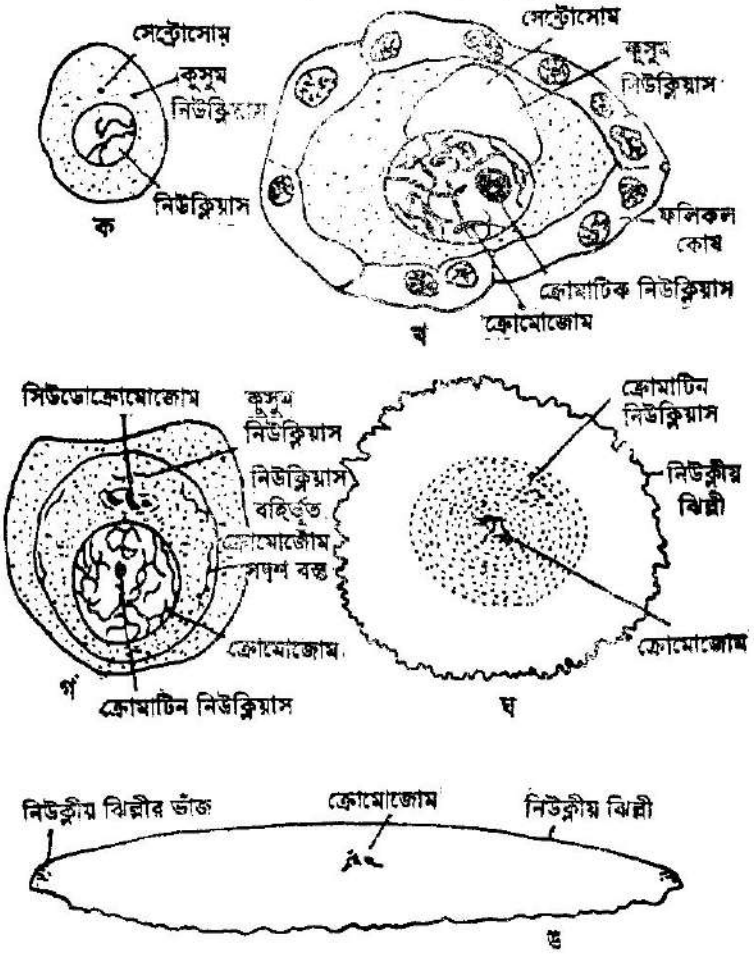

চিত্র ৪২ : মুরগির ডিমের উজেনেসিস প্রক্রিয়ার বৃদ্ধি দশা
(McEwen, ১৯৬৯ অনুসরণে)

সাইটোপ্লাজম উওসাইটের পরিধিতে সরে যেতে বাধ্য হয়। উওসাইট যে অংশ দিয়ে ডিম্বাশয়ে লেগে থাকে সেদিকের সাইটোপ্লাজম একটু বেশি স্থূল হয়। এই স্থূল অংশকে জার্মিনাল ডিস্ক বা ব্লাস্টোডিস্ক বলে। এই সময়ের মধ্যে উওসাইটের ব্যাস বৃদ্ধি পেয়ে ০·৬ মি.মি. হয়ে যায়। নিউক্লিয়াসটি ব্লাস্টোডিস্কে পরিযাত্রী হয় (চিত্র ৪৩)।

কুসুম সঞ্চয় (Deposition of yolk) : উওসাইটের আকার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে কুসুম সঞ্চয়। প্রক্রিয়াটি এ রকম : আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিউক্লিয়াসটি প্রথমে উওসাইটের কেন্দ্রে থাকে এবং এর চারদিকে কুসুম জমা হয়।

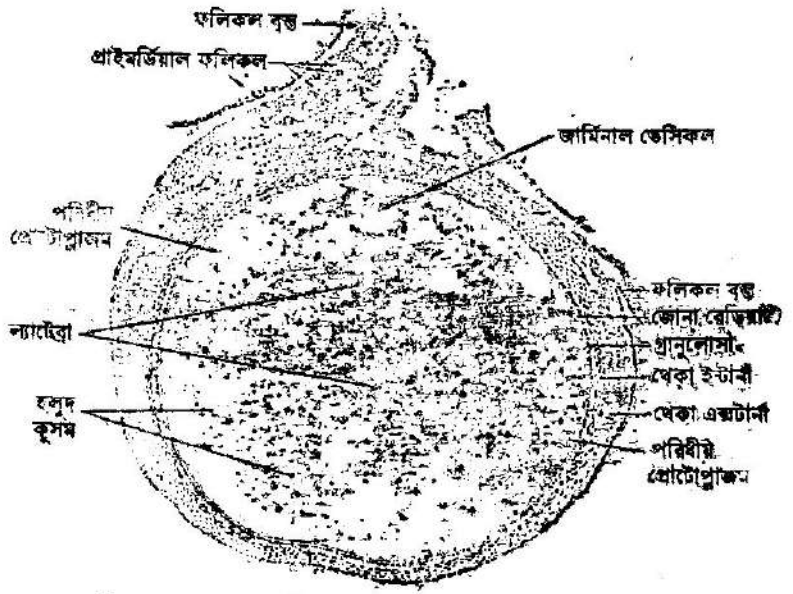

চিত্র ৪৩ : কবুতরের ডিম্বাশয়িক ডিম্বাণুর মধ্যচ্ছেদ (MbEWen, ১৯৬৯ অনুসরণে)।

হালকা রঙের এই কুসুমকে সাদা বা শ্বেত কুসুম (white yolk) বলে। সাদা কুসুমের কেন্দ্রীয় পিণ্ডকে বলে ল্যাটেব্রা (latebra) এরপর পরিধীয় সাইটোপ্লাজম ল্যাটেব্রার চারদিকে গাঢ় বর্ণের পদার্থ এনে জমা করে। এর নাম হলুদ বা পীত কুসুম (yellow yolk)। এভাবে ডিম্বাণু যখন বড় হতে থাকে নিউক্লিয়াস তখন কেন্দ্রের অবস্থান ছেড়ে পরিধিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। নিউক্লিয়াসের গমন পথ জুড়ে তখন শুধু সাদা কুসুম জমা হয় অর্থাৎ ল্যাটেব্রা থেকে পরিধি পর্যন্ত সাদা কুসুমের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা দেখতে পাওয়া যায়। একে ল্যাটেব্রার গলা বা গ্রীবা (neck of latebra) বলে। ব্লাস্টোডিস্কের ঠিক নিচে তা সামান্য ছড়িয়ে পড়ে একটি প্লেট গঠন করে। এর নাম প্যাণ্ডার-এর নিউক্লিয়াস (nucleus of Pander) [চিত্র ৪৪ ক]।

কোন কোন ডিমে হলুদ কুসুমের ফাঁকে ফাঁকে সংকীর্ণ ও পাতলা সাদা কুসুমের স্তরও দেখা যায় (চিত্র ৪৪খ)। আগে মনে করা হত যে, সব ডিমেই এমনটি হয়ে থাকে। এও ধারণা ছিল যে, হলুদ কুসুম দিনে, আর সাদা কুসুম রাতে জমা হয়। গবেষণার ফল হচ্ছে, খাদ্যের পর্যায়ক্রমিক পার্থক্যই এর কারণ।

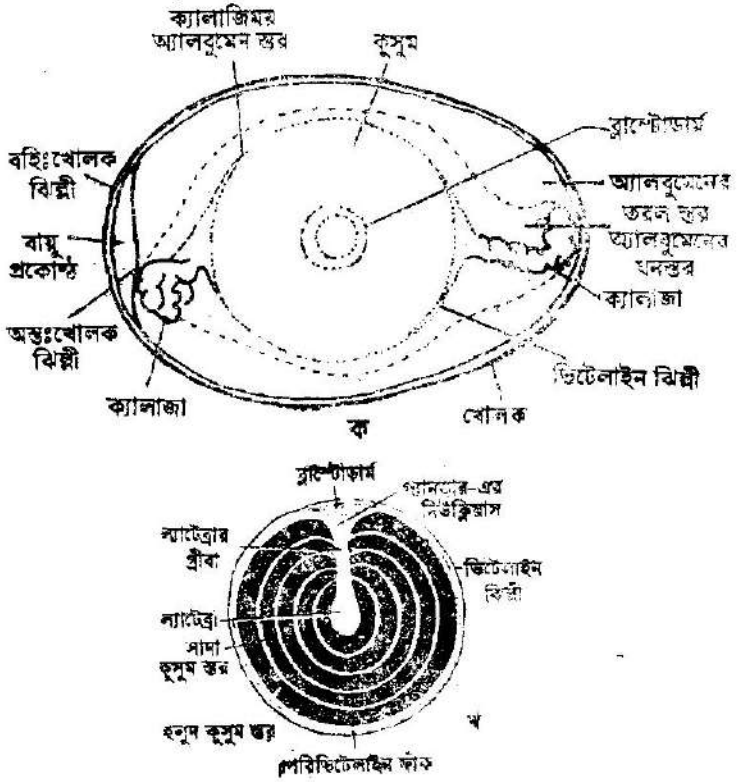

চিত্র ৪৪: মুরগির প্রসবযোগ্য ডিমের অর্ধচিত্রানুগ চিত্র: (ক) সম্পূর্ণ ডিম; (খ) ভিটেলাস বা প্রকৃত ডিম্বাণুর লম্বচ্ছেদ (McEwen, ১৯৬৯ অনুসরণে)

জ্যান্থোফিল (zanthophyl)-এর জন্য গাঢ় হলুদ বর্ণের সৃষ্টি হয়। মুরগি যখন ঘাস বা হলুদ শস্যদানা খায় তখন কুসুমে জ্যান্থোফিল নামক হলুদ কণা জমা হয়। খাবার যদি একনাগাড়ে না দিয়ে মাঝে-মাঝে খাওয়ানো হয় তাহলে কুসুমে হালকা ও গাঢ় বর্ণের স্তরভেদ সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে খাদ্য সরবরাহের মধ্য দিয়ে ইচ্ছামত স্থূল ও পাতলা, কিছু বা অসংখ্য স্তর সৃষ্টি করা যেতে পারে। তবে ল্যাটেব্রা ও তার গ্রীবার ক্ষেত্রে তা কোন প্রভাব ফেলবে না।

ডিম্বপাত ও মিয়োসিস

উপরোল্লিখিত প্রক্রিয়ার সময় নিউক্লিয়াসটি বড় হয়। তখন তাকে জার্মিনাল ভেসিকল (g rminal vesicle) বলে। ডিম্বপাতের প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা আগে এতে প্রথম পরিপক্কতা বিভাজন সংঘটিত হয় এবং তা আড়াই ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন হয়। এর পর দ্বিতীয় বিভাজনের মাকু সৃষ্টি হয় (Olsen, ১৯৪২ ১৯৫০)। এই সময় চোঙাকৃতির ইনফাণ্ডিবুলাম বা অস্ট্রিয়াম ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণুকে তুলে নেয়। তখন সাই-কাট্রিক্স (cicatrix) নামক রক্ত-বাহিকাবিহীন একটি অংশ বরাবর থেকা ও ফলিকল বিদীর্ণ হয়ে গেলে ডিম্বাণু ডিম্বনালীতে গৃহীত হয়।

নিষেক ও মিয়োসিস

অস্টিয়ামে প্রবেশের সাথে সাথেই ডিম্বাণুকে শুক্রাণুরা জেঁকে ধরে। এ শুক্রাণু হয়তোবা ডিম্বপাতের ২৪ ঘণ্টা থেকে দুই সপ্তাহ আগে মোরগ থেকে গৃহীত হয়েছে। এদের মাঝ থেকে কয়েকটি শুক্রাণু ব্লাস্টোডিস্কের আশেপাশে প্রবেশ করতে পারে। শুক্রাণু প্রবেশের পর দ্বিতীয় পোলার বডি বিচ্যুত হয় এবং ডিম্বাণু প্রোনিউক্লিয়াস একটি মাত্র শুক্রাণু-প্রোনিউক্লিয়াসের সাথে মিলিত ও একীভূত হয়। বাদবাকি অনেক শুক্রাণু ধ্বংস হয়ে যায়, অনেকে আবার (মেরোসাইট) কিছুক্ষণ অবস্থান করে ক্লিভেজের সাথে কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত প্রদর্শন করে।

আবরণ সৃষ্টি

ডিম্বনালী বেয়ে নিচের দিকে নামার সময় ডিমটি এমন এক অবস্থান গ্রহণ করে যে, যদি ব্লাস্টোডিস্ক ও ভেজিটাল মেরুর কেন্দ্র বরাবর একটি রেখা টানা যায় তাহলে তা ডিম্বনালীর অনুলম্ব অক্ষের সমকোণে হবে। পরে অবশ্য ডিমটি অনুলম্ব অক্ষে ঘুরে যায় এবং তা করার সময় ডিমটি ডিম্বনালীর বিশেষ কিছু অংশ থেকে নির্দিষ্ট আবরণে বেষ্টিত হয়ে পড়ে। সবশেষে ডিমের চারদিকে নিচে উল্লেখিত আবরণগুলোকে চিহ্নিত করা করা যায়।

মিউসিন-সমৃদ্ধ সূত্রসমৃদ্ধ অ্যালবুমিনময় দ্রব্যের একটি পুরু স্তর কুসুমের সাথে নিবিড় হয়ে লেগে থাকে। এ স্তর থেকে একটি পাতলা অথচ শক্ত আবরণ তৈরি হয়। আবরণটির নাম ক্যালাজিফেরাস ঝিল্লী (chalaziferous membrane)। কুসুমের দু'পাশে (খোলকের দুই বিপরীত প্রান্তে) ঝিল্লিটি পেঁচিয়ে রজ্জু গঠন করে। এর নাম ক্যালাজী (chalazae)।

ক্যালাজিফেরাস ঝিল্লীর ঠিক বাইরেই থাকে পাতলা তরল অ্যালবুমেনের একটি সংকীর্ণ স্তর (Conrad and Scott, ১৯৩৮)। এর বাইরে রয়েছে একটি স্বচ্ছ কিন্তু

অপেক্ষাকৃত স্থূল ও প্রশস্ত অ্যালবুমেন স্তর। একে সাধারণভাবে ঘন অ্যালবুমেন (Dense albumen) বলা হয়। মিউসিনের উপস্থিতির জন্যই তা ঘন দেখায়। এই স্তর আবার পাতলা অ্যালবুমেন (thin albumen) নামে একটি ও আরও চওড়া অ্যালবুমেন স্তরে বেষ্টিত। এর চারদিকে রয়েছে খোলক ঝিল্লী (shell membrane)। আবার পাতলা অ্যালবুমেন (thin albumen) নামে একটি পাতলা ও আরও চওড়া অ্যালবুমেন স্তরে ঝিল্লীটি প্রকৃত ও সুনির্দিষ্ট। ডিমের একেবারে বাইরে থাকে চুনময় খোলক (shell)।

বর্ণিত ঝিল্লীগুলো ডিম্বনালীর যেসব অংশ থেকে নিঃসৃত হয় নিচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১৮ মিনিটের মধ্যে ডিম ইনফাণ্ডিবুলাম অতিক্রম করে ম্যাগনামে প্রবেশ করে। এখানে ঘণ্টা তিনেক অবস্থানের সময় মিউসিন তন্তুসমৃদ্ধ সম্পূর্ণ ঘন অ্যালবুমেন স্তর নিঃসৃত হয়। অনেকে দাবী করেন যে, কিছু পরিমাণ পাতলা অ্যালবুমেন ম্যাগনামের সামনের অংশ থেকে নিঃসৃত হয়।

ডিম্বনালীর ইসথমাস অংশ থেকে খোলক ঝিল্লী নিঃসৃত হয়। ডিম্বাণু এখানে প্রায় ৭৪ মিনিট অবস্থান করে। তখন সামান্য পরিমাণ পাতলা অ্যালবুমেনও নিঃসৃত হয়। কিন্তু কনরাড এবং স্কট (Conrad and Scott)-এর দাবী হচ্ছে, পাতলা অ্যালবুমেনের প্রায় সম্পূর্ণই এ অংশ থেকে নিঃসৃত হয়, অর্থাৎ ডিমটি জরায়ুতে থাকার সময় তা অন্যান্য দ্রব্য থেকে বিভেদিত হয়।

জরায়ুতেই ডিম্বাণু সবচেয়ে বেশিক্ষণ (২০½ ঘণ্টা) অবস্থান করে এবং পাতলা অ্যালবুমেন বিভেদিত হয়। এতে প্রচুর পরিমাণ অ্যালবুমিনময় তরল ও দ্রবণীয় লবণ থাকে। এ লবণ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় খোলক ঝিল্লী ভেদ করে ঘন অ্যালবুমেনের কাছে চলে আসে, তখন ঘন অ্যালবুমেনের মিউসিন ছাড়া কিছু প্রোটিন তরলে ব্যাপিত হয়। এভাবে তরলটি অ্যালবুমিনময় হয়ে উঠে, কিন্তু মিউসিন তন্তুর অনুপস্থিতির জন্য তা পাতলাই থেকে যায়।

ডিমটি জরায়ুতে থাকার সময় ক্যালাজিফেরাস ঝিল্লি, ক্যালাজি ও পাতলা অ্যালবুমেনের সংকীর্ণ স্তর সৃষ্টি হয়। এসব অংশ জরায়ু থেকে উৎপন্ন হয় না, বরং তা ম্যাগনাম থেকে নিঃসৃত ঘন অ্যালবুমেন থেকে সৃষ্টি হয়। প্রক্রিয়াটি এ রকম: কুসুম সংলগ্ন ঘন অ্যালবুমেনের মিউসিন তন্তু প্রত্যাহৃত ও ঘনীভূত হয়ে ক্যালাজিফেরাস ঝিল্লী গঠন করে। এর ফলে পরিত্যক্ত তন্তুবিহীন পাতলা অ্যালবুমেন ঝিল্লী—সংলগ্ন থেকে সংকীর্ণ পাতলা স্তর সৃষ্টি করে। ক্যালাজী হচ্ছে কুসুমের দু'পাশে ঘনীভূত স্তরের বাড়ানো অংশ। ঐ স্তর সৃষ্টির সময় ডিম্বাণু ঘুরতে থাকায় ক্যালাজীকে পাকানো দেখায়। অ্যালবুমেন থেকে মিউসিন পৃথকীভবন

প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিক মনে হলেও বিষয়টি এখনও পরিষ্কার নয় (McEwen, ১৯৫৬)। খোলকটি সম্পূর্ণভাবে জরায়ু থেকে নিঃসৃত। এখানে ৮–১০ ঘন্টা থাকার পরই খোলক নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। এর উপাদানের উৎস অজানা থাকলেও মনে করা হয় যে, তা স্বভাবচ্যুত (denatured) প্রোটিন হবে হয়তো।

ক্লিভেজ

ডিম যখন ডিম্বনালী বেয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে এবং এর বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন আবরণ সংগ্রহে মত্ত থাকে তার ফাঁকেই ক্লিভেজ সম্পন্ন হয়ে যায়। ব্লাস্টোডিস্কের ব্যাস যখন ৩ মি. মি. এবং স্থূলত্ব ০·৫ মি. মি. হয় তখন প্রথম ক্লিভেজ ঘটে। নিষিক্ত ডিম্বাণু ম্যাগনামে থাকা অবস্থায় ব্লাস্টোডিস্কের মাঝ বরাবর প্রথম ক্লিভেজ সংঘটিত হয়। কিন্তু ক্লিভেজ ফাটল ব্লাস্টোডিস্ককে সম্পূর্ণ বিভক্ত করতে পারে না, তাই পৃথক ব্লাস্টোমিয়ারও সৃষ্টি হয় না (চিত্র ৪৫ ক)।

ডিম যখন ডিম্বনালীর ইসথমাস অংশে প্রবেশ করে তখন আগের অসম্পূর্ণ বিভক্ত দুই কোষে প্রথম ফাটলের মাঝ বরাবর সমকোণে একই গভীরতায় দ্বিতীয় ক্লিভেজ ফাটলের সৃষ্টি হয় (চিত্র ৪৫ খ)। এভাবে চারটি কোষ উৎপন্ন হয়। প্রত্যেকটিতেই তাড়াতাড়ি তৃতীয় ক্লিভেজ সংঘটিত হয়। এই ক্লিভেজ ফাটল প্রথমটির সমান্তরালে হতে পারে, তবে প্রায়ই এদের দিকের কোন ঠিক থাকে না। এভাবে আটটি কোষের সৃষ্টি হয় এবং কোন কোষই প্রথমে প্রান্তীয় বা কেন্দ্রীয় সাইটোপ্লাজম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হতে পারে না। তখন শুধু ক্লিভেজ ফাটল দিয়ে পৃথক করা প্রোটোপ্লাজমীয় অঞ্চলে নিউক্লিয়াসগুলোকে অবস্থান করতে দেখা যায়।

ডিম্বাণুর চারকোষী দশায় ব্লাস্টোডিস্কের চারদিকের কিনারায় হালকা ও অস্পষ্ট কিছু ফাটল দেখা যায়। এরা ক্ষণস্থায়ী, ডিম্বাণুর দশকোষী দশায় চলে যায়। এদের অতিরিক্ত বা সহায়ক ক্লিভেজ (accessory cleavage) বলে। নিষেকের সময় যখন বেশ কয়েকটি শুক্রাণু ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে তখন ওদের একজনই মাত্র প্রকৃত নিষেকে জড়িত হয়ে পড়ে, বাকিগুলোর নিউক্লিয়াই কিছু সময় ধরে যে বিভক্তি ঘটায় তার ফলে ঐসব ক্লিভেজ ফাটলের আবির্ভাব ঘটে। কখনও বা ৩২ কোষী দশায়ও বিক্ষিপ্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত নিউক্লিয়াই নজরে পড়ে। তবে ডিমের উপর কোন প্রভাব বিস্তার না করেই ওরা কেটে পড়ে (McEwen, ১৯৫৬)।

তৃতীয় ক্লিভেজের পর থেকে বিভক্তিগুলো অনিয়ত, দ্রুত এবং কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় উভয় সাইটোপ্লাজমেই সংঘটিত হয়। কেন্দ্রীয় সাইটোপ্লাজমে ক্লিভেজিত কোষগুলো আর অসম্পূর্ণ না থেকে আবরণীবদ্ধ হয়ে পূর্ণ কোষে পরিণত হয়।

তখন ওদের কেন্দ্রীয় কোষ (central cells) বলে। অন্যদিকে প্রান্তীয় সাইটো-প্লাজমে ক্লিভেজের ফলে সৃষ্ট কোষগুলো কিছুক্ষণের জন্য অসম্পূর্ণ কোষ-সীমারেখা নিয়ে প্রান্তে অবস্থান করে এবং নিচে অবস্থিত কুসুমপূর্ণ সাইটোপ্লাজমের সাথে

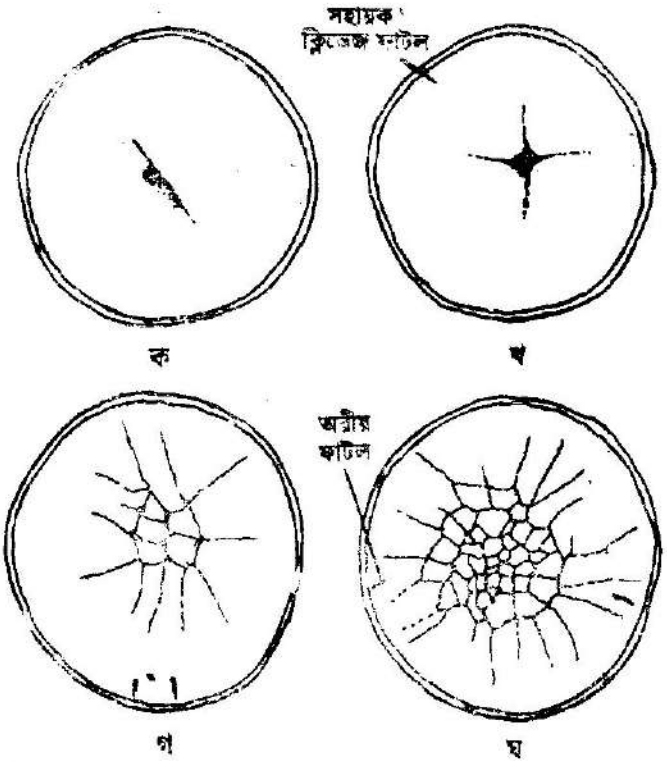

চিত্র ৪৫ ঃ মুরগির ডিমে ক্লিভেজের কয়েকটি পর্যায়ের চিত্ররূপ (Patterson, ১৯১০ অনুসরণে)

অবিচ্ছিন্ন থাকে। এদের প্রান্তীয় কোষ (marginal cells) বলে। ক্লিভেজ চলতে থাকা অবস্থায় প্রান্তীয় কোষ ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে কেন্দ্রীয় কোষে যোগ দেয়, প্রান্তীয় কোষ উৎপাদনও অব্যাহত থাকে। এভাবে কেন্দ্রীয় ক্লিভেজিত এলাকার ব্যাস বেড়েই চলে (চিত্র ৪৫ ক; ৪৬)। এসময় কেন্দ্রীয় কোষগুলোতে আনুভূমিক ক্লিভেজ সংঘটিত হওয়ায় কেন্দ্রীয় কোষের একটি উপরিগত স্তর নিচে অবস্থিত সাইটোপ্লাজম থেকে আলাদা হয়ে যায়। তখন সাইটোপ্লাজম এবং এই

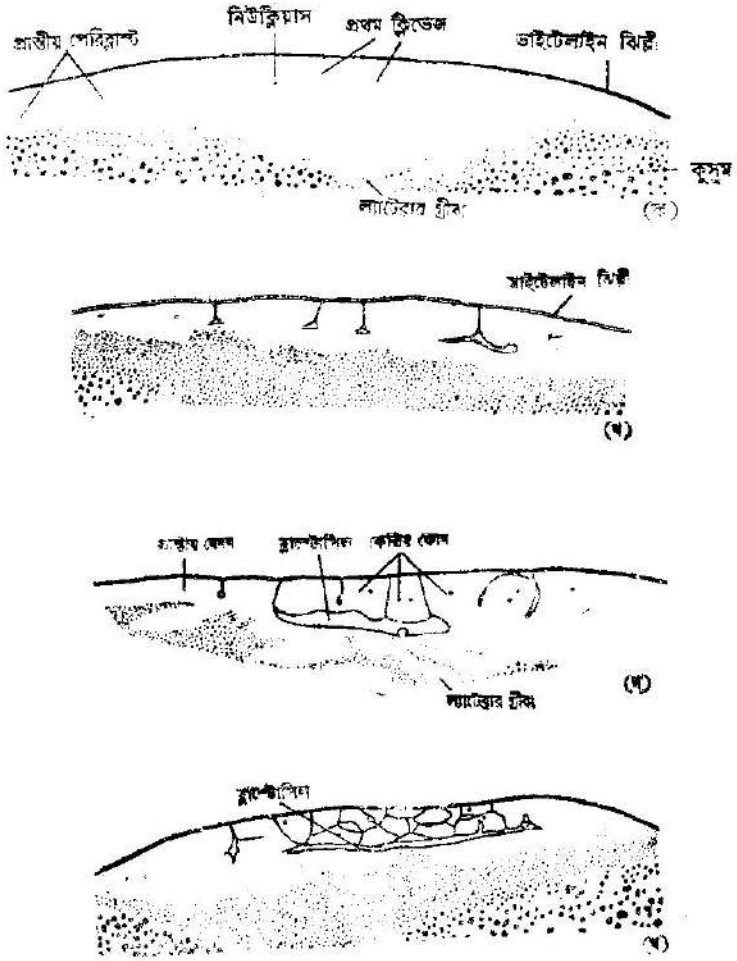

চিত্র ৪৬ : ক্লিভেজ চলাকালে ব্লাস্টোডার্মের লম্বচ্ছেদ (Balinsky, ১৯৮১ অনুসরণে)।

স্তরের মাঝখানে তরল পদার্থ সঞ্চিত হয়ে একটি অগভীর ফাঁকা স্থানের সৃষ্টি করে। এর নাম সেগমেন্টেশন গহ্বর (segmentation cavity)। এ অবস্থায় নিষিক্ত ডিম্বাণু ইসথমাস থেকে জরায়ুতে এসে পৌঁছায়। জরায়ুতে ক্লিভেজ সম্পূর্ণ হলে গ্যাস্ট্রুলেশন শুরু হয়।

আরও বিভক্তির ফলে এককোষ স্তরবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কোষ কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত হয়, তখন কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় কোষ আরও বেশি তলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রান্তীয় কোষের চারদিকে এবং কুসুম সংলগ্ন ০·৫ মি. মি. প্রশস্ত গাঢ় বর্ণের স্থান তখনও সম্পূর্ণ অবিভক্ত থেকে যায়। একে পেরিব্লাস্ট (periblast) বলে।

কেন্দ্রীয় অঞ্চলের কিনারা ঘেঁসে সৃষ্ট প্রান্তীয় কোষগুলো পেরিব্লাস্টের ভিতরের প্রান্তে এসে পৌঁছায়। এখানে প্রান্তীয় কোষের নিউক্লীয় বিভক্তি চলতে থাকে, কিন্তু এই বিভক্তির সাথে সাইটোপ্লাজমীয় বিভক্তি তাল ঠিক রাখতে পারে না, ফলে অতিরিক্ত নিউক্লিয়াই (পেরিব্লাস্ট নিউক্লিয়াই) পেরিব্লাস্ট অঞ্চলের ভিতর প্রবেশ করে ওকে একটি সিনসিসিয়াম (syncytium)-এ পরিণত করে। একে ভ্রূণীয় প্রাচীর (germ wall) বলে (চিত্র ৪৬ঘ)

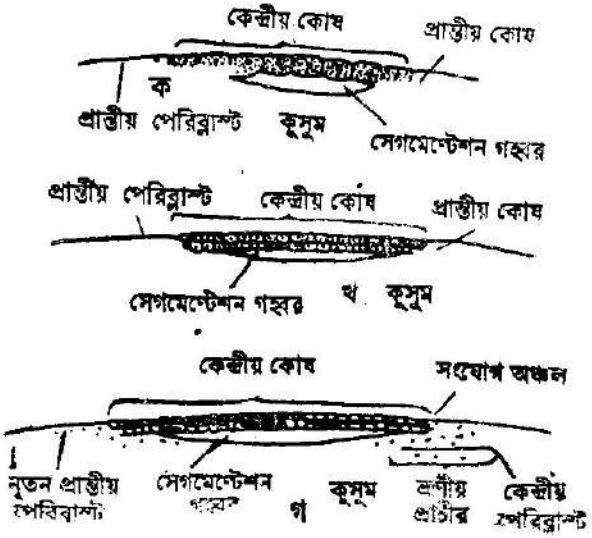

চিত্র ৪৭ : বিভিন্ন ক্লিভেজ দশায় মুরগির ব্লাস্টোডার্মের লম্বচ্ছেদ (McEwen ১৯৬৯ অনুসরণে)।

কিছু কোষ সেগমেন্টেশন গহ্বরের প্রান্তের নিচে অখণ্ডিত সাইটোপ্লাজমেরও কিছু অংশে ঢুকে যায়। এ অংশটিকে কেন্দ্রীয় বা সাবজার্মিনাল পেরিব্লাস্ট (central or subgerminal periblast) বলে। ভ্রূণীয় প্রাচীর সৃষ্টি হওয়ার সময়ই আদি প্রান্তীয় কোষের শেষ কোষগুলো বহিঃস্থ পেরিব্লাস্ট (যা এখন ভ্রূণীয় প্রাচীর)

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেন্দ্রীয় কোষের সাথে অবিচ্ছিন্ন এবং বৈশিষ্ট্যগতভাবেও ঐসব কোষের মত হয়ে যায়। সিনসিসীয় ভ্রূণীয় প্রাচীরে তখন সাইটোপ্লাজমীয়

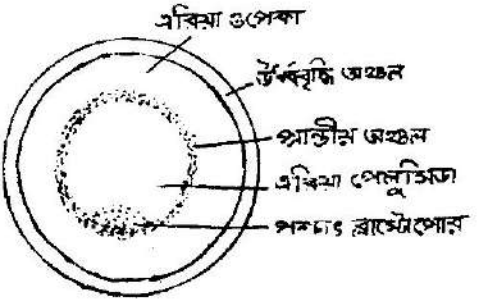

চিত্র ৪৮ : প্রাথমিক মুরগিব্লাস্টোডার্মের বিভিন্ন অঞ্চলে কোষের ঘনত্ব (কোষ ঘনত্বকে বিন্দু দিয়ে দেখানো হয়েছে (Bodemer, ১৯৬২ অনুসরণে)।

বিভক্তি ঘটে এবং উৎপন্ন কোষগুলো আগের প্রান্তীয় কোষের সাথে গিয়ে যোগ দেয়। এভাবে যথারীতি অবস্থিত কোষের বিভক্তির ফলে সৃষ্ট কোষ ও প্রাচীর থেকে উৎপন্ন কোষ পরিধিতে যোগ দেয়ায় কেন্দ্রীয় এলাকা বাইরের দিকে কুসুমের উপরতলে ছড়িয়ে যায়। তখন সেগমেন্টেশন গহ্বরও বড় হয় এবং তা সাবজার্মিনাল গহ্বর (Subgerminal cavity) নামে অভিহিত হয় (চিত্র ৪৬ ঘ)। এ গহ্বরকে ছাড়িয়েও কোষীয় এলাকা কুসুমের উপর বৃদ্ধি অব্যাহত রাখে। ভ্রূণীয় প্রাচীরের ভিতরের কিনারা তার নিচের কুসুম থেকে কিছুটা আলাদা হয়ে যায় (চিত্র ৪৬ ঘ)। অন্যদিকে এর প্রান্তীয় অংশ অর্থাৎ ভ্রূণীয় প্রাচীর নিচে অবস্থিত কুসুমের সাথে অবিচ্ছিন্ন থাকে। কেন্দ্রীয় কোষস্তরের দুই প্রান্তে বহির্তলীয় কোষ ও নিচে অবস্থিত প্রাচীরের মধ্যে এবং প্রাচীর ও নিচে অবস্থিত কুসুমের মধ্যে পৃথকীভবন না ঘটায় ভ্রূণীয় প্রাচীরের বাইরের অংশকে সংযোগ অঞ্চল (Zone of junction) বলে এবং এই অঞ্চল দুটির একেবারে প্রান্তে অখণ্ডিত কুসুমের উপর (পেরিব্লাস্ট) কোষের বেড়কে উপবৃদ্ধি অঞ্চল (Zone of overgrowth) বলে (চিত্র ৪৬ ঘ)।

সংযোগ ও বৃদ্ধি অঞ্চল আবির্ভাবের পর মুরগির নিষিক্ত ডিম্বাণুকে ব্লাস্টুলা বলে। ব্লাস্টুলার সমস্ত বিভক্ত কোষ এবং সংযোগ ও উপবৃদ্ধি অঞ্চলের আংশিক বিভক্ত কোষসহ সমগ্র ব্লাস্টোডিস্ককে ব্লাস্টোডার্ম (Blastoderm) বলে (চিত্র ৪৬ঘ)।

ভাগ্য-মানচিত্র

ট্রাইটিয়েটেড থাইমিডিন (Tritiated thymidine) ব্যবহার করে পাখির ভ্রূণের ভাগ্য-মানচিত্র আঁকা যায়। ৪৯ নং চিত্রে ভাগ্য-মানচিত্রটি এভাবেই করা হয়েছে (Rosenquist, ১৯৬৬; Nicolet, ১৯৭০ a)। চিত্রটি শুধু এপিব্লাস্টকেই নির্দেশ করছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে:

পেলুসিডা অঞ্চলের প্রায় কেন্দ্রে অবস্থিত ছোট এলাকাটি নটোকর্ড সৃষ্টি করে। এর পিছনে, ভ্রূণের মধ্যরেখীয় তলে, অবস্থিত লম্বাটে ডিম্বাকার অংশটি হচ্ছে ভাবী এণ্ডোডার্ম। নটোকর্ড অঞ্চলের আশপাশের অংশ প্রকৃত ভ্রূণীয় দেহের সমসংস্থাভুক্ত, এবং তা অধীনস্থ অংশ দিয়ে অন্ত্র গঠন করে। পেলুসিডা অঞ্চলের আরও পিছনের অংশে বহিঃভ্রূণীয় এণ্ডোডার্ম অবস্থান করে যা কুসুম থলির আবরণের অংশবিশেষ নির্মাণে অংশ নেয়। ভাবী নটোকর্ড, এণ্ডোডার্ম ও বহিঃভ্রূণীয় এণ্ডোডার্মের ডানে ও বাঁয়ে ভাবী মেসোডার্মের বিভিন্ন ভাগ অবস্থান করে। নটোকর্ড অঞ্চলের কাছে একটি অস্পষ্ট অংশ আছে যা থেকে প্রিকর্ডাল (মাথা) মেসোডার্মের উৎপত্তি হয়।

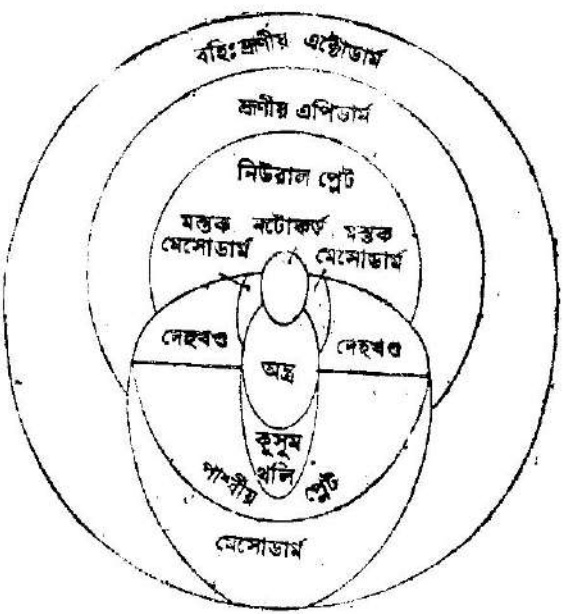

চিত্র ৪৯: গ্যাস্ট্রুলেশন শুরুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে একটি পাখির ভ্রূণের ভাগ্য মানচিত্র (Balinsky, ১৯৮১ অনুসরণে)।

ঐ অংশটির পিছনে ও পাশে ভাবী দেহখণ্ড সৃষ্টিকারী অঞ্চল অবস্থিত। এদের পিছনে থাকে ভাবী-পার্শ্বীয় প্লেট মেসোডার্ম; এণ্ডোডার্ম অঞ্চলের পিছনে ডান ও বাম পার্শ্বীয় প্লেট মেসোডার্ম পরস্পর অবিচ্ছিন্ন থাকে। পেলুসিডা অঞ্চলের পিছনের কিনারায় একটি বড় অর্ধচন্দ্রাকার অংশ অবস্থিত; যা থেকে বহিঃভ্রূণীয় মেসোডার্ম, বিশেষ করে বহিঃভ্রূণীয় রক্ত-বাহিকা তন্ত্র (এরিয়া ভাস্কুলোসা) সৃষ্টি হয়। নটোকর্ড অঞ্চলের সামনের দিকে অর্ধচন্দ্রের আকার নিয়ে অবস্থিত অংশটি ভাবী স্নায়ু-তন্ত্র নির্দেশ করে। এর চারদিকে কিতার মতো ঘোরাও করে রাখা অঞ্চলটি ভাবী এপিডার্মিস। এর মধ্যে বিভিন্ন এপিডার্মিস উদ্ভূত অঙ্গের উপাদানও নিহিত থাকে। আরও বাইরের দিকের যে অঞ্চল একটি পূর্ণ বলয়ের মতো হয়ে পেলুসিডা অঞ্চলকে ঘিরে রেখেছে তা হচ্ছে বহিঃভ্রূণীয় এক্টোডার্ম-এণ্ডোডার্ম যা ভ্রূণের প্রকৃত দেহ গঠনে কোন অংশ নেয় না।

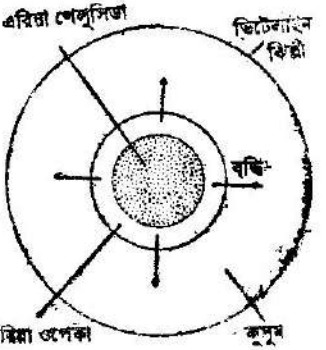

চিত্র ৫০: মুরগির ডিমের ব্লাস্টোডার্মের উপরিতলীয় দৃশ্য (Bodemer, ১৯৬৮ অনুসরণে)

গ্যাস্ট্রুলেশন

গ্যাস্ট্রুলেশনের শুরুতেই সেগমেন্টেশন গহ্বরের উপরে অবস্থিত ব্লাস্টোডার্মের কোষগুলোর বাইরের দিকে পরিযাত্রার ফলে ব্লাস্টোডার্ম পাতলা হয়ে যায়। উপর থেকে দেখলে এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে

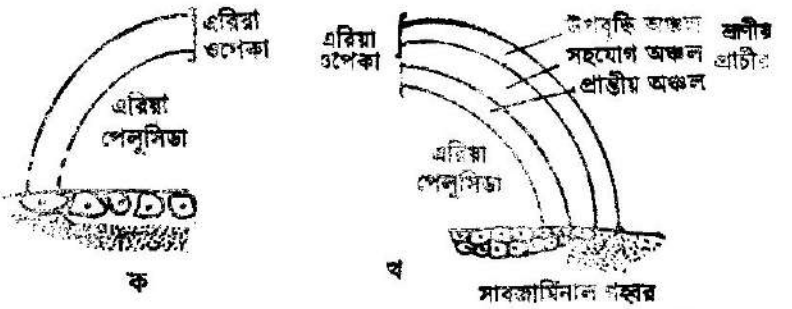

চিত্র ৫১: মুরগির ডিমে প্রাথমিক ব্লাস্টোডার্মে এরিয়া ওপেকা ও এরিয়া পেলুসিডার মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। বামে ক্লিভেজের প্রাথমিক অবস্থায় এবং ডানে ক্লিভেজের পরবর্তী পর্যায়গুলোতে বিভিন্ন অঞ্চলের বিস্তৃতি। প্রতিটির নিচে প্রচ্ছদে অন্তঃস্থ পরিবর্তনগুলো দৃশ্যমান (Bodemer, ১৯৬৮ অনুসরণে)।

স্বচ্ছ দেখায়, তাই একে এরিয়া পেলুসিডা (area pellucida) বলে। এর চারদিক ঘিরে অবস্থিত কুসুমপূর্ণ কোষস্তরসম্পন্ন অস্বচ্ছ গাঢ় অঞ্চলটিকে এরিয়া ওপেকা (area opaca) বলে (চিত্র ৫০ ও চিত্র ৫১)।

গ্যাস্ট্রুলেশনকে দুটি পর্যায়ক্রমিক ধাপে ভাগ করা যায়-(১) প্রাইমডিয়াল হাইপোব্লাস্ট সৃষ্টি এবং (২) প্রিমিটিভ স্ট্রিকের সৃষ্টি।

(১) প্রাইমডিয়াল হাইপোব্লাস্ট সৃষ্টি

গ্যাস্ট্রুলেশনের প্রথম ধাপে ব্লাস্টোডার্ম দ্রুত প্রসারিত হয় এবং এরিয়া পেলুসিডার কোষগুলো পুনর্বিন্যস্ত হয়ে ঘনতলীয় কোষের একটি স্তর সৃষ্টি করে। এ স্তর ভ্রূণীয় এপিব্লাস্ট (Embryonic epiblast) বা নির্দিষ্ট এপিথেলিয়াম (definitive epithelium) গঠন করে। ভাবী এণ্ডোডার্ম কোষ ইনফিলট্রেশন (infiltration) প্রক্রিয়ায় তাড়াতাড়ি নিচের দিকে সেগমেন্টেশন গহ্বরে নেমে একটি অবিচ্ছিন্ন দ্বিতীয় স্তর গঠন করে। একে প্রাইমডিয়াল হাইপোব্লাস্ট (primordial hypoblast) বা ভ্রূণীয় এণ্ডোডার্ম (embryonic endoderm) বলে। এই স্তর এবং নিচে অবস্থিত কুসুমের মাঝখানের গহ্বরকে আর্কেন্টেরন (archenteron) বলে (চিত্র ৫২)।

অনেকে হাইপোব্লাস্ট সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রান্তীয় কোষের ডিলেমিনেশন বা ইনভেজিনেশন প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঐ প্রক্রিয়া দুটির সংজ্ঞানুযায়ী মুরগির ডিমে তা ঘটে না। তাছাড়া অন্তর্নিষেক হওয়ায় এবং ডিম্বাশয়ে থাকার সময়ই ক্লিভেজ ঘটা, এমনকি ব্লাস্টুলা দশায় উপনীত হওয়ায় হাইপোব্লাস্ট গঠনে নিবেদিত কোষের উৎপত্তি নির্ধারণ করা দুরূহ। এ অসুবিধা দূরীকরণে অবশ্য উপায়ও বের হয়েছে। মুরগির জরায়ু চেপে নিষিক্ত ডিমকে বের করে নিয়ে এর ভিতরকার পরিস্ফুটন পদ্ধতি সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। তবে বের করে আনা ডিমটি মুরগির দেহতাপ অনুযায়ী ৪২° সে. রেখে দিতে হবে বা ব্লাস্টোডার্ম কেটে নিয়ে কৃত্রিম উপায়েও দেখা যেতে পারে।

দেখা গেছে, হাইপোব্লাস্ট প্রথমে পেলুসিডা অঞ্চলের পিছনের অংশে আবির্ভূত হয়, পরের ধাপগুলোতে সামনে প্রসারিত হয়। এর উপযুক্ত ব্যাখ্যা হচ্ছে, পেলুসিডা ও ওপেকা অঞ্চলের দুই সীমারেখার মধ্যবর্তী অন্তঃস্থ অবস্থানে রক্ষিত শিথিল কোষ থেকে হাইপোব্লাস্টের উৎপত্তি হয়। কোষগুলো প্রথমে এপিব্লাস্টের নিচে যুক্ত অবস্থায় থাকে, ক্রমশ পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটি অবিচ্ছিন্ন স্তর

নির্মাণ করে। এই সংযুক্তি ঘটা শুরু হয় পিছনের প্রান্ত থেকে। এভাবে স্তরটি সামনেও বিস্তৃত হয়।

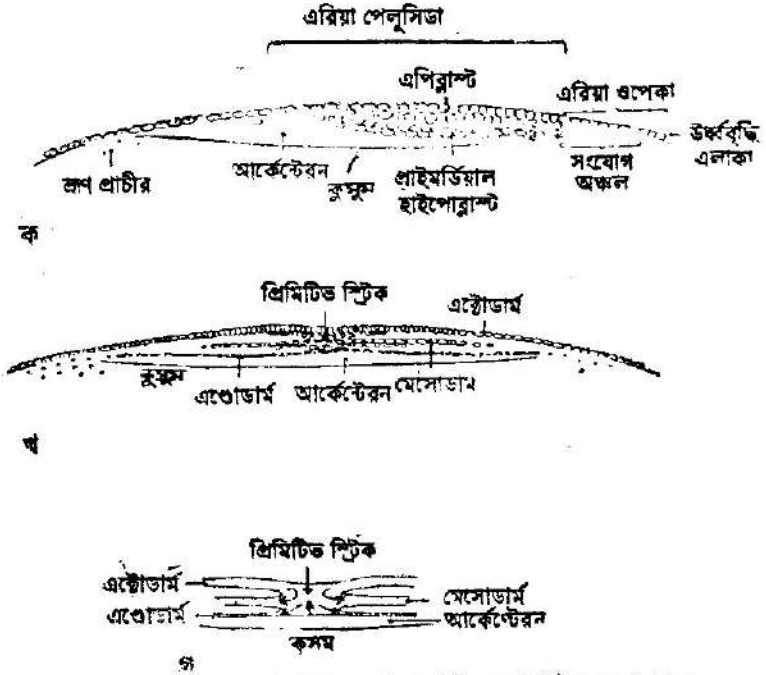

চিত্র ৫২ : মুরগি-ভ্রূণে প্রাইমর্ডিয়াল হাইপোব্লাস্ট, এণ্ডোডার্ম ও মেসোডার্মের উৎপত্তি (Metwen, ১৯৬৯ অনুসরণে)

এ অবস্থায় মুরগি ডিম পাড়ে; তখন সমগ্র ব্লাস্টোডর্মের ব্যাস হয় ৩·৩৬ এবং এরিয়া পেলুসিডা ২·১৬ মি. মি. ব্যাসযুক্ত।

(২) প্রিমিটিভ স্ট্রিক সৃষ্টি : গ্যাস্ট্রুলেশনের দ্বিতীয় ধাপে এরিয়া পেলুসিডার পিছনের অংশ জুড়ে এপিব্লাস্ট কোষ কেন্দ্রিভূত হয়ে একটি তিনকোণা স্থূল অংশ গঠন করে। তা ক্রমশ সামনের দিকে লম্বা অক্ষ বরাবর বাড়তে থাকে। স্প্রাট (Spratt, ১৯৪৬) উল্লেখ করেছেন যে, এরিয়া পেলুসিডার পিছন দিকে মধ্যরেখা বরাবর এপিব্লাস্টের পার্শ্বীয় অঞ্চলের কোষগুলির কেন্দ্রীভূত হাওয়ার জন্য অর্থাৎ অভিসরণ বা কনভারজেন্স (Convergence) এর জন্য এই স্থানে ব্লাস্টোডার্ম স্থূল হয় এবং প্রিমিটিভ স্ট্রিকের আবির্ভাব ঘটে। পরিশেষে তা ব্লাস্টোডিস্কের মধ্য

অক্ষ বরাবর তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত বড় হয়ে একটি গাঢ় বর্ণের প্রশস্ত ফিতার মতো অংশে পরিণত হয়। এর নাম প্রিমিটিভ স্ট্রিক (Primitive streak)। ১৮-১৯ ঘণ্টা ডিমে তা দেওয়ার পর স্ট্রিকের মাথাটি ভোঁতা ও গোলাকার ধারণ করে। এই অংশটিকে হেনসেন-এর পর্ব (Hensen's node) বা হেনসেন-এর গাঁইট (Hensen's knot) বলে।

প্রথমে প্রিমিটিভ স্ট্রিক একটি দণ্ডের মত থাকলেও পরে এর মধ্যরেখায় একটি সংকীর্ণ খাদ সৃষ্টি হয়। এর নাম প্রিমিটিভ খাদ (Primitive groove)। খাদের দুই কিনারাকে বলে প্রিমিটিভ ভাঁজ (Primitive fold)। সামনের দিকে খাদ একটি গর্তে শেষ হয়েছে। এই গর্তটিকে প্রিমিটিভ পিট (Primitive pit) বলে।

প্রিমিটিভ স্ট্রিকের উৎপত্তি
(চিত্র ৫৩, চিত্র ৫৪, চিত্র ৫৫)

প্রথম অবস্থায় প্রিমিটিভ স্ট্রিকটি থাকে খাটো, ত্রিকোণা ও প্রশস্ত, এবং এরিয়া পেলুসিডা অঞ্চলের পিছনের প্রান্তে, এর সীমারেখাও থাকে অস্পষ্ট। তখন একে খাটো প্রিমিটিভ স্ট্রিক (short primitive streak) বলে। পরে যখন এর সামনে আরও উপাদান এসে জড়ো হয় তখন তা লম্বা হতে থাকে। সেইসাথে প্রিমিটিভ স্ট্রিক আড়াআড়ি সংকুচিত হলে তা সরু হয়ে একটি সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। তখন একে সুনির্দিষ্ট প্রিমিটিভ স্ট্রিক (definitive primitive streak) বলে।

প্রিমিটিভ স্ট্রিকের খাটো দশাতেই ব্লাস্টোডার্মের কোষগুলি এপিব্লাস্ট ও হাইপোব্লাস্টের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে পরিযাত্রী হয়। কোষগুলি একাকী বা ঝাঁক বেঁধেও পরিযাত্রী হতে পারে, তবে সবসময়ই তা একটি নির্দিষ্ট দিকে হয়ে থাকে। তখন এপিব্লাস্ট কোষের নিয়ত এপিথেলীয় বিন্যাস নষ্ট হয়ে যায়। এই ধরনের গ্যাস্ট্রুলীয় চলনকে ইমিগ্রেশন (immigration) নামে অভিহিত করা হয় (Balinsky, ১৯৮১), তবে একে ইনগ্রেসন-ও বলা যায় (Trinkaus, ১৯৭৬)।

পরিযায়ীরত কোষগুলি তাড়াতাড়ি হাইপোব্লাস্টে পৌঁছে এই স্তরের কোষগুলির নিবিড় সান্নিধ্যে এসে পড়ে। তখন থেকে প্রিমিটিভ স্ট্রিক চলমান কোষের একটি গঠনে পরিণত হয়। কোষের চলার দিকটি থাকে ব্লাস্টোডার্মের উপরতল থেকে নিচের দিকে, হাইপোব্লাস্টের দিকে, তবে স্ট্রিকের সামনে এবং পাশেও বিস্তৃত হতে দেখা যায়।

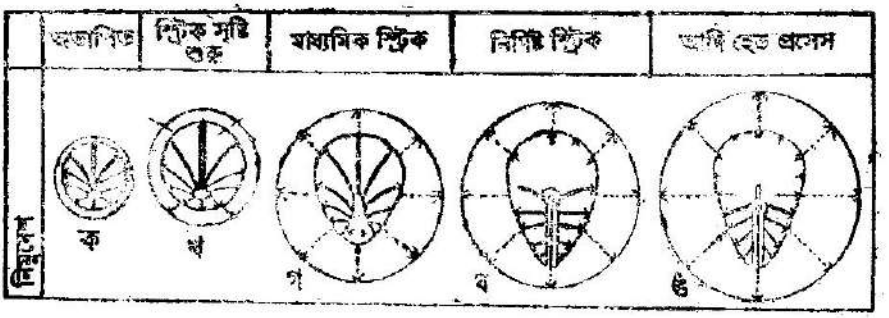

চিত্র ৫১ : মুরগি-ভ্রূণে প্রিমিটিভ স্ট্রিক সৃষ্টির সময় হাইপোব্লাস্টে মরফোজেনেটিক চলন (Balinsky, ১৯৮১ অনুসরণে)

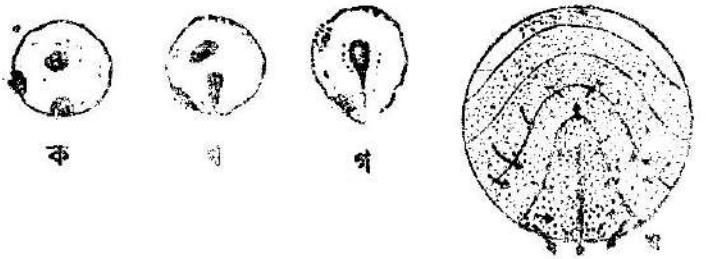

চিত্র ৫৪। প্রিমিটিভ স্ট্রিক সৃষ্টির সময় মুরগি ভ্রূণের এপিব্লাস্টে রঞ্জিত এলাকা-গুলির চলন (Balinsky, ১৯৮১ অনুসরণে)

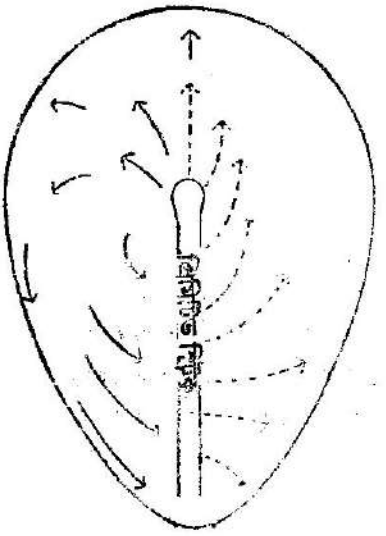

চিত্র ৫৫ : পাখির ভ্রূণে গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় মরফোজেনেটিক চলন ; বামপাশের তরঙ্গ রেখা এপিব্লাস্টে চলন নির্দেশ করছে ; ডানপাশের তরঙ্গরেখা প্রিমিটিভ স্ট্রিকের মাধ্যমে ভিতরে আসা কোষের চলন নির্দেশক (Balinsky, ১৯৮১ অনুসরণে)

ব্লাস্টোডার্মের কোষগুলো একাকী স্থানান্তরিত হলেও ওদের কিছু নির্দিষ্ট কারণের জন্যই হয়ে থাকে, তাই সমগ্র কোষপিণ্ড একটি সমন্বিত চং-এ চলাচল করে। ব্লাস্টোডার্ম-তলে অবতল সৃষ্টি, প্রিমিটিভ স্ট্রিকের মধ্যরেখায় খাদের উৎপত্তি এবং হেনসেন-এর গাঁইটের কেন্দ্রে চোঙাকৃতির গর্তের উদ্ভব এসবই ব্লাস্টোডার্ম তল থেকে ভিতরের দিকে কোষের গণচলনের জন্যই হয়ে থাকে।

এপিব্লাস্টের কোষগুলো অভ্যন্তরে পরিযায়ী হওয়ায় উপরতল থেকে ব্লাস্টোডার্মের সমস্ত এলাকা অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে সন্নিহিত অঞ্চলের কোষগুলোর মধ্যরেখায় পরিযান ও প্রিমিটিভ স্ট্রিকে স্থানগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়। নবাগত কোষগুলোও আবার পর্যায়ক্রমে ভিতরে পরিযাত্রী হয়। এভাবে একটি অবিচ্ছিন্ন কোষ প্রবাহ চলতে থাকায় প্রিমিটিভ স্ট্রিক স্থায়ী হয়। কিন্তু যে কোষগুলো দিয়ে প্রিমিটিভ স্ট্রিক গঠিত হয়, সেগুলো স্থায়ী না হয়ে সবসময়ই নবাগত কোষে প্রতিস্থাপিত হওয়ায় স্ট্রিকের গঠন এক থাকে না। প্রথমে যে অঞ্চলগুলোর ইনগ্রেশন ঘটে সেগুলো হচ্ছে ভাবী এণ্ডোডার্ম, নটোকর্ড এবং ভাবী মস্তক মেসোডার্ম।

এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এণ্ডোডার্মের পৃথকীভবন (চিত্র ৫২) : ভ্রূণীয় এপিব্লাস্ট ভাবী নটোকর্ড, মেসোডার্ম ও এক্টোডার্ম কোষ নিয়ে গঠিত। নটোকর্ড কোষ ও মেসোডার্ম কোষ ভিতরের দিকে প্রবেশ করে প্রিমিটিভ স্ট্রিকের উভয় পাশে এপিব্লাস্ট ও প্রাইমডিয়াল হাইপোব্লাস্টের মাঝখানে একটি স্তর সৃষ্টি করে। এটিই হচ্ছে মেসোডার্ম। কিছু কোষ প্রিমিটিভ স্ট্রিকের ভিতর দিয়ে পূর্বেস্থিত প্রাইমডিয়াল হাইপোব্লাস্টে পৌঁছে ওর বৃদ্ধি ঘটায়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হাইপোব্লাস্টকে তখন এণ্ডোডার্ম বলে। এ দুই স্তর উৎপত্তির পর এপিব্লাস্টের বাকি অংশকে এক্টোডার্ম বলে। মেসোডার্ম ও এণ্ডোডার্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়াও ইনফিলট্রেশনের মাধ্যমে ঘটে থাকে।

বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লীর প্রকারভেদ

উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণীতে নিচে বর্ণিত বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লী পাওয়া যায়।

(১) অ্যামনিওন (Amnion)

(২) কুসুম থলি (Yalk sac)

(৩) অ্যালানটয়েস (Allantois) এবং

(৪) কোরিওন (Chorion)।

(১) অ্যামনিওন ঃ এক্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত এই পাতলা ঝিল্লী একটি তরল পদার্থপূর্ণ থলির মতো হয়ে ভ্রূণকে ঘিরে রাখে। মূলত এ কারণেই স্থলচর প্রাণীরা ডাঙায় বসবাসের উপযোগী হতে পেরেছে। অ্যামনিওনকে একটি মিনি পুকুরের সাথে তুলনা করা যায়। ব্যাঙে এ ঝিল্লী থাকে না বলে ডিমের সুরক্ষার জন্য তাকে জলাশয়ে যেতে হয়। বিবর্তনের কোন এক ধাপে অ্যামনিওন অর্জন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রাণিজগতে অ্যামনিওন সংযোজনের ফলেই সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। তাই অ্যামনিওনধারী প্রাণীদের অর্থাৎ সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীদের সম্মিলিতভাবে অ্যামনিওট (Amniote) বলে। অন্যদিকে, যেসব মেরুদণ্ডী প্রাণীতে, অর্থাৎ মাছ ও ব্যাঙ, অ্যামনিওন নামের এই বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লীটি থাকে না, তাদের অ-অ্যামনিওট (Anamniote) বলে।

(২) কুসুম থলি ঃ এণ্ডোডার্ম থেকে উদ্ভূত এ ঝিল্লীটি সরীসৃপ ও পাখির কুসুমসমৃদ্ধ ভ্রূণে পুষ্টি সাধনের কাজে জড়িত থাকে। স্তন্যপায়ীদের ডিম্বাণুতে কুসুম না থাকলেও কুসুম থলি ঠিকই আবির্ভূত হয়। এ ঘটনা বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবেও প্রয়োগ করা যায়। স্তন্যপায়ীতে এ ঝিল্লী কয়েকটি গৌন কাজ সম্পাদন করে। কুসুম থলির এণ্ডোডার্ম থেকে আদি জননকোষ এবং এণ্ডোডার্ম সংলগ্ন মেসোডার্ম থেকে লোহিত ও শ্বেত রক্ত কণিকার উৎপত্তি হয়।

(৩) অ্যালানটয়েস ঃ এ ঝিল্লীটি ভ্রূণের পশ্চাৎ অন্ত্র থেকে উদ্ভূত এবং এণ্ডোডার্মে মোড়ানো একটি বহিঃবৃদ্ধি। এর প্রধান কাজ হচ্ছে ভ্রূণের বর্জ্য পদার্থ সঞ্চয় ও বর্জন এবং গ্যাসীয় বিনিময়ে সাহায্য করা।

(৪) কোরিওন ঃ কোরিওন হচ্ছে একেবারে বাইরের ঝিল্লী। সরীসৃপ ও পাখিতে এর প্রধান কাজ হচ্ছে গ্যাসীয় বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট থাকা, আর স্তন্যপায়ীতে নানা ধরনের বিচিত্র কাজ সম্পন্ন করা, যেমন বিভিন্ন অমরা সৃষ্টিতে অংশ নেওয়া ইত্যাদি।

বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লীর পরিস্ফুটন

অ্যামনিওট প্রাণীদের প্রসবিত ডিমগুলোকে শুষ্কতা ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য পরিস্ফুটনরত ভ্রূণের চারদিকে যেসব ঝিল্লীর আবির্ভাব ঘটে, তাদের বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লী (Extra-embryonic membrane) বলে। মুরগির বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লীগুলো হচ্ছে ঃ

(১) অ্যামনিওন,
(২) কোরিওন,

(৩) কুসুম থলি ও
(৪) অ্যালানটয়েস।

নিউরাল নল সৃষ্টির সময় পার্শ্বীয় প্লেট মেসোডার্ম দুটি স্তরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—একটি হচ্ছে মেসোডার্মের বহিঃস্থ সোমাটিক স্তর, যা এণ্ডোডার্মের ভিতরের দিকে অবস্থান করে, এবং অন্যটি অন্তঃস্থ স্প্ল্যাংকনিক স্তর, যা এণ্ডোডার্মের বাইরে অবস্থান করে। দুটি স্তরই ওদের মাঝখানে একটি সিলোমীয় ফাঁকা স্থান ধরে রাখে। মেসোডার্মের সোমাটিক স্তর ও এক্টোডার্মকে একসাথে সোমাটোপ্লিউর (Somatopleure) এবং মেসোডার্মের স্প্ল্যাংকনিক স্তর ও এণ্ডোডার্মকে একসাথে স্প্ল্যাংকনোপ্লিউর (Splanchnopleure) বলে। স্তর দুটি ভ্রূণসৃষ্টির স্থান থেকে অনেক দূরে ও ক্রমেই কুসুমের উপর দিয়ে প্রসারিত হতে থাকে। প্রথমে ভ্রূণের দেহ কোন নির্দিষ্ট সীমানায় চিহ্নিত থাকে না। কিন্তু দেহটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করার সাথে সাথেই এর চারদিকে কতকগুলি ভাঁজের সৃষ্টি হয়। এদের দেহভাঁজ (Body fold) বলে। দেহভাঁজ সৃষ্টিতে তিনটি কোষস্তরই জড়িত থাকে এবং নিচের দিকে ও ভিতরের দিকে প্রসারিত হয়ে দেহটিকে নিচে অবস্থিত কুসুম থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

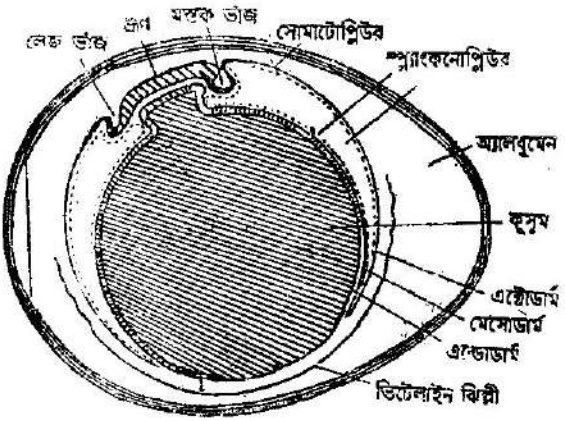

চিত্র ৫৬: মুরগি ভ্রূণে বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লী পরিস্ফুটনের প্রাথমিক পর্যায় (Torrey ১৯৭১ অনুসরণে)

অ্যামনিওন পরিস্ফুটন: পরিস্ফুটনের দ্বিতীয় দিনে (৩০ ঘণ্টা তা দেবার পর) ভ্রূণের মাথার ঠিক সামনে ব্লাস্টোডার্মে সোমাটোপ্লিউরের একটি অর্ধবৃত্তাকার ভাঁজ দেখা যায়। ভাঁজটি তাড়াতাড়ি মাথার পিছন দিকে বাড়তে থাকে। শুরুতে

শুধু এক্টোডার্ম ও এণ্ডোডার্মের একটি দ্বৈত ভাঁজ হলেও শীঘ্রই এতে বহিঃভ্রূণীয় মেসোডার্ম ও সিলোমের অনুপ্রবেশের ফলে তা সোমাটিক ও স্প্ল্যাংকনিক স্তরের বহিঃভ্রূণীয় প্রবৃদ্ধি হিসেবে বিভক্ত হয়। ভাঁজ সৃষ্টিতে দুটি স্তরই সমানভাবে অংশ নেয়। স্প্ল্যাংকনোপ্লিউর কুসুমের বাইরের তলে প্রত্যাহৃত হয়, কিন্তু সোমাটোপ্লিউর অ্যামনিওটিক মস্তক-ভাঁজ (Amniotic head fold) নামে দুটি স্থায়ী স্তর সৃষ্টি করে (চিত্র ৫৬)। ভ্রূণ তখন ধীরে ধীরে কুসুমে সামান্য ডুবে যায় এবং মস্তক-ভাঁজ বড় হয়ে পিছনে প্রসারিত হয়। এর প্রসারণের সাথে সাথে ভ্রূণের সামনের অংশের দুই পাশ থেকে পিছনে ধাবমান পার্শ্বীয় অ্যামনিওটিক ভাঁজ (Lateral amniotic fold) বের হয় এবং পরিশেষে তা ভ্রূণের পৃষ্ঠীয় মধ্যরেখায় মিলিত হয়। দ্বিতীয় দিনের শেষে ভ্রূণটি এভাবে প্রায় সম্পূর্ণ আবৃত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় দিনের প্রায় শেষে বা তৃতীয় দিনের শুরুতে মস্তক-ভাঁজ যখন দেহের ১৮টি খণ্ডের উপর পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় তখন ভ্রূণের পশ্চাৎ প্রান্ত থেকে অ্যামনিওটিক লেজ বা পুচ্ছ-ভাঁজ (Amniotic tail fold) নামে আরেকটি ভাঁজ সৃষ্টি হয় এবং তা পার্শ্বীয় ভাঁজ তৈরি করে মস্তক-ভাঁজের দিকে এগিয়ে যায় (চিত্র ৫৭)।

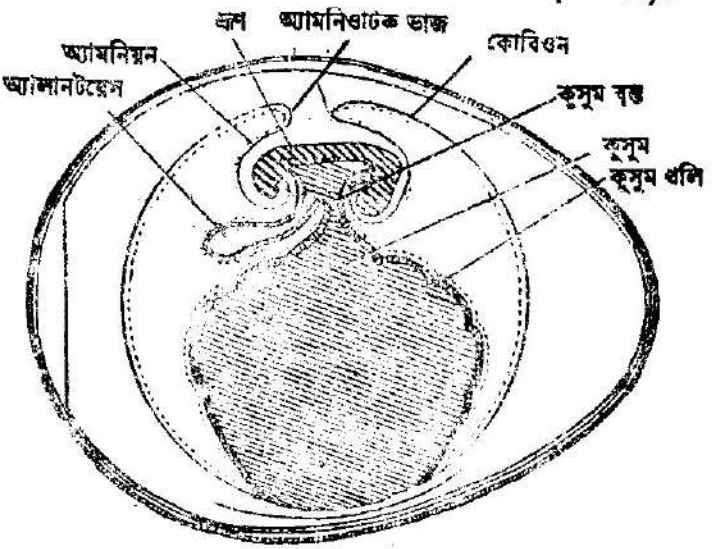

চিত্র ৫৭ : মুরগি ভ্রূণে বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লী পরিস্ফুটনের প্রাথমিক পর্যায় (Torrey, ১৯৭১ অনুসরণে)।

অ্যামনিওনের সামনের অংশ যেহেতু আগে যাত্রা শুরু করে এবং দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তাই মস্তক-ভাঁজ ও পুচ্ছ-ভাঁজ পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয়ে তৃতীয় দিনের

শেষে বা চতুর্থ দিনের শুরুতে দেহের পশ্চাৎ প্রান্তের ঠিক কাছেই একীভূত হয়। সংযোগস্থলটিকে সেরো-অ্যামনিওটিক সংযোগ (sero-amniotic connection) বলে (চিত্র ৫৮)। ভাঁজ দুটির একীভবনের ফলে ভ্রূণের উপরে ও পাশে দুটি আবরণের সৃষ্টি হয়। অ্যামনিওটিক ভাঁজের অবিচ্ছিন্ন অন্তর্প্রাচীর ভ্রূণের চারদিক ঘিরে রাখে। এই অবিচ্ছিন্ন অন্তর্প্রাচীরকে **অ্যামনিওন** (Amnion) এর ভিতরের গহ্বরকে **অ্যামনিওটিক গহ্বর** (amniotic cavity) বলে। গহ্বরটি অ্যামনিওটিক তরল (Amniotic fluid) নামে এক ধরনের জলীয় পদার্থে পূর্ণ হয়ে ভ্রূণকে ভাসিয়ে রাখে। ভ্রূণটি এসময় বাম পাশে বেঁকে যায়। এভাবে মুরগির ভ্রূণ কুসুম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়ে।

অ্যামনিওন নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে মস্তক, পুচ্ছ ও পার্শ্বীয় ভাঁজের অঞ্চীয়দেশ ভ্রূণের নিচে পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে চলে আসে, কিন্তু একীভূত হয় না। এতে ওদের মাঝখানে একটি খাটো মোটা ও ফাঁপা বৃন্তের সৃষ্টি হয় যা ভ্রূণ কুসুম-থলি ও বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। এই বৃন্তের একেবারে বাইরের প্রাচীরটি অ্যামনিওনের সাথে অবিচ্ছিন্ন থাকে, অর্থাৎ তা এক্টোডার্ম ও সোমাটিক মেসোডার্মে নির্মিত। তাই বৃন্তটিকে সোমাটিক আম্বিলিকাস (somatic umbilicus) নামে অভিহিত করা হয় (চিত্র ৫৮)।

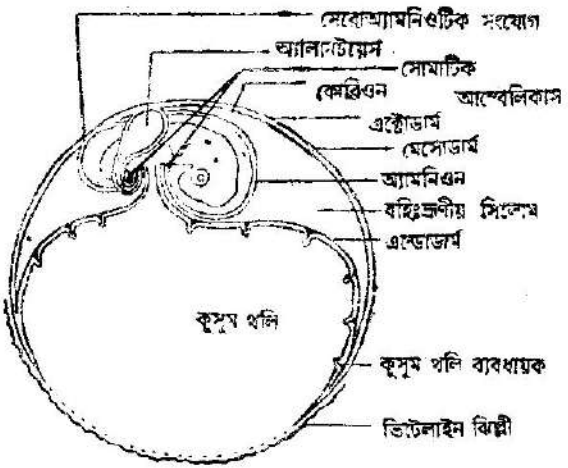

চিত্র ৫৮ : মুরগি ভ্রূণে বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লীর পরিস্ফুটন : ডিমে তা দেওয়ার ৪র্থ দিন McEwen, ১৯৬৮ অনুসরণে)

কোরিওন পরিস্ফুটন ঃ সেরো-অ্যামনিওটিক সংযোগ সৃষ্টির পর ভাঁজের বাইরের অংশও ভিতরের অংশের মত অবিচ্ছিন্ন ঝিল্লীর সৃষ্টি করে, তাই ঝিল্লীটি শুধু বাইরে এক্টোডার্ম ও ভিতরে এণ্ডোডার্মে গঠিত। এ ঝিল্লীটিই হচ্ছে কোরিওন (Chorion)। একে সেরোসা বা ভুয়া অ্যামনিওন (serosa or false amnion)-ও বলা হয়ে থাকে। কোরিওন ও অ্যামনিওনের মাঝখানে অবস্থিত এবং ভ্রূণের সিলোমের সাথে অবিচ্ছিন্ন যুক্ত ফাঁকা গহ্বরটিকে বহিঃভ্রূণীয় সিলোম (extra embryonic coelom) বা এক্সোসিলোম (exocoelom) বলে।

অ্যামনিওনের গঠন সম্পন্ন হওয়ার পরও কোরিওনের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং পরিশেষে বিস্তৃত হয়ে চুনময় খোলকের সমগ্র খোলক-ঝিল্লীর সংলগ্ন হয়। এ-ভাবে, কোরিওন অবশেষে ভ্রূণদেহ ও অন্যান্য বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লীকে সম্পূর্ণ ঘিরে রাখে।

কুসুম-থলির পরিস্ফুটন ঃ সোমাটিক আস্থিলিকাসের ভিতর এবং বৃন্তের অন্ত-প্রাচীরে বেষ্টিত ফাঁকা স্থানটি বহিঃভ্রূণীয় এবং অন্তঃস্বভাবে ভ্রূণের সিলোমের সাথে অবিচ্ছিন্ন বৃন্তের অন্তপ্রাচীর অবশেষে স্প্ল্যাংকনোপ্লিউরে (স্প্ল্যাংকনিক মেসোডার্ম + এণ্ডোডার্ম) গঠিত হয়। এর নাম কুসুম বৃন্ত (yolk stalk)। আসলে বৃন্তটি সোমাটিক আস্থিলিকাসেরই অন্তঃস্থ নল যা আস্থিলিকাস থেকে সিলোমীয় ফাঁকের সাহায্যে আলাদা করা থাকে।

কুসুম-বৃন্তের প্রাচীর ভ্রূণের ভিতরের আন্ত্রিক-প্রাচীর এবং বাইরে কুসুমের উপরে অবস্থিত স্প্ল্যাংকনোপ্লিউরের সাথে একই সঙ্গে বাড়তে থাকে। এ স্তর ধীরে ধীরে কুসুমের চারদিকে প্রসারিত হয় এবং এর একেবারে বাইরের সীমানার এণ্ডোডার্ম অংশ উপরের কোরিওনের সাথে অভিন্ন হয়ে পড়ে। নয় দিনের মধ্যে তা কুসুমকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে কুসুম থলিতে (yolk-sac) পরিণত হয়। থলিটি কুসুম-বৃন্ত দিয়ে ভ্রূণের সাথে যুক্ত থাকে। তা' দেওয়ার নয় দিনের মাথায় থলি গঠন প্রায় সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে ভ্রূণ দেহের পশ্চাৎ-অঙ্কীয়দেশে কুসুমের একপাশে একটি স্থানে ছোট ছিদ্র থাকে। এর নাম কুসুম থলি আম্বিলিকাস (yolk-sac umbilicus)। অবশ্য সতের দিনের মাথায় ছিদ্রটি নিরেট কলাপিণ্ডে বন্ধ হয়ে যায়। থলির নিচের স্তরটি নানাস্থানে ভাঁজ হয়ে কুসুমে ঢুকে থাকে। এদের কুসুল-থলি ব্যবধায়ক (yolk-sac septa) বলে (চিত্র ৫৯)। এতে যেসব গ্রন্থিময় ও শোষক কোষ থাকে তা কুসুমকে রক্তপ্রবাহে প্রবেশের আগে পরিপাক করে দেয়। ভ্রূণ যতই বড় হতে থাকে, ততই সে কুসুম থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে, এর ফলে কুসুম-থলির আকৃতিও ছোট হয়ে যায়।

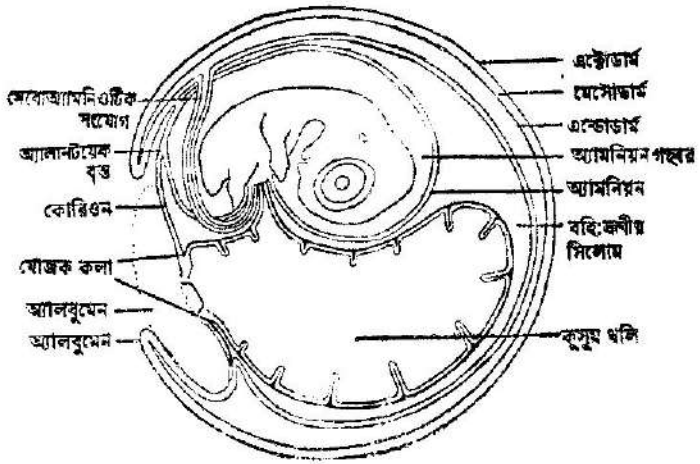

চিত্র ৫৯ : মুরগি ভ্রূণে বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লীর পরিস্ফুটন : ডিমে তা দেওয়ার ৯ম দিন
(McEwen, ১৯৬৮ অনুসরণে)

অ্যালানটয়েস পরিস্ফুটন : আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লী হচ্ছে অ্যালানটয়েস। পরিস্ফুটনের তৃতীয় দিনে পশ্চাৎ অন্ত্রের বহির্বৃদ্ধি আকারে এর গঠন শুরু হয়। এ বহির্বৃদ্ধি স্প্ল্যাংকনোপ্লিউর দিয়ে গঠিত।

চতুর্থ দিনে গঠনটি সোমাটিক আম্বিলিকাস ও কুসুম-থলির মাঝখানে সিলোমীয় ফাঁক ঠেলে বেরিয়ে এসে বহিঃভ্রূণীয় সিলোমে বড় হতে থাকে। তখন একে দুটি অংশে ভাগ করা যায়—একটি হচ্ছে থলির মত বেড়ে উঠা বাইরের অংশ, আরেকটি সরু গলার মত অংশ যা দিয়ে থলিটি অন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকে, এর নাম অ্যালানটয়েক বৃন্ত বা গ্রীবা (allantoic stalk or neck)। বৃন্তের ভিতর দিয়ে দুটি অ্যালানটয়েক ধমনী (allantoic arteries) যা পরে একটিতে পরিণত হয়, এবং একটি অ্যালনটয়েক শিরা (Allantoic vein) অতিক্রম করে। ওরা থলির গায়ে অসংখ্য রক্তজালকের সৃষ্টি করে।

অ্যালানটয়েস তখন তাড়াতাড়ি বড় হয়ে একটি ঝিল্লীময় থলিতে পরিণত হয় এবং দুই-একদিনের মধ্যে বহিঃভ্রূণীয় সিলোমের অধিকাংশ দখল করে নেয়। তখন অ্যামানিওটিক ও কোরিওনিক মেসোডার্ম একীভূত হয়ে কোরিও-অ্যালানটয়েক ঝিল্লী (Chorio-allantoic membrane) গঠন করে (চিত্র ৫৯; চিত্র ৬০)। এসময় কুসুম-থলি আম্বিলিকাস সংলগ্ন অংশে অ্যালবুমেন ঘনীভূত হয়ে থাকে।

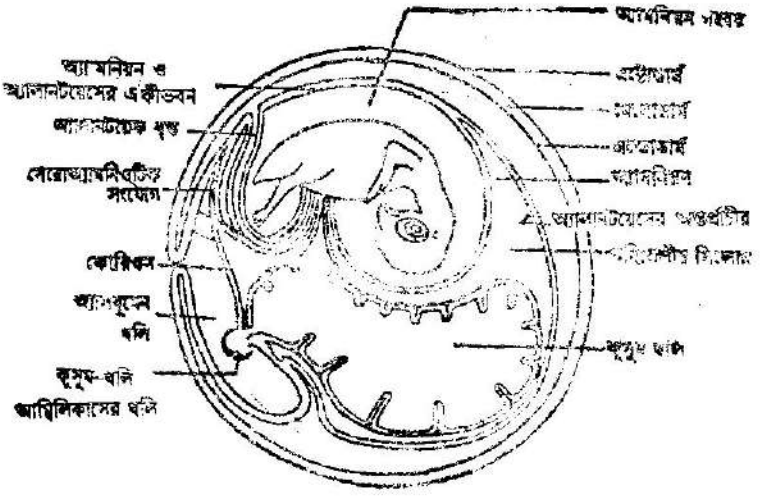

চিত্র ৬০ : মুরগি ভ্রূণের বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লীর পরিস্ফুটন : ডিম পাড়া দেওয়ার ১০ দিন
(McEwen, ১৯৬৯ অনুসরণে)

নয় বা দশ দিনে তা খুব ঘন হয়ে যায়। দশম দিনে কোরিও-অ্যালানটয়েক ঝিল্লীর একটি অংশ ঐ অ্যালবুমেনকে ঘিরে ফেলে। তখন তাকে অ্যালবুমেন-থলি (albumen sac) বলে। এই থলি থেকে সামান্য পরিমাণ অ্যালবুমেন সেরো-অ্যামনিওটিক সংযোগের পাশে সৃষ্ট একটি ছিদ্রপথে অ্যামনিওনে প্রবেশ করে, বাকী অ্যালবুমেন দেহে শোষিত হয়। ডিম ফুটে বের হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কুসুম থলির সাথে অ্যালবুমেন-থলিও ভ্রূণের ভিতরে প্রত্যাহৃত হয়ে যায়।

বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লীর কাজ

অ্যামনিওনের কাজ

১) ভ্রূণ অ্যামনিওনের তরল পদার্থে পূর্ণ গহ্বরে অবস্থান করায় শুষ্কতা থেকে রক্ষা পায়।

২) তরল পদার্থ ভ্রূণকে সম্ভাব্য আঘাত থেকে রক্ষা করে।

৩) তরল পদার্থে পরিবেষ্টিত হওয়ায় বাইরের চাপ ভ্রূণের দেহে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

৪) অ্যামনিওন ভ্রূণকে খোলক থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, এর ফলে পরিস্ফুটনের সময় ভ্রূণকে খোলকের সাথে আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা রোধ করে এবং খোলকের সাথে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকেও রক্ষা করে।

৫) তরল পদার্থপূর্ণ গহ্বর ভ্রূণকে প্রয়োজনমত আকার ও অবস্থান পরিবর্তনের সুযোগ করে দিয়েছে।

৭) অ্যামনিওন প্রাচীরের পেশীতন্তুগুলোর সংকোচনে অ্যামনিওটির তরল ও ভ্রূণ ধীরে ধীরে আন্দোলিত হয়, ফলে ভ্রূণের বর্ধনশীল অঙ্গগুলো পরস্পর পৃথক থাকে এবং কোন ধরনের বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

৭) অ্যালবুমেন শোষণে সাহায্য করে।

কোরিওনের কাজ

১) অ্যালানটয়েসের সাথে মিলিত হয়ে শ্বসনে সাহায্য করে।

২) অ্যালানটয়েসের সাথে মিলিতভাবে অ্যালবুমেন শোষণ করে পুষ্টি যোগায়।

কুসুম-থলির কাজ

ভ্রূণের মুখ্য পুষ্টি অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। কুসুম সরাসরি কুসুম-থলি থেকে বৃন্তের ভিতর দিয়ে অন্ত্রে পৌঁছায় না। কুসুম-থলির এণ্ডোডার্ম থেকে নিঃসৃত উৎসেচকের বিক্রিয়ায় কুসুম দ্রবণীয় পদার্থে পরিণত হলে তা থলির প্রাচীরের শিরায় শোষিত হয়ে ভ্রূণের বিভিন্ন অংশে পৌঁছায়।

অ্যালানটয়েসের কাজ

১) ভ্রূণের মুখ্য শ্বসন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। কোরিও-অ্যালানটয়েক ঝিল্লী রক্তবাহিকা সমৃদ্ধ হওয়ায় এবং তা ছিদ্রবিশিষ্ট খোলকের ঠিক নিচে অবস্থান করায় ভ্রূণের গ্যাসীয় বিনিময় সহজ হয়েছে।

২) বিপাকজাত বর্জ্য পদার্থের সঞ্চয় ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। এসব পদার্থ অবসারণী অঞ্চল থেকে অ্যালানটয়েক বৃন্তের মাধ্যমে বাহিত হয়। তাই অ্যালানটয়েস উৎপত্তি ও আংশিক কার্যগত দিক থেকে ব্যাঙের মূত্রথলির সমসংস্থ অঙ্গ।

৩) অ্যালানটয়েসের রক্তসংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে খোলক থেকে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম শোষিত হয়ে ভ্রূণের অস্থিগঠনে সাহায্য করে এবং এতে খোলক পাতলা হয়ে হয়ে গেলে শাবক সহজেই তা ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারে।

৪) অ্যালানটয়েসের মেসোডার্মের কিছু অংশ অ্যামনিওনের মেসোডার্মের সাথে যুক্ত হয়ে যে পেশীতন্তু উৎপন্ন করে তাদের সংকোচনের ফলেই ভ্রূণ অ্যামনিওন গহ্বরে ধীরে ধীরে আন্দোলিত হয়।

৫) কোরিওনের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যালবুমেন শোষণে সাহায্য করে।

অষ্টম অধ্যায়

খরগোসের পরিস্ফুটন

খরগোস একটি ইউথেরিয় ল্যাগোমরফ স্তন্যপায়ী। স্তন্যপায়ীর ডিম্বাণু একদিকে খুব ছোট ও কুসুমহীন হওয়ায়, এবং অন্যদিকে সমগ্র পরিস্ফুটনকাল মাতৃগর্ভে ঘটে বলে এদের ভ্রূণীয় বৃদ্ধির প্রত্যেকটি ধাপ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা দুঃসাধ্য। তাই নির্দিষ্ট সময় পরপর মাউন্ট করা স্লাইডে ভ্রূণীয় দৈহিক পরিবর্তন অধ্যয়ন করা হয়। কোন ভ্রূণতত্ত্বীয় গ্রন্থে খরগোসের পরিস্ফুটন সম্বন্ধে আলাদা বিবরণ নেই। তবে অন্য প্রাণীর বৃদ্ধিদশার সাথে খরগোসসহ অন্যান্য স্তন্যপায়ীর কোন কোন পর্যায়ের সাদৃশ্যের কথা অনেক গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। এভাবে তুলনা-মূলক ও ইঙ্গিতমূলক রচনা থেকে একটি আদর্শ ও সহজলভ্য ইউথেরিয় হিসেবে বিবেচনা করে খরগোসের পরিস্ফুটন সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা অর্জনের জন্য আলোচনা করা হল।

নিষেক

যৌন মিলনের সময় স্ত্রী খরগোসের জরায়ুর কাছে পুরুষ খরগোসের স্খলিত শুক্রাণু দুটি ফেলোপিয়ান নালীর (ডিম্বনালী) ভিতর দিয়েই নালীর সংকোচন ও সিলীয় আন্দোলনে সঞ্চালিত হয়ে নালীর উপরের প্রান্তে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে। নিষেকের সময় সম্পূর্ণ শুক্রাণুই ডিম্বাণুর মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু পরে লেজটি অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রথমে অসংখ্য শুক্রাণু ডিম্বাণুর কাছে এসে হায়ালুরোনিডেজ উৎসেচক নিঃসৃত করে, এর ফলে করোনা রেডিয়াটার কোষগুলো ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলে একটিমাত্র শুক্রাণুই ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। তখন ডিম্বাণুর পরিপক্বতা বিভাজন ঘটে এবং নিষেক সম্পন্ন হয়।

ক্লিভেজ (চিত্র ৬১)

ক্লিভেজ ঘটা অবস্থায় জাইগোট ডিম্বনালীর ভিতর দিয়ে জরায়ুতে নেমে আসার সময় জোনা পেলুসিডার চারদিকে একটি অ্যালবুমেন স্তর জমা হয় যা পরে সহায়ক ডিম্বঝিল্লী গঠন করে। নিষেকের ৬০ ঘণ্টা পর জাইগোট জরায়ুতে এসে পৌঁছায়।

খরগোসের ডিম্বাণু প্রতি ক্ষুদ্রাকায় (০·০৮-০·১৫ মি.মি. ব্যাসবিশিষ্ট) ও কুসুমহীন, তাই ক্লিভেজ হলোব্লাস্টিক ধরনের কিন্তু অসমান। এ কারণে প্রথম থেকেই অসমান ব্লাস্টোমিয়ার সৃষ্টি হতে থাকে। নিষেকের প্রায় ৬০-৭০ ঘণ্টা পর তা মরুলা নামের একটি স্ফীত নিরেট কোষগুচ্ছে পরিণত হয়। মরুলা জরায়ুর সংস্পর্শে এসে তার প্রাচীর থেকে তরল খাদ্য শোষণ শুরু করে দ্রুত ফুলে উঠে।

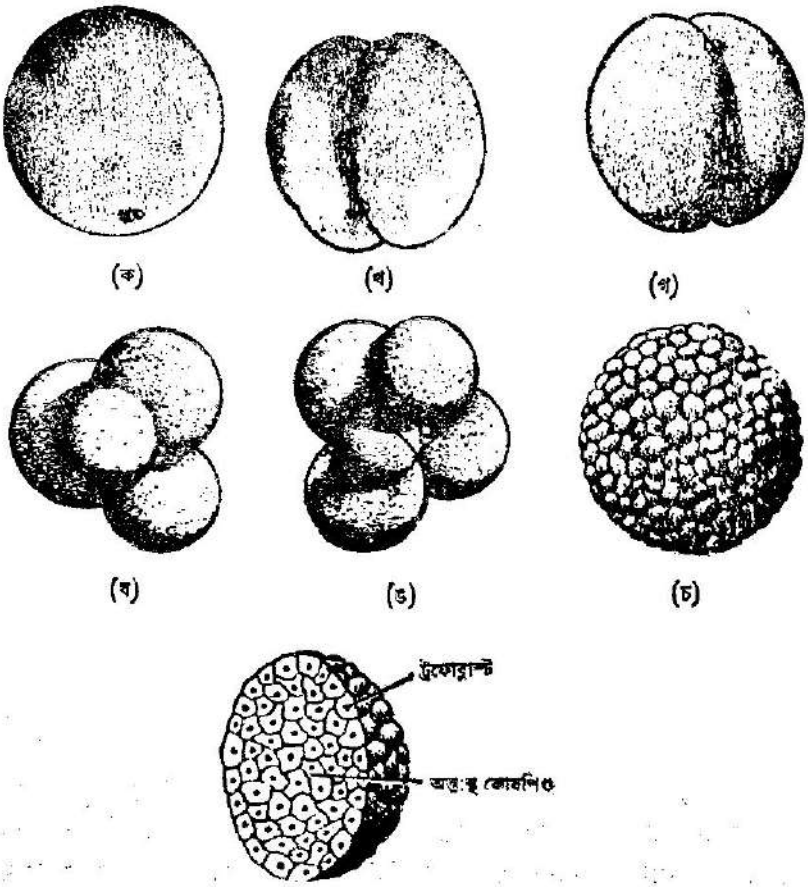

চিত্র ৬১ ক : খরগোসের ডিম্বাণুতে ক্লিভেজের চিত্ররূপ : (ক) জাইগোট; (খ-ঙ) ক্লিভেজ ,(চ) মরুলা ; (ছ) মরুলার মধ্যচ্ছেদ (Huettner, ১৯৪৯ থেকে)

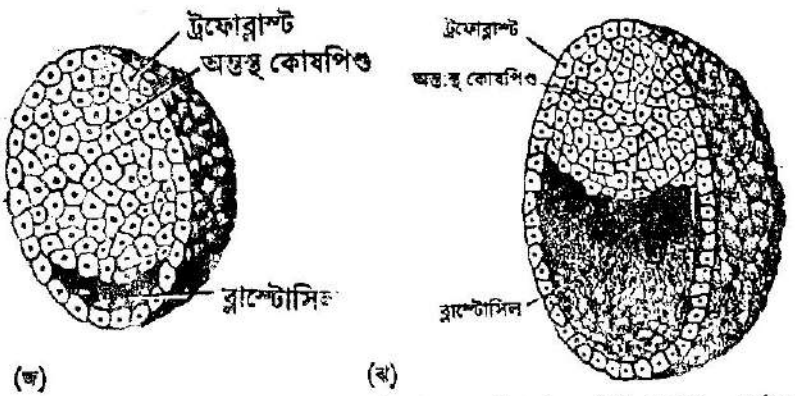

চিত্র ৬১ খ: খরগোসের ডিম্বাণুতে ব্লাস্টুলেশনের চিত্ররূপ: (ক) ও (খ) ব্লাস্টুলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ট্রফোব্লাস্ট থেকে অন্তঃস্থ কোষপিণ্ডের পৃথকীভবন (Huettner, ১৯৭৯ থেকে)

ব্লাস্টুলেশন

মরুলায় দুই ধরনের কোষ পাওয়া যায়। বাইরের কোষগুলো প্রথমে ঘনক্ষেত্রাকার থাকে, পরে তাড়াতাড়ি একটি চাপা এপিথেলিয়াম তৈরি করে অস্থায়ীভাবে জোনা-রেডিয়াটায় আবৃত থাকে। এর নাম সাবজোনাল স্তর (subzonal layer) যা পরে ট্রফোব্লাস্টে (trophoblast) পরিণত হয়। ভিতরের কোষগুলো স্ফীতকায়। এদের **অন্তঃস্থ কোষপিণ্ড** (internal cell mass) বলে (চিত্র ৬১; চিত্র ৬২)।

অন্তঃস্থ কোষপিণ্ডের একপাশে ও নিচে এবং সাবজোনাল স্তরের নিচে গহ্বর সৃষ্টি হয়। গহ্বরটি বড় ও তরলে পূর্ণ হয়ে মরুলার প্রায় অর্ধেক দখল করে নেয়। অন্তঃস্থ কোষপিণ্ড তখন গহ্বরের একপাশে ঝুলন্ত গুটিকার রূপ ধারণ করে। এ অবস্থায় মরুলাকে ব্লাস্টোডার্মিক ভেসিকল (blastodermic vesicle) বা ব্লাস্টোসিস্ট (Blastocyst) বলে যা অন্যান্য মেরুদণ্ডীর ব্লাস্টুলার সমতুল্য, কিন্তু সদৃশ নয়। এর ভিতরের তরলে পূর্ণ গহ্বরটিকে ব্লাস্টোসিল বা সাবজার্মিনাল গহ্বর (subgerminal cavity) বলে। নিষেকের ৯৬ ঘণ্টা (চারদিন) পর ডিম্বনালীর ক্রমসংকোচের মাধ্যমে জাইগোট ব্লাস্টোসিস্ট দশায় জরায়ুতে এসে পৌঁছায়। সাবজোনাল কোষগুলোর উপর্যুপরি বিভাজন এবং চাপা আকার ধারণের মধ্য দিয়ে ব্লাস্টোসিস্ট বড় হতে থাকে।

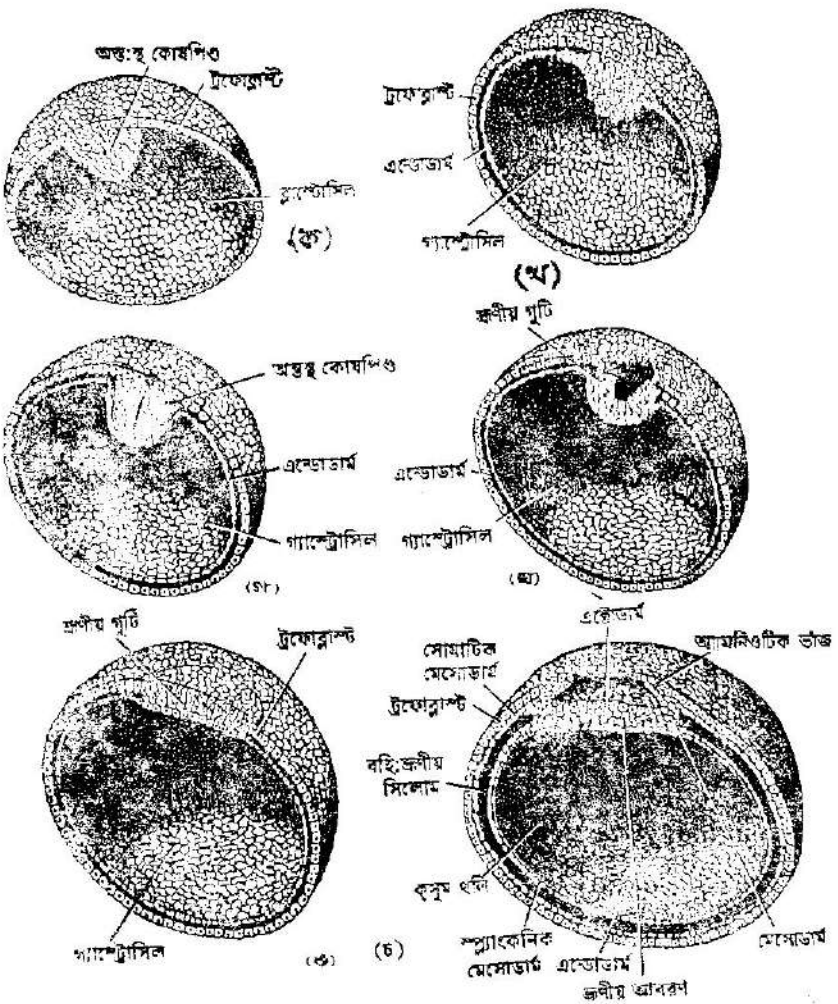

চিত্র ৬২ : খরগোসের ভ্রূণে গ্যাস্ট্রুলেশন (Huettner, ১৯৪৯ অনুসরণে।)

গ্যাস্ট্রুলেশন (চিত্র ৬২)

অন্তঃস্থ কোষপিণ্ডের তলদেশ থেকে কোষ বিচ্ছিন্ন হয়ে ডিলেমিনেশন প্রক্রিয়ায় গ্যাস্ট্রুলেশন সম্পন্ন হয়। এ প্রক্রিয়ায় অন্তঃস্থ কোষপিণ্ড থেকে সৃষ্ট কোষগুলো বার বার বিভক্ত হয়ে ব্লাস্টোসিস্টের সমগ্র অন্তর্দেশ জুড়ে বিস্তৃত হয় এবং একটি সম্পূর্ণ

কোষস্তর নির্মাণ করে। এর নাম হাইপোব্লাস্ট। এ স্তরে আবৃত গহ্বরটিকে আর্কেন্টেরন বলে। এর একটি অংশ কুসুমের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও কুসুমথলি গঠন করে। কুসুম না থাকায় হাইপোব্লাস্টের নিচে ব্লাস্টোসিলের পুরো গহ্বরকেই আর্কেন্টেরন বলা যায়। পরে গহ্বরের হাইপোব্লাস্ট ছাদ মেসোডার্মের সহগামী হয়ে এণ্ডোডার্ম ও ভাঁজ সৃষ্টি করে অন্ত্র গঠন করে। এ সময় গহ্বরের বাকি অংশ এণ্ডোডার্মে বেষ্টিত থাকে এবং বেশ বড় কুসুমথলিতে পরিণত হয়।

হাইপোব্লাস্ট উৎপত্তির সাথে সাথে অন্তঃস্থ কোষপিণ্ডের বাকি অংশ আদি সাবজোনাল স্তরের সাথে মিলিতভাবে এপিব্লাস্ট নির্মাণ করে। এপিব্লাস্ট পরে আরও বিভক্ত হয়ে সাবজোনাল স্তর এবং প্রকৃত অন্তঃস্থ কোষপিণ্ডে গঠিত ভ্রূণীয় গুটি (embryonic knob) সৃষ্টি করে। সাবজোনাল স্তরকে এ পর্যায় থেকে ট্রফোব্লাস্ট (trophoblast) নামে অভিহিত করা হয়। ট্রফোব্লাস্ট কিছু সময়ের জন্য ভ্রূণীয় গুটি ও কুসুম থলিকে ঘিরে রাখে।

সংস্থাপন

উপরে বর্ণিত দশার শেষে বা আগেই ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ু প্রাচীরে সংবদ্ধ হয়। জরায়ু-প্রাচীরে স্তন্যপায়ী ভ্রূণের সংযুক্তি প্রক্রিয়াকে সংস্থাপন (implantation) বলে। খরগোসে মাতৃজরায়ুর মেসোমেট্রিক (mesometric) পাশে একজোড়া ভাঁজের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকটি ব্লাস্টোসিস্ট দুই ভাঁজের মাঝখানে অবস্থান করে এবং ভ্রূণীয় চাকতির (embryonic disc) দু'পাশে ট্রফোব্লাস্ট দিয়ে যুক্ত হয়। এসব অংশের জরায়ু আবরণ বিনষ্ট হলে দুটি অমরার সৃষ্টি হয়। পরে অমরা দুটি একীভূত হয়ে একটিতে পরিণত হয়। ব্লাস্টোসিস্টের অন্য অংশ জরায়ু প্রাচীরের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে না থেকে পরে অদৃশ্য হয়ে যায়। একই সাথে কুসুম-থলির অঙ্কীয় প্রাচীরও বিলুপ্ত হয়। ফলে থলির গহ্বর জরায়ুর সাথে প্রত্যক্ষ সংযোগের সৃষ্টি করে।

অ্যামনিওন ও কোরিওন সৃষ্টি (চিত্র ৬৩)

খরগোসের ভ্রূণে ভাঁজ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অ্যামনিওন সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে ভ্রূণীয় গুটির এপিব্লাস্ট হাইপোব্লাস্টের উপরে একটি চাপা প্লেট গঠন করে। ধাপের শুরুতে গুটি শুধু চাপা হয়। এরপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ট্রফোব্লাস্ট কোষগুলো তখনও কিছুক্ষণের জন্য ব্লাস্টোডার্মের উপরে থেকে যায়। তখন এদের রবার-এর কোষ (cells of Rauber) বলে। তাড়াতাড়ি এসব কোষের বিলুপ্তি ঘটে।

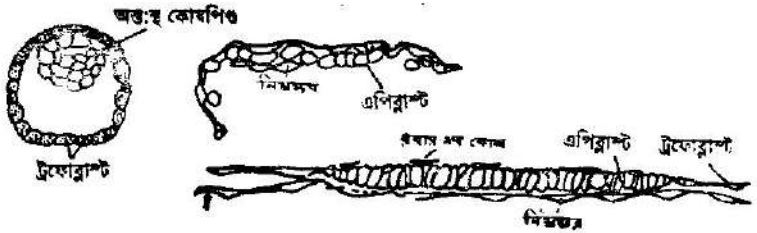

চিত্র ৬৩ : খরগোসে অ্যামনিওন সৃষ্টি (McEwen, ১৯৬৯ থেকে)।

উপরে উল্লিখিত ধাপের সময় কিংবা এর পরপরই এপিব্লাস্ট এবং হাইপোব্লাস্ট স্তরের মাঝখানে মেসোডার্মের আবির্ভাব ঘটে। তাই, প্রথম স্তর দুটিকে যথাক্রমে এক্টোডার্ম ও এণ্ডোডার্ম হিসেবে গণ্য করা যায়। মেসোডার্মের মধ্যে স্বাভাবিক সিলোমীয় ফাটল আবির্ভূত হয়ে ওকে সোমাটিক ও স্প্ল্যাংকনিক স্তরে ভাগ করে দেয়। চাপা ভ্রূণীয় গুটির উঁচু বেড় ধরে তখন এক্টোডার্ম ও সোমাটিক মেসোডার্মের ভাঁজ দিয়ে অ্যামনিওন নির্মিত হয় এবং সেরো-অ্যামনিওটিক সংযোগে মিলনের মধ্য দিয়ে এ নির্মাণ কাজের সমাপ্তি ঘটে। অন্যদিকে বাইরের সোমাটিক মেসোডার্ম বা বহিঃস্থ এক্টোডার্ম ও অন্তঃস্থ মেসোডার্ম স্তরে গঠিত তা কোরিওন গঠন করে। এ দুই ঝিল্লীর মধ্যবর্তী ফাঁকা গহ্বরকে বহিঃভ্রূণীয় সিলোম বা এক্সোসিলোম (exocaelom) বলে। কোরিওনের ট্রফোব্লাস্ট থেকে ভিলাই বের হয়ে জরায়ু-প্রাচীরে প্রোথিত হয়।

অ্যালানটয়েস সৃষ্টি

খরগোসের অ্যালানটয়েস এণ্ডোডার্ম ও স্প্ল্যাংকনিক মেসোডার্মে গঠিত। ঝিল্লীটি প্রথমে ভ্রূণের পশ্চাৎ অন্ত্র থেকে একটি ছোট থলির মত উঠে বহিঃভ্রূণীয় সিলোমে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং তাড়াতাড়ি ভ্রূণের উপরে অ্যামনিওনের বহির্দেশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরে অ্যালানটয়িক প্রাচীরের মেসোডার্মীয় অংশ রক্ত বাহিকা তন্ত্র গঠন করে এবং কোরিওনের মেসোডার্মের সাথে একীভূত হয়ে অ্যালানটো-কোরিওন (allanto-chorion) সৃষ্টি করে যা বহিঃস্থ ট্রফোব্লাস্ট, মাঝের মেসোডার্ম ও ভিতরের এণ্ডোডার্মে গঠিত।

প্রিমিটিভ স্ট্রিকের পরিস্ফুটন

অ্যামনিওন সৃষ্টির সময় ভ্রূণীয় গুটি থেকে এপিব্লাস্টের একটি চাপা প্লেট আবির্ভূত হয়। একে ভ্রূণীয় চাকতি (embryonic disc) বলে। এপিব্লাস্টের এ অঞ্চল এবং

এর ঠিক নিচে অবস্থিত হাইপোব্লাস্ট একসাথে পরিস্ফুটিতব্য ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। পর্যবেক্ষণ কষ্টসাধ্য হওয়ায় সাধারণত শূকর-ভ্রূণের মাউন্ট করা নমুনা থেকে স্তন্য-পায়ীর প্রিমিটিভ স্ট্রিক ও সংশ্লিষ্ট গঠনাদি সম্বন্ধে ধারণা নেওয়া হয়ে থাকে।

ভ্রূণীয় ঢালতির মাঝরেখা বরাবর প্রিমিটিভ স্ট্রিক উত্থিত হয়। প্রথমে তা এপিব্লাস্টের স্থূল অর্ধচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হলেও পরে ডিম্বাকার এবং আরও পরে ধীরে ধীরে লম্বাটে আকার ধারণ করে। স্ট্রিকের মাঝ বরাবর প্রিমিটিভ খাদ আর সম্মুখপ্রান্তে স্থূল বিন্দুর মত হেনসেন-এর পর্ব সৃষ্টি হয়। স্ট্রিকের কোষগুলো নিচের দিকে ও পাশে এপিব্লাস্ট ও হাইপোব্লাস্টের মাঝখানে পরিযায়ী হয়। কিছু পরি-যায়ী কোষ হাইপোব্লাস্টের সাথে যোগ দিয়ে এণ্ডোডার্ম গঠনে সাহায্য করে এবং শিথিল কোষগুলি পাশে পরিযায়ী হয়ে মেসোডার্মের স্তর গঠন করে। হেনসেন-এর পর্ব থেকে কিছু কোষ সামনে অগ্রসর হয়ে দণ্ডাকার হেড প্রসেস নির্মাণ করে। পরে এই প্রসেস নটোকর্ড গঠন করে। প্রিমিটিভ স্ট্রিকের সামনের প্রান্তে মেসো-ডার্ম এণ্ডোডার্মের সাথে মিলে যায়।

ভ্রূণের প্রধান অঙ্গগুলো এবং বেষ্টনকারী পর্দাগুলো সৃষ্টি হওয়ার পর ভ্রূণটিকে বলে ফিটাস (foetus), আর পর্দাগুলোকে বলে ফিটাল পর্দা বা ঝিল্লী (foetal membrane)।

নবম অধ্যায়

অমরা

মায়ের দেহ থেকে ভ্রূণে পুষ্টি সরবরাহের জন্য সম্মিলিতভাবে মাতৃকলা ও ভ্রূণকলায় গঠিত যে কোন অঙ্গকে অমরা (placenta) বলে (Balinsky, ১৯৮১)। প্ল্যাসেন্টা গ্রীক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে 'চাপা কেক' (flat cake)। মানুষের অমরা যেহেতু চাপা ও দেখতে চাকতির মত সে কারণে গঠনটির এ নামকরণ করা হয়েছে।

অমরা শুধু স্তন্যপায়ীতেই নয়, বরং প্রাণিজগতের অন্যান্য গোষ্ঠীতেও পাওয়া যায়, যেমন— ***Peripatus*** (Onychophora), ***Salpa*** (Urochordata), ***Mustelus laevis*** (Chondrichtyes : Elasmobranchii) ও কয়েক ধরনের গিরগিটিতে। কিন্তু তাই বলে সব ক্ষেত্রেই অমরা গঠনকারী কলার প্রকৃতি এক রকম নয়। প্রকৃত অমরা শুধু স্তন্যপায়ীতেই পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রাণীতে ভ্রূণ ও মাতৃকলার মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তা বাহ্যিক ধরনের, সেখানে শুধু কুসুম থলি অমরার (yolk-sac placenta) মত একটি পরিবেশ বিরাজ করে।

অমরার বিবর্তন

পরিস্ফুটনের একেবারে গোড়ার দিকে স্তন্যপায়ী বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লীগুলো সরীসৃপ ও পাখির সাথে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য প্রদর্শন করে। অমরাবাহী স্তন্যপায়ী ভ্রূণে যে কুসুম থলি থাকে তার স্প্ল্যাংকনিক মেসোডার্মে আছে এক সুগঠিত রক্তজালক; এতে আছে অ্যালানটয়েস, একটি বড় অ্যামনিওন ও বিরাট একটি কোরিওন। আমরা দেখেছি মুরগির ভ্রূণে এ বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লীগুলো বড় টেলোলেসিথাল ডিম্বাণুতে পরিস্ফুটনের সময় অস্বাভাবিক অবস্থায় সাড়া দিয়ে কি চমৎকার কাজ করে। বিবর্তনের গতিপথে সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী উদ্ভবের এক পর্যায়ে অমরাবাহী স্তন্যপায়ীরা যখন প্রায় কুসুমহীন ডিম্বাণু উৎপাদনে ব্রতী হয় তখন ভ্রূণের পরিস্ফুটনের জন্য স্বাভাবিকভাবেই ঐসব ঝিল্লীর কার্যকারিতার গুরুত্ব কমে যাওয়ারই কথা ছিল।

কার্যক্ষেত্রে তা ঘটেনি বরং স্তন্যপায়ী ভ্রূণেই যেন ঝিল্লীগুলো প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে। এখানে ওরা গাঠনিকভাবেই শুধু না, কাজের দিক

থেকেও ব্যাপক পরিবর্তন এনে অন্তঃজরায়ুজ পরিস্ফুটনে ভ্রূণের বিপাকীয় কাজ এগিয়ে নিতে অভিযোজিত হয়েছে। এ বিশেষ অভিযোজনে কোরিওন ও অ্যালানটয়েস বিভিন্ন স্তন্যপায়ী বর্গে কম-বেশি মিলিত হয়ে জরায়ু প্রাচীরকে সাথে নিয়ে অমরা নামক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রূণীয় অঙ্গ নির্মাণ করে। এখানে প্রকৃত অমরাবাহীদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু স্তন্যপায়ী শ্রেণীতে ওরা ছাড়াও আছে মনোট্রিম এবং মারসুপিয়াল গোষ্ঠী। মনোট্রিমে কোন অমরা নেই; মারসুপিয়ালে অমরার তিনটি বিবর্তনিক ধাপ খুঁজে পাওয়া যায়, আর যাদের আমরা প্রকৃত অমরাবাহী বলি তাদের মধ্যে মারসুপিয়ালে অমরার যে সর্বশেষ ধাপটি আছে তারই বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই।

অমরার অনুপস্থিতি

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে একমাত্র মনোট্রিমেই অমরার পরিস্ফুটন ঘটে না। শুধু শারীরস্থানই না এদের ভ্রূণগত অধ্যায়ও সরীসৃপের ঘনিষ্ট সম্পর্কিত। এরাই একমাত্র স্তন্যপায়ী যারা পাখির মত খোলকী ডিম পাড়ে। স্ত্রীপ্রাণী এসবে তা' দেওয়ার পর সরীসৃপ ও পাখির মতই শাবক বেরিয়ে আসে। পরিস্ফুটনের সময় এদেরও কুসুমে পূর্ণ সুগঠিত কুসুম-থলি ও সুস্পষ্ট অ্যামনিওস সৃষ্টি হয় এবং এগুলোর পরিস্ফুটনও বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লীর মতই। এক কথায়, মনোট্রিমে অমরা একেবারেই অনুপস্থিত, এমনকি এদের ভ্রূণতন্ত্র অমরাবাহী স্তন্যপায়ীর দিকে কোন অগ্রগতিই আভাসে বা ইঙ্গিতেও দেখতে পারে না। তাই অমরাসংক্রান্ত আলোচনা মারসুপিয়াল থেকেই শুরু হওয়া উচিৎ।

মারসুপিয়াল হচ্ছে এমন এক স্তন্যপায়ী গোষ্ঠী যাদের সন্তান বেশ অনুন্নত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এক বিশেষ থলিতে পৌঁছে স্তনবৃন্তে আটকে থাকে এবং এভাবে কিছুদিন অবস্থান করে। এ ঘটনাই প্রমাণ করে যে ওরা জন্মের পূর্ব পর্যন্ত পুষ্টি সরবরাহ ও গ্যাসীয় বিনিময়ের এক আদিম পর্যায় অতিবাহিত করে আসে। এ গোষ্ঠীতে অমরার বিবর্তনের এক চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়। মনোট্রিম অবস্থা থেকে প্রকৃত অমরাবাহীতে উত্তরণের ক্রমিক ধাপের চিত্র এতে ফুটে উঠেছে।

আদি অমরা

প্রাচীনতম অমরা পাওয়া যায় অপোসামে (Opossum, ***Didelphys virginiana***)। কুসুম না থাকলেও এতে অন্যান্য মারসুপিয়ালের মত একটি রক্তজালকসমৃদ্ধ

বড় কুসুম থলি আছে। মুরগির ভ্রূণে ৭-৮ দিনে যেরকম কুসুম-থলির সৃষ্টি হয় এর কুসুম থলিও তেমনি। শুধু তাই না, থলিটি এতই বড় যে তা কোরিওনের সাথে লেগেই যায়। কোরিওন তখন বহির্তলে ভাঁজ সৃষ্টি করে জরায়ু—প্রাচীরের সংস্পর্শে আসে। মারসুপিয়ামে বেঁচে থাকার মত সামর্থ্য অর্জনের আগেই যেন ভ্রূণ বেরিয়ে যেতে না পারে তার জন্য এ ভাঁজগুলো ব্লাস্টোসিস্টকে জরায়ু—প্রাচীরের সাথে আটকে রাখে। জরায়ু-প্রাচীরের গ্রন্থি থেকে যে চটচটে পুষ্টিকর তরল নিঃসৃত হয় তা ব্লাস্টোসিস্ট শোষণ করে ভিটেলাইন সংবহনে পাঠিয়ে দেয়। এ সংবহনের মাধ্যমে ভ্রূণ পুষ্টি লাভ করে। ভ্রূণীয় ট্রফোব্লাস্ট ও জরায়ু কলার এ সংযোগকে প্রাচীনতম অমরা বলা যায়। অন্যান্য মারসুপিয়ালের মত এদের অ্যালানটয়েসও খুব ছোট এবং তা ট্রফোব্লাস্টের সাথে যুক্ত থাকে না।

কুসুম-থলি অমরা

মারসুপিয়ালের একটি ছোট গোষ্ঠীতে এমন এক অমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়া দেখা যায় যাকে প্রকৃত অমরা সৃষ্টির দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। মারসুপিয়াল বিড়াল (Marsupial cat, ***Dasyurus***) এ গোষ্ঠীরই প্রতিনিধি। স্বাভাবিক নিয়মেই এর ব্লাস্টোসিস্ট সৃষ্টি হয় এবং একটি বড় কুসুম থলি ও ছোট অ্যালানটয়েস গঠিত হয়। পরিস্ফুটনের এ পর্যায় পর্যন্ত অপোসামের মতই। পরে অতিরিক্ত কোষ সৃষ্টি করে কোরিওন স্থূল হয় এবং সিনসিসীয় (অর্থাৎ ট্রফোডার্মাল) শাখা নির্মাণ করে। ব্লাস্টোডার্মিক থলিকা তখন জরায়ু-প্রাচীরে নিমজ্জিত হয়। থলিকার সাথে জরায়ু-প্রাচীরের যে অংশটি যুক্ত থাকে তার কোষগুলোকে ধ্বংস করে ঐ অংশেই নিমজ্জিত হয়। এভাবে ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ু প্রাচীরের বহির্তলে শুধু ভাঁজ সৃষ্টি করে লেগে থাকে না বরং এখন একটি অগভীর গর্তে ডুবে থাকে। কুসুম-থলিটি যা এখানেও কোরিওনের সাথে লেগে আছে তা সাইনাস টারমিনালিসসহ জরায়ু-প্রাচীরের গর্তের দিকে মুখ করা থাকে। ঐ অংশে কোরিওন আরও কিছু ভাঁজ সৃষ্টি করে সংস্থাপনকে জোরদার করে। তবে এমনও হতে পারে যে, এ ভাঁজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে এণ্ডোমেট্রিয়াম থেকে নিঃসৃত পুষ্টিকর তরল শোষণে কোরিওন-তলের ক্ষেত্রবৃদ্ধির এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। ব্লাস্টোসিস্ট এই তরল শোষণ করে। খাদ্য গ্রহণের এ আদি প্রক্রিয়া ছাড়াও কোরিওন বিনষ্ট গর্তে মাতৃরক্তের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসে। এ উৎস থেকে কিছু পরিমাণ খাদ্য ও অক্সিজেন হয়তো শোষিত হয় এবং কুসুম সংবহনের মাধ্যমে ভ্রূণে বাহিত হয়। বর্ণিত সংযোগের ধরন এতই নিবিড় যে, যে অংশে তা ঘটে থাকে তাকে কুসুম-থলি অমরা বলা যায়।

আদি অ্যালানটয়িক অমরা

অধিকাংশ মারসুপিয়ালে আদি অ্যালানটয়িক অমরা পাওয়া যায়। এ অমরা থেকেই উন্নত প্রাণীদের জটিল অমরার উৎপত্তি হয়েছে। ব্যাণ্ডিকুট (*Perameles*), ওয়ালাবি (*Halmaturus*) সরল অ্যালানটয়িক অমরাবাহী মারসুপিয়ালের দুটি উদাহরণ।

একটি আদর্শ ব্লাস্টোসিস্ট সৃষ্টির পর কুসুম-থলিটি রক্তজালক সমৃদ্ধ হয়ে বিরাটাকার ধারণ করে। অ্যালানটয়েসও বড় হয় এবং কোরিওনের সংস্পর্শে আসে। কোরিওনটি যে অংশে অ্যালানটয়েসের সাথে লেগে থাকে সে পাশ দিয়েই আবার জরায়ু-প্রাচীরের সাথেও যুক্ত থাকে। জরায়ু-প্রাচীরের এ অংশে তখন রক্তজালক-সমৃদ্ধ সিনসিসিয়াম গঠিত হয় এবং ব্লাস্টোসিস্ট তার কোরিওন হারিয়ে ফেলে। এ সুযোগে অ্যালানটয়িক রক্তবাহিকাগুলো মায়ের রক্তের নিবিড় সংস্পর্শে আসে। এভাবে একটি প্রকৃত অ্যালানটয়িক অমরা সৃষ্টির ভিত্তি রচিত হয়েছে।

অ্যালানটয়িক অমরা

স্তন্যপায়ীর বিভিন্ন বর্গে অ্যালান্টয়িক অমরার গঠনও বৈচিত্র্যময়। তবে এদের প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায় অপাতী ও পাতী। এ দুটির মধ্যে আবার অপাতী অমরা (nondeciduous placenta) প্রাচীনতর। এতে এমন একটি কোরিওন থাকে যা ভাঁজ সৃষ্টি করে কতকগুলো ভিলাই তৈরি করে। ভিলাই জরায়ু-প্রাচীরে শিথিল বন্ধন রচনা করে গেঁথে থাকে। এতে জন্মের সময় মায়ের কোন জরায়ু-কলার ক্ষতি হয় না বরং আমরা হাতমোজার ভিতর থেকে যেমন করে আঙুলগুলো বের করে আনি ঠিক তেমনি ভিলাইও জরায়ু-প্রাচীর থেকে বেরিয়ে আসে। গরু, ঘোড়া, ভেড়া, শূকর, হরিণ, জিরাফ প্রভৃতি প্রাণীতে অপাতী অ্যালানটয়িক অমরা পাওয়া যায়।

পাতী অমরায় কোরিওন ও এণ্ডোমেট্রিয়ামের মধ্যে নিবিড় বন্ধনের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কোরিওনের ভিলাই শাখান্বিত এবং জরায়ু-প্রাচীরে এমন-ভাবে গেঁথে থাকে যার ফলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মাতৃজরায়ুর কিছু অংশও ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। পাতী অমরা মানুষ ও অন্যান্য প্রাইমেট, ইনসেক্টিভোর, বাদুর, চিকা, ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি স্তন্যপায়ীতে পাওয়া যায়।

অমরার প্রকারভেদ

উৎপত্তি, আকার-আকৃতি ও গঠন প্রকৃতি অনুসারে স্তন্যপায়ী অমরাকে নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। নিচে অমরার প্রকারভেদের একটি রূপরেখা দেওয়া হল।

ভিত্তি	প্রকার	অমরার নাম
ভ্রূণকলার সংযোগ স্থাপন প্রকৃতি	দুই	১) কোরিও-ভিটেলাইন বা কুসুম থলি অমরা ২) কোরিও-অ্যালানটয়িক বা অ্যালানটয়িক অমরা
ভিলাইয়ের বিস্তারণ	চার	১) পরিব্যাপ্ত অমরা ২) বীজপত্রিক অমরা ৩) বলয়িত অমরা ৪) চক্রাকার অমরা
জরায়ু-প্রাচীরের সাথে ভিলাইয়ের সম্পর্ক	দুই	১) অপাতী অমরা ২) পাতী অমরা
কোরিওন ও জরায়ুর সংযোগস্থাপন	পাঁচ	১) এপিথেলিও-কোরিয়াল অমরা ২) সিনডেসমো-কোরিয়াল অমরা ৩) এণ্ডোথেলিও-কোরিয়াল অমরা ৪) হিমো-কোরিয়াল অমরা ৫) হিমো-এণ্ডোথেলিয়াল অমরা

(ক) কোরিওন, অ্যালানটয়েস, কুসুম থলি ও জরায়ু প্রাচীরের মধ্যে ভ্রূণকলার সংযোগ স্থাপন প্রকৃতি অনুযায়ী স্তন্যপায়ীর সব অমরাকে নিম্নোক্ত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়:

১) কোরিও-ভিটেলাইন বা কুসুম থলি অমরা (Chorio-vitelline or yolk-Sac placenta) এবং

২) কোরিও-অ্যালানটয়িক বা অ্যালানটয়িক অমরা (Chorio-allantoic or Allantoic placenta)

১) কোরিও—ভিটেলাইন বা কুসুম-থলি অমরা: এ ধরনের অমরা সাধারণত মাতৃজরায়ু-প্রাচীরের সাথে ভ্রূণের কুসুম-থলি সংলগ্ন রক্তজালিকা সমৃদ্ধ কোরিওন এলাকার সংযুক্তির ফলে সৃষ্টি হয়। Didelphys, Macropus ও আরও অন্যান্য মারসুপিয়াল স্তন্যপায়ীতে এ ধরনের অমরা দেখা যায়। এসব প্রাণীর কুসুম-থলি বেশ বড় এবং অমরা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে একে কুসুম-থলি অমরাও বলে।

২) কোরিও-অ্যালানটয়িক বা অ্যালানটয়িক অমরা : এ ধরনের অমরা জরায়ু-প্রাচীরের সাথে ভ্রূণের অ্যালনটয়েস সংলগ্ন কোরিওনের সংযুক্তির ফলে সৃষ্টি হয়। কয়েক ধরনের মারসুপিয়াল (*Premales, Halmaturus* প্রভৃতি) এবং সব ইউথেরীয় স্তন্যপায়ীতে এ অমরা পাওয়া যায়। অনেক সময় এ অমরাকে প্রকৃত অমরা (true placenta) এবং যেহেতু অ্যালানটয়েসের ভূমিকা এইক্ষেত্রে প্রধান তাই একে অ্যালানটয়িক অমরা বলা হয়ে থাকে।

(খ) ভিলাইয়ের বিস্তারণ বা সজ্জাবিন্যাসের ভিত্তিতে অমরা নিম্নোক্ত চার ধরনের :

১) পরিব্যাপ্ত অমরা (Diffused placenta),
২) বীজপত্রিক অমরা (Cotyledonary placenta),
৩) বলয়িত অমরা (Zonary placenta) এবং,
৪) চক্রাকার অমরা (Discoidal placenta)।

১) পরিব্যাপ্ত অমরা (চিত্র ৬৪ক) : ভিলাই যখন কোরিওনের গায়ে সবখানে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে, তখন তাকে পরিব্যাপ্ত অমরা বলে। উদাহরণ- ঘোড়া ও শূকর।

২) বীজপত্রিক অমরা (চিত্র ৬৪খ) : ভিলাই যখন গুচ্ছবদ্ধ হয়ে কোরিওনের বিশেষ বিশেষ অংশে সীমিত থাকে এবং কোরিওনের বাকী অংশ থাকে মসৃণ, তখন তাকে বীজপত্রিক অমরা বলে। ভিলাইয়ের গুচ্ছগুলোকে বীজপত্র (Cotyledons) বলে। উদাহরণ—গরু, ভেড়া ও হরিণ।

৩) বলয়িত অমরা (চিত্র ৬৪গ): ভিলাই যখন ডিম্বাকার ব্লাস্টোসিস্টের মাঝখানে আড়াআড়িভাবে বেল্টের মত বিন্যস্ত থাকে, তখন তাকে বলয়িত অমরা বলে। উদাহরণ—মাংসাশী প্রাণী, যেমন-কুকুর, বিড়াল ও সিংহ।

৪) চক্রাকার অমরা (চিত্র ৬৪ঘ): ভিলাইয়ের বিস্তৃতি যখন একটি বা দুটি চাকতির মত স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তাকে চক্রাকার অমরা বলে। উদাহরণ—মানুষ, হনুমান, বানর, ইঁদুর ও খরগোস।

বানরের অমরা এরূপ দুটি চাকতি বহন করে বলে তাকে দ্বিচক্রীয় অমরা (bidiscoidal placenta)-ও বলা হয়।

(গ) ভিলাইযুক্ত কোরিওন ও মাতৃজরায়ু-প্রাচীরের মধ্যে অমরা গঠনের সময় যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং প্রসবের সময় অমরার যে পরিণতি ঘটে তার ভিত্তিতে অমরা নিম্নোক্ত দুই ধরনের হয় —

১) অপাতী অমরা (nondeciduous placenta) এবং
২) পাতী অমরা (deciduous placenta)।

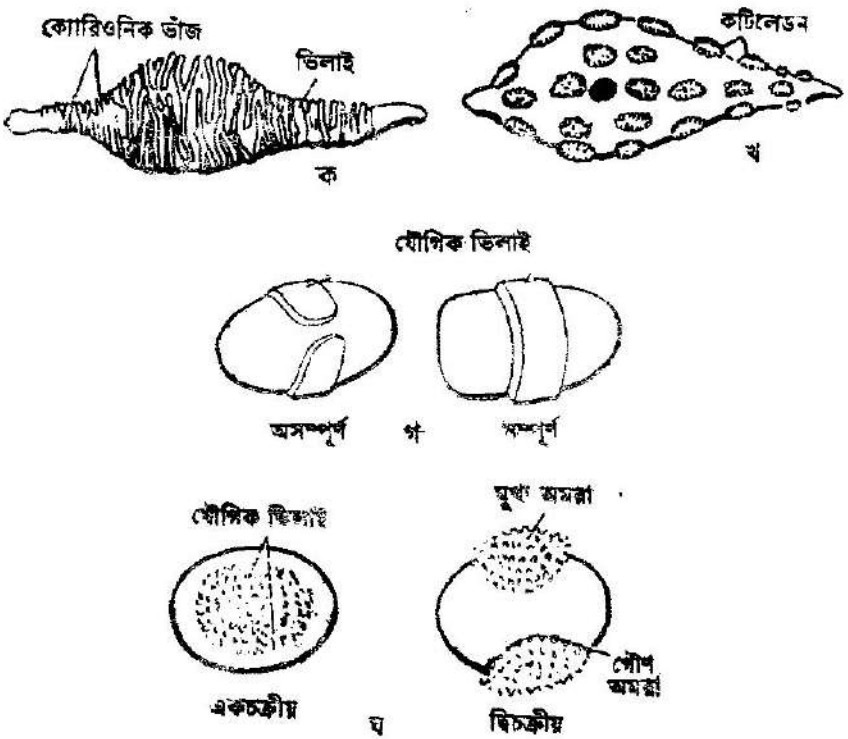

চিত্র ৬৪ : ভিলাইয়ের বিস্তারণের ভিত্তিতে অমরার প্রকারভেদ (ক) পরিব্যাপ্ত, (খ) বীজ-পত্রিক, (গ) বলয়িত, (ঘ) চক্রাকার (Saxena, ১৯৮০ অবলম্বনে)

১) অপাতী অমরা ঃ যেসব অমরায় কোরিওন তার সরল, অশাখ ভিলাই জরায়ু প্রাচীরে সৃষ্ট ছোট ছোট গর্তে ঢুকিয়ে রেখে শিথিল বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং প্রসবের সময় এসব ভিলাই এত সহজে ও সম্পূর্ণভাবে মাতৃকলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যাতে জরায়ু-প্রাচীরের কোন ক্ষতি হয় না এবং রক্তপাতও হয় না, সেসব অমরাকে অপাতী অমরা বলে। উদাহরণ – গরু, ঘোড়া, শূকর প্রভৃতি প্রাণী।

২) পাতী অমরা ঃ যেসব অমরায় কোরিওন তার শাখান্বিত ভিলাই জরায়ু-প্রাচীরের গভীরে প্রবেশ করিয়ে এক নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে এবং প্রসবের সময় যখন অমরা প্রত্যাহৃত ও অপসারিত হয়ে তখন জরায়ু-প্রাচীরের অংশ বিশেষ ছিন্ন হয়ে রক্তপাত ঘটায়, সেসব অমরাকে পাতী অমরা বলে। উদাহরণ— মানুষ, বানর, ইঁদুর, খরগোসসহ অধিকাংশ স্তন্যপায়ী।

(ঘ) কোরিওন ও জরায়ু প্রাচীরের সাথে স্থাপিত সংযোগের ব্যাপকতার ভিত্তিতে এবং ভ্রূণ ও মাতৃকলার উপস্থিতি, অবস্থান ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অমরাকে নিম্নোক্ত পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়:

১) এপিথেলিও কোরিয়াল অমরা (Epithelio-chorial placenta),
২) সিনডেসমো-কোরিয়াল অমরা (Syndesmo-chorial placenta),
৩) এণ্ডোথেলিও-কোরিয়াল অমরা (Endothelio-chorial placenta),
৪) হিমো-কোরিয়াল অমরা (Hemo-chorial placenta) এবং
৫) হিমো-এণ্ডোথেলিয়াল অমরা (Hemo-endothelial placenta)।

১) এপিথেলিও-কোরিয়াল অমরা (চিত্র ৬৫ক) : যেসব অমরায় তার গাঠনিক যাবতীয় কোষ-কলাস্তর উপস্থিত থাকে এবং কোরিওনিক এপিথেলিয়াম ও জরায়ুর এপিথেলিয়াম পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, কিন্তু তাদের আদিস্তর অক্ষুণ্ন থাকে অর্থাৎ ভ্রূণীয় বা মাতৃকলার কোনটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সেসব অমরাকে এপিথেলিও-কোরিয়াল অমরা বলে। উদাহরণ—সব মারসুপিয়াল এবং জেব্রা, ঘোড়া, শূকর প্রভৃতি প্রাণী।

২) সিনডেসমো-কোরিয়াল অমরা (চিত্র ৬৫খ) : যেসব অমরায় কোরিওনের ভিলাই গভীর ও নিবিড়ভাবে জরায়ু প্রাচীরে প্রবেশ করে এবং অনেক সময় জরায়ুর এপিথেলিয়াম স্থান বিশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ফলে কোরিওনিক এপিথেলিয়াম জরায়ু প্রাচীরের রক্তজালিকাসমৃদ্ধ যোজক কলার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পায়, সেসব অমরাকে সিনডেসমো-কোরিয়াল অমরা বলে। উদাহরণ—গরু, মহিষ, হরিণ, ভেড়া, জেব্রা প্রভৃতি প্রাণী।

৩) এণ্ডোথেলিও-কোরিয়াল অমরা (চিত্র ৬৫গ) : যেসব অমরায় শুধু জরায়ু-প্রাচীরই না, বরং জরায়ুর যোজক কলা পর্যন্ত এমনভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় যার ফলে ভ্রূণীয় কলা মাতৃরক্তবাহিক এণ্ডোথেলিয়াম প্রাচীরের সংস্পর্শে চলে আসে, সেসব অমরাকে এণ্ডোথেলিও-কোরিয়াল অমরা বলে। উদাহরণ—সিংহ, বাঘ, কুকুর ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণী।

৪) হিমো-কোরিয়াল অমরা (চিত্র ৬৪ঘ) : যেসব অমরায় শুধু জরায়ু-প্রাচীরের এপিথেলিয়াম ও সংলগ্ন যোজক কলারই ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে না, মাতৃরক্ত বাহিকার এণ্ডোথেলিয়ামও বিনষ্ট হয়, ফলে কোরিওনের এপিথেলিয়াম মায়ের রক্তে প্লাবিত হয়, সেসব অমরাকে হিমো-কোরিয়াল অমরা বলে। উদাহরণ—মানুষ, গরিলা, বানর, বাদুর প্রভৃতি প্রাণী।

৫) হিমো-এণ্ডোথেলিয়াল অমরা (চিত্র ৬৫ ঙ) : এসব অমরায় জরায়ুর এপিথেলিয়াম, যোজক কলা, মাতৃরক্তবাহিকার এণ্ডোথেলিয়াম ও ট্রফোব্লাস্টিক এপিথেলিয়াম বিনষ্ট হয়ে যায়, ফলে ভ্রূণের রক্তবাহিকাগুলির এণ্ডোথেলিয়াম সরাসরি মায়ের রক্তের সংস্পর্শে আসে। উদাহরণ- ইঁদুর, গিনিপিগ, খরগোস প্রভৃতি প্রাণী।

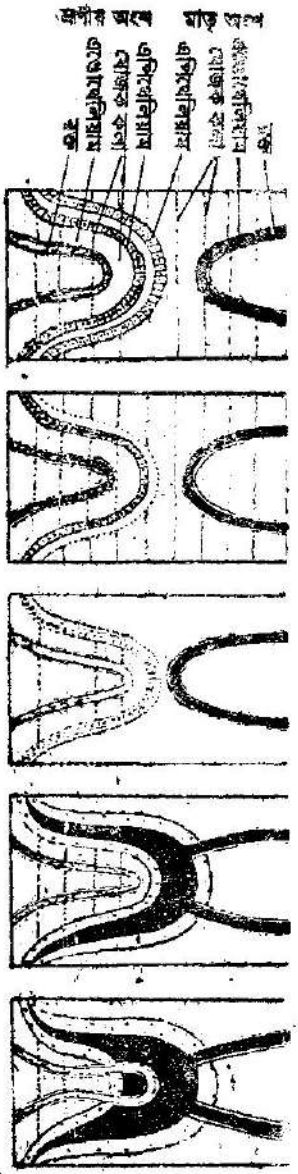

অমরার শারীরবৃত্ত

স্তন্যপায়ীর ডিম্ব কুসুমহীন হওয়ায় জরায়ুতে অবস্থিত ভ্রূণের পুষ্টি সংবহন সম্পূর্ণরূপে মায়ের দেহ থেকে অমরার মাধ্যমে ঘটে থাকে। তাই ভ্রূণীয় ও মাতৃকলার মধ্যে এক ঘনিষ্ট সংযোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাই বলে দুজনের কলা মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায় না, এমনকি স্বাভাবিক অবস্থায় এক জনের রক্ত অন্যের সাথে মিশে যায় না, বরং অমরাজনিত বাধার (placental barrier) কারণে পৃথক থাকে। ভ্রূণীয় ও মাতৃঅংশীয় অমরার রক্তেপূর্ণ গহ্বরের মাঝখানে অবস্থিত কলাস্তরে এ প্রতিবন্ধক নির্মিত যা পাতলা ও সরু হলেও (হিমো-কোরিয়াল অমরা) ভঙ্গুর নয়। শারীরবৃত্তীয়ভাবে এ প্রতিবন্ধক একটি অর্ধভেদ্য পর্দার মত কাজ করে, এতে কিছু নির্দিষ্ট পদার্থের যাতায়াতই শুধু অব্যাহত থাকে।

চিত্র ৬৫ : বিভিন্ন অমরার চিত্ররূপ, (ক) এপিথেলিও কোরিয়াল, (গ) এণ্ডোথেলিও কোরিয়াল, (ঘ) হিমো-কোরিয়াল এবং (ঙ) হিমো-এণ্ডোথেলিয়াল (Freeman and Bracegirdle, ১৯৭৮ অনুসরণে)

ছোট অণুর পদার্থ প্রতিবন্ধকের ভিতর দিয়ে সরল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অতিক্রম করে, যেমন—মায়ের দেহ থেকে ভ্রূণের রক্তে পানি ও অক্সিজেনের প্রবেশ, এবং ভ্রূণ থেকে মায়ের রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ইউরিয়ার প্রবেশ। এভাবে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও মনোস্যাকারাইড অতিক্রম করতে পারে। তবে অপেক্ষাকৃত জটিল পদার্থগুলো সক্রিয় পরিবহন (active transport)-এর মাধ্যমে প্রবেশ করে। কয়েকটি অত্যন্ত জটিল পদার্থ, বিশেষ করে প্রোটিনের যাতায়াত ট্রফোব্লাস্ট-প্রাচীরের ভিতর দিয়ে পিনোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। অতি জটিল প্রোটিন প্রতিবন্ধক ভেদ করতে সক্ষম বলে জানা গেছে। এভাবে মায়ের রক্তে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি ভ্রূণের দেহে প্রবেশ করে। গরুর এপিথেলিও-কোরিয়াল অমরায় শক্ত প্রতিবন্ধক থাকায় অ্যান্টিবডি মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণদেহে প্রবেশ করতে পারে না, তাই নবজাত প্রাণী তা কলোস্ট্রাম (colostrum) বা শালদুধের মাধ্যমে গ্রহণ করে।

কিছু রোগউৎপাদক জীবাণু, ভাইরাস ও ড্রাগ অমরার প্রতিবন্ধক ভেদ করে ভ্রূণদেহে প্রবেশ করতে দেখা যায়। এর ফলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হতে পারে বা অঙ্গহানি ঘটতে পারে। অনেক সময় ভ্রূণ ও মাতৃদেহের কৈশিক জালিকার ভাঙনের ফলে পরস্পরের রক্ত সংবহনে পারস্পরিক রক্তকণিকাকেও ভাসমান দেখতে পাওয়া যায়। কখনওবা ভ্রূণের কোরিওনিক ভিলাই থেকে ট্রফোব্লাস্ট বিচ্ছিন্ন হয়ে মাতৃদেহের রক্তস্রোতে বাহিত হয়ে ফুসফুস প্রভৃতি অঙ্গের কৈশিক জালিকায় আশ্রয় নেয়। অন্যদিকে মাতৃদেহের কিছু কোষ (সম্ভবত শ্বেত কণিকা) ভ্রূণে রক্তবাহিত হয়ে প্লীহা, থাইমাস, লসিকা পর্ব ও অস্থিমজ্জায় জমা হতে দেখা যায়।

অমরার কাজ

অমরার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো নিচে উল্লেখ করা হল।

১) সংস্থাপন : অমরার সাহায্যে ভ্রূণ জরায়ু—প্রাচীরে সংস্থাপিত হয় ও সুরক্ষিত থাকে।

২) পুষ্টি : অমরা মায়ের রক্তস্রোত থেকে ভ্রূণের দেহে পুষ্টিদ্রব্য (মনোস্যাকারাইড, ডাইস্যাকারাইড, প্রোটিন ও ছোট ছোট লিপিড অণু) সরবরাহ করে।

৩) শ্বসন : অমরা মাতৃদেহ ও ভ্রূণের মধ্যে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটিয়ে শ্বসনে সাহায্য করে। ভ্রূণের দেহে অক্সিজেন ঘনীভবন কম হওয়ায় ব্যাপন প্রক্রিয়ায়

তা মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণে প্রবেশ করে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের ক্ষেত্রে তার বিপরীত ঘটে।

৪) রেচন ঃ ভ্রূণের বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত নাইট্রোজেনময় বর্জ্য পদার্থ অমরার মধ্য দিয়ে ব্যাপিত হয়ে মায়ের দেহে প্রবেশ করে।

৫) অনাক্রম্যতা ঃ মাতৃদেহের রক্তে কয়েকটি রোগের বিরুদ্ধে, যেমন—ডিপথেরিয়া, হাম, বসন্ত, স্কারলেট জ্বর প্রভৃতি, উৎপন্ন অ্যান্টিবডি মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণের দেহে প্রবেশ করে ঐসব রোগের বিরুদ্ধে ভ্রূণকে অনাক্রম্য করে তোলে।

৬) জীবাণু বহন ঃ কয়েক ধরনের জীবাণু ও ভাইরাসকে অমরা মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণে প্রবেশ করতে দিয়ে ভ্রূণের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। গর্ভকালীন সময়ে মা যদি সিফিলিস, হাম, জলবসন্ত, গুটিবসন্ত, রুবেলা এসব রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাহলে ঐ ভাইরাস ভ্রূণদেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি বা অঙ্গহানি ঘটাতে পারে।

৭) ওষুধ বহন ঃ চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ওষুধ মাতৃদেহ থেকে অমরার মাধ্যমে ব্যাপিত হয়ে ভ্রূণে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

৮) সঞ্চয় : অমরায় স্নেহ, গ্লাইকোজেন ও লোহা সঞ্চিত থাকে।

৯) হরমোন নিঃসরণ ঃ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মত অমরা চার ধরনের **হরমোন** নিঃসরণ করে—দুটি হচ্ছে প্রোটিন হরমোন—লুটিওট্রপিন ও ল্যাকটোজেন এবং অন্য দুটি স্টেরয়েড-প্রোজেস্টেরন ও এস্ট্রোজেন। লুটিওট্রপিন হরমোনের প্রভাবে কর্পাস লুটিয়াম রক্ষিত হয়। প্রাথমিক দশায় লুটিয়াম এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন উৎপন্ন করে যা ভ্রূণের সংস্থাপনে অত্যাবশ্যক। পরে অমরা নিজেই তা যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করতে পারে। তাছাড়া অমরা রিলাক্সিন হরমোনের ক্ষরণ ঘটিয়ে শ্রোণীবন্ধনীর শিথিলতা ও জরায়ু কণ্ঠের প্রসারতা বাড়িয়ে দিয়ে প্রসব ঝামেলা মুক্ত করতে সাহায্য করে।

মানুষের অমরার পরিস্ফুটন

একটি মানব ভ্রূণ ব্লাস্টোসিস্ট দশায় ধীরে ধীরে জরায়ু—প্রাচীরে সংযোগ স্থাপন করে। সংযোগস্থলে ট্রফোব্লাস্ট নিঃসৃত উৎসেচকের প্রভাবে জরায়ু—প্রাচীরের আবরণী কলা বিগলিত হলে সেখানে ব্লাস্টোসিস্ট নিমজ্জিত হয়। এর নিচে থাকে যোজক কলান্তর। নিষেকের নয়দিন পর এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তখন ছিন্ন জরায়ু-প্রাচীর আবার নতুন করে সৃষ্টি হয়ে সংস্থাপিত ব্লাস্টোসিস্টকে ঢেকে

দেয়। এরপর ট্রফোব্লাস্ট স্তরের এপিথেলীয় কোষের বিভক্তির ফলে তা স্থূল হয়ে উঠে এবং জরায়ু-প্রাচীরের আরও গভীরে ভিলাই প্রেরণ করে। ট্রফোব্লাস্ট তখন দুটি স্তরে বিভেদিত হয়। একেবারে বাইরের দিকে অবস্থিত অংশের কোষগুলো তাদের সীমানা হারিয়ে একটি সিনসিসিয়াম গঠন করে। এই অংশকে সিনসিসিও-ট্রফোব্লাস্ট (syncytio-trophoblast) বলে। অন্যদিকে ট্রফোব্লাস্টের গভীরে অর্থাৎ ভ্রূণ সংলগ্ন অংশে কোষের সীমানা অক্ষুণ্ন থাকে। একে সাইটো-ট্রফোব্লাস্ট (Cyto-tropoblast) বলে। সিনসিসিও-ট্রফোব্লাস্ট হচ্ছে জরায়ু-প্রাচীরে ভ্রূণের প্রবেশ কলা। এর বৃদ্ধির কারণ সাইটো-ট্রফোব্লাস্টের বিভেদন এবং সিনসিসীয় নিউক্লিয়াইয়ের অ্যামাইটোটিক বিভক্তি। জরায়ু-প্রাচীরে অনুপ্রবেশের সময় সিনসিসিও-ট্রফোব্লাস্ট স্তরের মধ্যে অসংখ্য অনিয়ত গহ্বর সৃষ্টি হয়। এদের ট্রফোব্লাস্টিক ল্যাকুনি (trophoblastic lacunae) বলে। এগুলো ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের দশ থেকে তের দিনের মাথায় সৃষ্টি হয়। এসময় পর্যন্ত ট্রফোব্লাস্ট থেকে কোন সুস্পষ্ট ভিলাই সৃষ্টি হয় না বলে একে প্রাকভিলাস পর্যায় (previllous state) নামেও অভিহিত করা যায়।

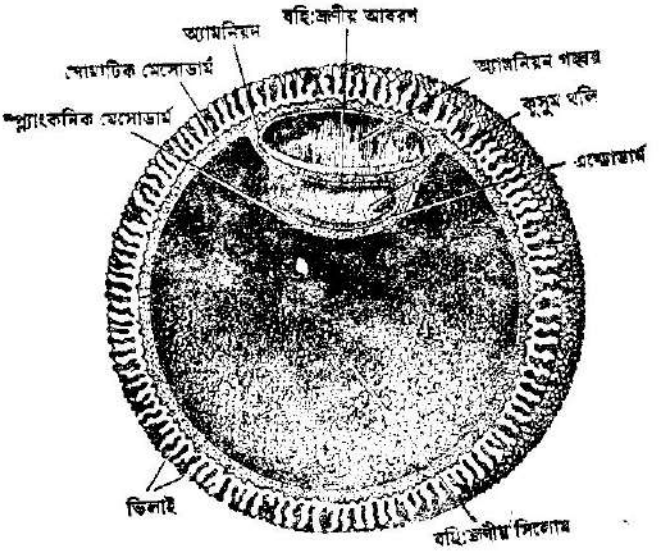

চিত্র ৬৭ : ১৪–১৫ দিনের একটি ভ্রূণসহ মানব ব্লাস্টোসিস্ট (Huettner, ১৯৪৯ অনুসরণে)।

ট্রফোব্লাস্টের সমগ্র পিণ্ড যখন বড় হয় এবং ভ্রূণীয় প্রাচীরের আরও গভীরে প্রবেশ করে তখন সে ছোট ছোট কৈশিক নালিকার সংস্পর্শে আসে। একসময় ট্রফোব্লাস্ট যেমন করে জরায়ু-প্রাচীর ধ্বংস করেছিল এখনও ঠিক তেমনভাবে কৈশিক-নালিকার এণ্ডোথেলিয়ামও ভেঙে ফেলে। এর ফলে কৈশিক-নালিকার গহ্বর এবং ট্রফোব্লাস্টিক ল্যাকুনির মধ্যে এক সংযোগ স্থাপিত হয়। ল্যাকুনিতে রক্ত প্রবাহিত হয় এবং এভাবে রক্তে উপস্থিত পুষ্টিদ্রব্য ভ্রূণকলায় গিয়ে পৌঁছায়। ল্যাকুনির সাথে যখন ধমনী ও শিরার শাখা-প্রশাখার সংযোগ স্থাপিত হয় তখন বিশুদ্ধ রক্ত ল্যাকুনিতে প্রবেশ করে আর জরায়ুর শিরায় বাহিত হয়ে সেস্থান ত্যাগ করে।

ভ্রূণ দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষদিকে পা দেওয়ার সাথে সাথে ট্রফোব্লাস্ট থেকে থেকে ভিলাইয়ের প্রবর্ধন বের হতে শুরু করে (চিত্র ৬৬)। ভিলাই তখন শুধু এপিথেলিয়ামে নির্মিত হয়, এতে যোজক কলার কোন মজ্জা থাকে না। তাই এদের আদি বা প্রাথমিক ভিলাই বলে। এ অবস্থা ক্ষণস্থায়ী। তৃতীয় সপ্তাহের

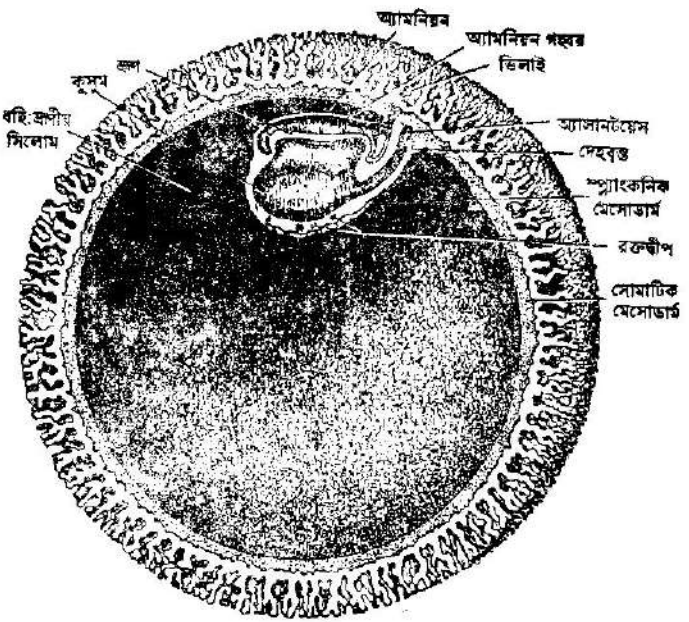

চিত্র ৬৮ : ২০-২২ দিনের ভ্রূণসহ মানব ব্লাস্টোসিস্ট (Huettner, ১৯৪৯ অনুসরণে)।

শুরুতেই মেসোডার্ম প্রাথমিক ভিলাইয়ের এপিথেলিয়ামের মাঝখানে জায়গা করে নেয়। মেসোডার্ম থেকে নমনীয় যোজক কলার সৃষ্টি হলে তখন সম্পূর্ণ গঠনকে গৌণ ভিলাই বলে। প্রত্যেকটি ভিলাসের যোজক কলায় অন্তর্দ্রুত রক্ত-বাহিকা আবির্ভূত হয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করতে শুরু করে। আবরণী কলায় আবৃত ও রক্ত-বাহিকাসমৃদ্ধ যোজক কলার মজ্জাসহ ভিলাইকে প্রকৃত বা টারসিয়ারী ভিলাই বলে। তৃতীয় সপ্তাহ শেষ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এদের নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে যায়। গর্ভকালীন বাকি সময় ভিলাইয়ের আর তেমন কোন পরিবর্তন হয় না, শুধু যোজককলা ও রক্ত-বাহিকাগুলো আরও সুগঠিত হয়।

অধিকাংশ ভিলাই ল্যাকুনির ফাঁকে মুক্তভাবে শেষ হলেও কিছু ভিলাই মাতৃকলা পর্যন্ত পৌঁছে সমগ্র ভ্রূণকে জরায়ু-প্রাচীরের সাথে সংবদ্ধ করে রাখার কাজে নিয়োজিত থাকে। জরায়ু-প্রাচীরও এজন্য সংস্থাপনপূর্ব অবস্থার চেয়ে বেশি রক্ত-বাহিকাসমৃদ্ধ ও স্থূল হয়। প্রথমে ব্লাস্টোসিস্টের চারদিক থেকেই ভিলাই সৃষ্টি হয়

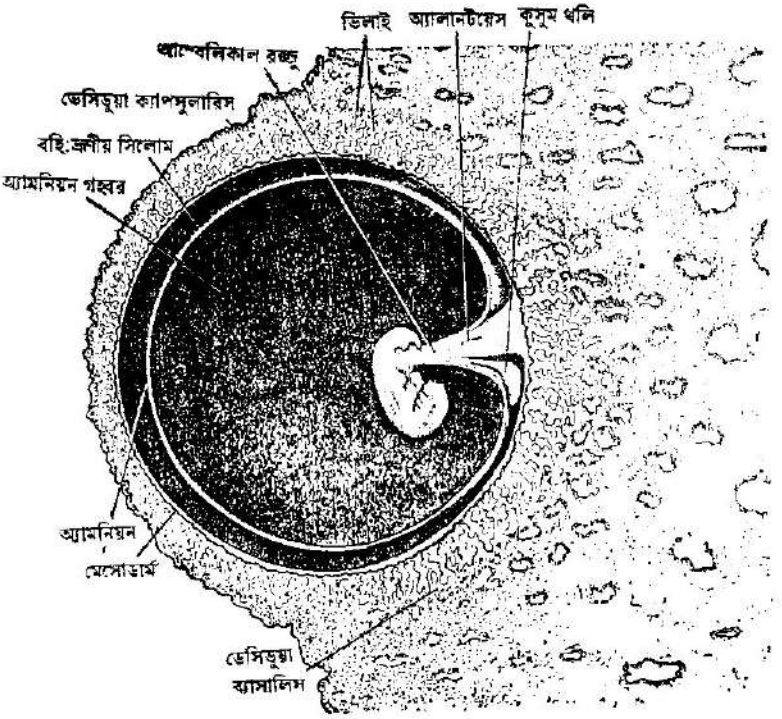

চিত্র ৬৯ : ৩৩ দিনের ভ্রূণসহ একটি মানব ব্লাস্টোসিস্ট (Huettner, ১৯৪৯ অনুসরণে)

(চিত্র ৬৭ ; চিত্র ৬৮)। ভিলাইয়ের কর্মক্ষমতা নির্ভর করে মায়ের দিক থেকে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহের উপর। ভ্রূণ যখন তার গহ্বর ও ঝিল্লীগুলোসহ বড় হয় তখন রক্ত সরবরাহের বন্টন আর সুষম থাকে না। ব্লাস্টোসিস্টের যে অংশ জরায়ু-প্রাচীরের দিকে থাকে সে অংশ বেশি রক্ত পায়। তাই এদিকের ভিলাই ও জরায়ু প্রাচীর সুগঠিত হয় এবং প্রকৃত কার্যক্ষম অমরা গঠন করে (চিত্র ৬৯)। ব্লাস্টোসিস্টের যে অংশ জরায়ু গহ্বরের দিকে মুখ করা থাকে তাতে রক্তের স্বল্পতার জন্য ভিলাই ছোট হয়ে অবশেষে অদৃশ্য হয়ে যায়।

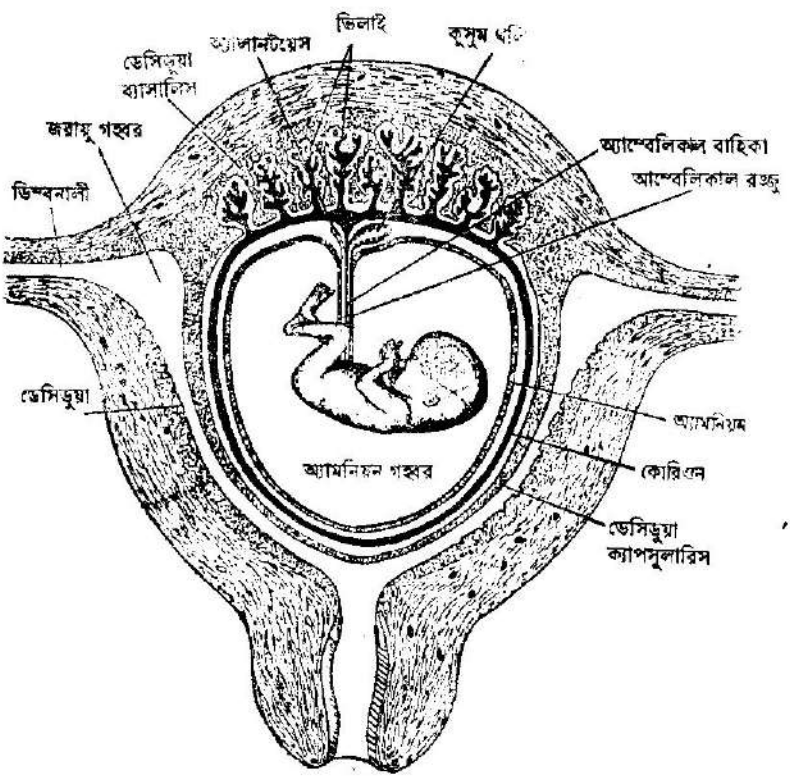

চিত্র ৭০ : ফিটাল ঝিল্লীসহ একটি মানব জরায়ু এবং জরায়ু ও ভ্রূণের সাথে তাদের সম্পর্ক (Huettner, ১৯৪৯ অনুসরণে)।

তথ্যপঞ্জি

১. Adler, L. 1914. Metamorphoses studien an Batrachierlarven. Roux Arch. 39, 21-45.

২. Allen, B. M. 1918. The results of thyroid removal in larvae of ***Rana pipiens***. J. Exp. Zool. 24, 499–519.

৩. Balinsky, B. I 1950. On the developmental processes in mammary glands and other epidermal structures. Trans. R Soc. Edinb. 62, 1–31.

৪. Balinsky. B. I. 1970. An Introduction to Embryology (3rd ed.) W. B. Saunders Company, West Washington Square, Philadelphia, Pa. 1905.

৫. Balinsky, B. I. 1981. An Introduction to Embryology. (5th ed.) W. B. Saunders Company, West Washington Square, Philadelphia, Pa. 1905.

৬. Ballard, W. W. 1955. Cortical ingression during cleavage of amphibian eggs, studied by means of vital dyes. Jour. Exp. Zool. GXXIX.

৭. Bodemer, C. W. 1968. Modern Embryology. Holt, Reinhart and Winston, Inc. New York, Chicago.

৮. Brachet. J. 1950b. Chemical Embryology. Interscience Publishers. New York.

৯. Brunst. V. V. 1950. Influence of X-rays on limb regeneration in urodele amphibans. &. Rev. Biol. 25, 1–29.

১০. Bryant, S. V. and Bellairs, A. D. 1967. Tail regeneretion in the lizards, ***Auguis fragils*** and ***Lacerta dugesii***. J. Linn. Soc (Zool). 46, 297-305.

১১. Conklin, E. G. 1932. The Embryology of ***Amphioxus***. J. Morph, 54, 69-118.

১২. Conrad, R. M. and Sott, H. M. 1938. The formation of the Egg of the domestic fowl. Physiol. Rev. XVIII.

১৩. Eyal–Giladi, H. and Kochav, S. 1976. From cleavage to primitive streak formation : a complementary normal table and new look at first stagess of the development of the Chick. Devl. Biol. 49, 321-337.

১৪. Freeman, W. H. and Brercegirdle, B. 1978. An Atlas of Embryology. Heinmann Educational Books Ltd., 48 Charles Street, London, XIX 8AH.

১৫. Galtsoff, P. S. 1925. Regeneration after dissociation (an experimental study on sponges). I. Behaviour of dissociated cells of ***Microciona prolifera*** under normal and altered conditions. J. Exp. Zool. 42, 183-255.

১৬. Gerald, P. S. 1961. Thd abnormal haemoglobins. In : Penrose, L. A. (Ed.) : Recent advances in human genetics. J. and A. Churchill. Ltd. London.

১৭. Ginsberg, A. 1957. Monospermy in sturgeon in normal fertilization and the consequences of penetration into the egg of supernumerary spermatozoa. Dokl. Acad. Nauk. S. S. S. 144. 445.

১৮. Ginsberg, 1961. The block to polyspermy in sturgeon end trout with special reference to the role of cortical granules (alveoli) J. Embryol. Exp. Morphol. 9, 173.

১৯. Gudernatsch, F. 1912. Feeding experiments on tadpoles. Roux Arch. 35, 457-483.

২০. Gurdon, J. B. and Graham, C. F. and 1967. Nuclear changes during cell differentiation. Sci. Prog. Oxf. 55, 259–277.

২১. Helff, O. M. 1928. Studies on amphibian metamorphosis. III. Physiol. Zool 1, 463-495.

২২. Huettner, A. F. 1949. Fundamentals of Embryology of the Vertebrates. Macmillan Publishing Co. Inc. New York.

২৩. Huxley, J. S. 1932. Problems of relative growth. Methuen and Co. London.

২৪. Hyman, L. H. 1951. The Invertebrates. Vol. 3. Mc Graw–Hill, New York.

২৫. কবির, সৈয়দ মোহাম্মদ হুমায়ুন। ১৯৮৯। সাধারণ প্রাণিবিদ্যা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ।

২৬. Katagiri, C. 1966. Fertilization of dejelled uterine toad eggs in various experimental conditions. Embryologia 9, 159-169.

২৭. Katagiri, C. 1974. A high Frequency of fertilization in premature and mature coelomic toad eggs after enzymic removal of vitelline membrane. J. Embryol. Exp. Morph. 31, 573–587.

২৮. Kotpal, R. L. 1989. Modern Textbook of Zoology. Rastogi Publications, Shivaji Road, Meerut–250002, India.

২৯. Lash, J. and Whittaker, J. R. (ed.) 1974. Concepts of Development. Sinauer Associates Inc. Publishers, Stamford, Connecticut, Conn. 06905.

৩০. Lillie, F. R. 1919a. Problems of Fertilization. University of Chicago Press, Chicago.

৩১. McEwen, R. S. 1969. Vertebrate Embryology. Holt. Reinhart and Winston Inc., New York, U. S. A.

৩২. Needham, J. 1942. Biochemistry and Morphogenesis. University Press, Cambridge.

৩৩. Nicholas, J. S. 1926. Expiration experiments upon the embryonic forelimb of the rat. Proc. Soc. Exp. Biol Med. 23. 446-439.

৩৪. Nicolet, G. 1970a. Analyse autoradiographique de la localisation des defferentes ebauches presomptives dans la ligue primitive de l'embryon de poulet. J. Embryol. Exp. Morph. 23, 79-108.

৩৫. Olsen, M. W. 1942. Maturation, Fertilization and early cleavage in the hen's egg. Jour. Morph., LXX.

৩৬. Orechowitsch, W. N. and Bromley, N W. 1934. Die histolysierenden Eigenschaften des Regenerationblastems Bial. Zbl. 54, 524-535.

৩৭. Patten, B. M. 1958. Foundations of Embryology. McGraw-Hill, New York.

৩৮. Rosenquist, G. C. 1966. A radioautographic study of labeled grafts in the chick blastoderm. Development from primitive–streak stages to stage 12. Countr. Embryol. Carneg. Instn. 38, 71–110.

৩৯. Rugh, R. 1937. Release of spermatozoa by anterior pituitary treatment of the male frog, ***Rana pipiens***. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med. XXXVI.

৪০. Runnstrom, J., Hagstrom, B. E., and Perlman, P. 1959. Fertilization. In : Brachet, J. and Mirsky, A. E. The Cell. Vol. I. Academic Press, London and New York, 327-397.

৪১. Rustad, R. C., Yuyama, S., and Rustad, L. C. 1970. Nuclear-cytoplasmic relations in the mitosis of see-urchin eggs. II. The division times of whole eggs and haploid and diploid half eggs. Biol. Bull. 138, 184-193.

৪২. Saxena, O. P. 1981. Modern Textbook of Mammalia. S. Chand and Company Ltd. Ram Nagar, New Delhi–110055, India.

৪৩. Schectman, A. M. 1934. Unipolar ingression in ***Triturus*** : A hitherto Undescribed movement in the pregastrular stages of a urodele. univ. Cal. Press. XXXIX.

৪৪. Schindler, A. M. and Mikamo, K. 1970. Triploidy in man. Report of a case and a discussion on etiology. Cytogenetics. 9. 116.

৪৫. Schwind, J. 1933. Tissue Specificity at the time of metamorphosis in frog larvae. J. Exp. Zool. 66, 1-14.

৪৬. Spemann, H. 1931. Ueber den Anteil Von Implantat und Wirstkeinan der Orientierung und Beschaffenheit der induzierten Embryonalanlage. Roux Arch, 123, 389-517.

৪৭. Spemann, H. 1938. Embryonic development and induction. Yale University Press. New Haven.

৪৮. Spemann, H. and Schotte, O. 1932. Ueber xenoplastische Transplantation als Mittel zur Analyse der embryonalen Induction. Naturwissenschaften. 20, 463-467.

৪৯. Spiegelman, S. 1948. Differentiation as the controlled production of unique enzymatic patterns. Symp. Soc. exp. Biol. 2, 286-325.

৫০. Spratt, N. T. Jr., 1946. Formation of the primitive streak in the explanted chick blastoderm marked with carbon particles. J. exp. Zool. 103, 259–304.

৫১. Taylor, A.; Monroy, A.; and Metz, C. B. 1956. Fertilization of fertilized sea–urchin eggs. Biol. Bull. 110, 184.

৫২. Trinkaus, J. P. 1969. Cells into organs. The forces that shape the embryo. Prentice–Hall, Englewood Cliffs, N. J.

৫৩. Trinkaus, J P. 1976. On the mechanism of metazoan cell movements. In Poste, G., and Nicolson, G. L. (Ed.) : The cell surface in animal embryogenesis and development. Elsevier/North Holland Press, Amsterdam, New York. Oxford. 225–326.

৫৪. Verma, P. S.; Agarwal, V. K. : and Tyagi, B. S. 1980. Chordate Embryology. S. Chand and Company Ltd. Ram Nagar, New Delhi-110055, India.

৫৫. Vogt, W. 1925 Gestetltungsanalyse am Amphibienkeim mit ortlicher Vitalforbung. Vormort uber Wege und Ziele. I. Methodik und Wirkingsweise der ortlichen Vitalforbung mit Agar als Forbtrager. Roux Arch. 106, 542-610.

৫৬. Weiss, P. 1939. Principles of development. Henry Holt, New York.

৫৭. Wilson, H. V. 1907. On some phenomena of coalescence and regeneration in sponges J. Exp. Zool. 5. 245--258.

পরিভাষা

(ইংরেজি-বাংলা)

A	
abiotic	অজীবী
accessory	সহায়ক, অতিরিক্ত
accretionary	উপচয়ীয়
anabolism	উপচিতি
animalcule	অণুপ্রাণী
animalculist	অণুপ্রাণিবিদ
animal pole	প্রাণী মেরু
appendage	উপাঙ্গ, প্রত্যঙ্গ
aquatic	জলচর
asexual	অযৌন
autotomy	স্বচ্ছেদ
B	
basophilic	ক্ষার-আকর্ষী
bidiscoidal	দ্বি-চক্রীয়
biological	জৈবনিক
biotic	জীবীয়
bone	অস্থি
brood sac	শাবক থলে
bud	কুঁড়ি
C	
carnivorous	মাংসাশী
cartilage	উপাস্থি
catabolism	অপচিতি
cell	কোষ
cell mass	কোষপিণ্ড
cell theory	কোষ মতবাদ
cleavage furrow	ক্লিভেজ ফাটল
conjugated	সংযুক্ত
contractile	সংকোচী
copulation path	মিলন পথ
cytology	কোষবিদ্যা
D	
deciduous	পাতী
degrowth	অবৃদ্ধি
denatured	স্বভাবচ্যুত
determinants	নির্ধারক
developing	বৃদ্ধিশীল, বর্ধণশীল
development	পরিস্ফুটন
dextral	ডানাবর্তী
differentiation	বিভেদন
diffused	পরিব্যাপ্ত
discoidal	চক্রীয়
distal	দূরের
E	
egg	ডিম্ব
embryo	ভ্রূণ
embryological	ভ্রূণতাত্ত্বিক, ভ্রূণতত্ত্বীয়
embryologist	ভ্রূণবিজ্ঞানী
embryology	ভ্রূণবিদ্যা
embryonic	ভ্রূণীয়
endocrine	অন্তঃক্ষরা
entrance cone	প্রবেশ কোণ
entrance path	প্রবেশ পথ
equatorial	নিরক্ষীয়
evolution	বিবর্তন

F

factor	উপাদান, নিয়ামক
fate map	ভাগ্য-মানচিত্র
fertilization	নিষেক
fertilized	নিষিক্ত
fibre	তন্তু
filament	সূত্র
flagellated	ফ্ল্যাজেলীয়
fold	ভাঁজ
fusion	একীভবন

G

gametogenesis	জননকোষ সৃষ্টি
gaseous	গ্যাসীয়
genetics	জীনতত্ত্ব
germ cell	জনন কোষ
germ layer	ভ্রূণীয় স্তর
germ wall	ভ্রূণীয় প্রাচীর
gill	ফুলকা
gland	গ্রন্থি
gonad	জননাঙ্গ
gradient	বিভেদ হার
groove	খাদ, খাত
growth	বৃদ্ধি

H

heart	হৃৎপিণ্ড
hemisphere	অর্ধগোলক
hindgut	পশ্চাদান্ত্র
histological	কলাতাত্ত্বিক
homologous	সমসংস্থ
homunculus	ক্ষুদে মানব
horizontal	অনুভূমিক

I

implantation	সংস্থাপন
inoculation	টা দেয়া
induced	আবেশিত
induction	আবেশন
inductor	আবেশক
infiltration	অন্তর্ছাঁকন
ionic	আয়নীয়
insect	পতঙ্গ
integument	ত্বক

J

jaw	চোয়াল
journal	গবেষণা পত্রিকা

K

kidney	বৃক্ক
knob	গুটি
knot	গাঁইট

L

lattitudinal	অনুভূমিক
lip	ওষ্ঠ, ঠোঁট
liver	যকৃত
lock and key	তালা-চাবি
lytic	বিশ্লেষী

M

mammal	স্তন্যপায়ী
maturation	পূর্ণতা
mechanics	বলবিদ্যা
membrane	ঝিল্লী, পর্দা, আবরণী
meridional	মধ্যরেখীয়
metabolic	বিপাকীয়
metabolism	বিপাক
metamorphosis	রূপান্তর
midgut	মধ্যান্ত্র
migration	পরিযাত্রা, অভিবাসন
morphological	অঙ্গসংস্থানিক

multicelluler	বহুকোষী
multiplicative	গুণাত্মক

N

nervous	স্নায়বিক
node	পর্ব
non-chordate	অকর্ডেট
non-deciduous	অপাতী
non-flagellated	অ-ফ্লাজেলীয়

O

ontogenic	ব্যক্তিজনিক
organ	অঙ্গ
organ system	অঙ্গতন্ত্র
organic	জৈব
organizer	সংগঠক
organogenesis	অঙ্গসৃষ্টি
ovary	ডিম্বাশয়
overgrowth	উপবৃদ্ধি
ovigerous	ডিম্বাশয়িক
ovotestes	ডিম্বশুক্রাশয়
ovulation	ডিম্বপাত
ovulist	ডিম্বাণুবিদ
ovum	ডিম্বাণু

P

paired	জোড়
papillae	পিড়ক
parasite	পরজীবী
parthenogenesis	অপুংজনি
pathological	ব্যাধিজ
pattern	নকশা
permeability	ভেদ্যতা
pharyngeal	গলবিলীয়
pharynx	গলবিল
phylogenetic	জাতিজনিক
physiological	শারীরবৃত্তীয়
pigment	রঞ্জক
pit	গর্ত
placenta	অমরা
placental	অমরাজনিত
plane	তল
plexus	জালিকা
polar	মেরু
polarity	মেরুত্ব
pouch	থলে
polyspermy	বহুশুক্রাণুজ
preformation	প্রাকগঠন
prefunctional	প্রাককার্যকর
prelocalization	প্রাকস্থিতিকরণ
primary	মুখ্য, প্রাথমিক
primordial	আদি
progressive	প্রগতিশীল, অগ্রগামী
proximal	কাছের

R

radial	অরীয়
recapitulation	পুনরাবৃত্তি
reconstitution	পুনর্গঠন
redifferentiation	পুনর্বিভেদন
regeneration	পুনরুৎপত্তি
regressive	পশ্চাদগামী
reparative	ক্ষতিপূরণীয়
reproduction	জনন, প্রজনন
reptile	সরিসৃপ
reversible	উল্টোকরণ
respiration	শ্বসন
rhythm	ছন্দ
rudiment	অংকুর

S

secondary	গৌণ, মাধ্যমিক
secretion	নিঃসরণ

septa	বাধবায়ক
sexual	যৌন
shell	খোলক
sinistral	বামাবর্তী
skeleton	কঙ্কাল
somatic cell	দেহ কোষ
somite	খণ্ড
species	প্রজাতি
sperm	শুক্রাণু
spermatozoon	শুক্রাণু
spindle	মাকু
spiral	সর্পিল, প্যাঁচানো
stage	দশা, ধাপ, পর্যায়
stalk	বৃন্ত
structure	গঠন
superficial	উপরিগত
supporting	অবলম্বী
symmetrical	প্রতিসম
symmetry	প্রতিসমতা

T

tadpole	ব্যাঙাচি
teeth	দাঁত
testis	শুক্রাশয়
tissue	কলা
triploblastic	ত্রিস্তরী
tympanic membrane	কর্ণপটহ

U

uterus	জরায়ু

V

vegetal pole	ভেজিটাল মেরু
vertical	অনুলম্ব, খাড়া

X

x-ray	রঞ্জন রশ্মি

Y

yolk	কুসুম
yolk-sac	কুসুম-থলে

Z

zonary	বলয়িত
zone	অঞ্চল

পরিভাষা

(বাংলা-ইংরেজি)

অ

অকর্ডেট	nonchordate
অগ্রগামী	progressive
অংকুর	rudiment
অঙ্গ	organ
অঙ্গতন্ত্র	organ system
অঙ্গসৃষ্টি	organogenesis
অঙ্গসংস্থানিক	morphological
অজৈব	organic
অণুপ্রাণী	animalcule
অণুপ্রাণিবিদ	animalculist
অতিরিক্ত	accessory
অনুলম্ব	vertical
অঞ্চল	zone
অন্তর্ছাকন	infiltration
অন্তঃক্ষরা	endocrine
অপাতী	nondeciduous
অপুংজনি	parthenogenesis
অপচিতি	catabolism
অফ্ল্যাজেলীয়	non-flagellated
অবলম্বী	supporting
অবৃদ্ধি	degrowth
অভিবাসন	migration
অমরা	placenta
অমরাজনিত	placental
অমেরুদণ্ডী	invertebrate
অযৌন	asexual
অরীয়	radial
অর্ধগোলক	hemisphere

আ

আদি	primordial
আনুভূমিক	horizontal, lattitudinal
আবেশক	inductor
আবেশন	induction
আবেশিত	induced
আয়নীয়	ionic

উ

উপবৃদ্ধি	overgrowth
উপচিতি	anabolism
উপরিগত	superficial
উল্পেপীয়	accretionary
উপাঙ্গ	appendage
উপাদান	factor
উপাস্থি	cartilage
উলটাক্ষম	reversible

এ

একীভবন	fusion

ক

কংকাল	skeleton
কর্ণপটহ	tympanic membrane
কলা	tissue
কলাতাত্ত্বিক	histological
কাছের	proximal
কোষ	cell
কোষপিণ্ড	cell mass
কোষবিজ্ঞানী	cytologist
কোষবিদ্যা	cytology

কোষ মতবাদ	cell theory
কুসুম	yolk
কুসুম থলে	yolk sac
কুঁড়ি	bud
খ	
খণ্ড	somite
খাত, খাদ	groove
খাড়া	vertical
খোলক	shell
গ	
গঠন	structure
গবেষণা পত্রিকা	jornal
গর্ত	pit
গলবিল	pharynx
গলবিলীয়	pharyngeal
গাঁইট	knot
গুটি	knob
গুণাত্মক	multiplicative
গৌণ, মাধ্যমিক	secondary
গ্যাসীয়	gaseous
গ্রন্থি	gland
চ	
চক্রাকার	discoidal
চোয়াল	jaw
ছ	
ছন্দ	rhythm
জ	
জনন	reproduction
জননকোষ	germ cell
জননকোষ সৃষ্টি	gametogenesis
জননাঙ্গ	gonad
জরায়ু	uterus
জলচর	aquatic
জালিকা	plexus
জীনতত্ত্ব	genetics
জৈব	organic
জৈবনিক	biological
ঝ	
ঝিল্লী	membrane
ড	
ডানাবর্তী	dextral
ডিম্ব, ডিম্বাণু	egg
ডিম্বাণু	ovum
ডিম্বাণুবিদ	ovulist
ডিম্বপাত	ovulation
ডিম্বাশয়	ovary
ডিম্বাশয়িক	ovigerous
ডিম্বশুক্রাশয়	ovotestes
ত	
তল	plane
ত্বক	integument
তা' দেয়া	incubation
তালা-চাবি	lock and key
ত্রিস্তরী	triploblastic
থ	
থলে	pouch
দ	
দশা	stage
দাঁত	teeth
দ্বিচক্রীয়	bidiscoidal
দূরের	distal
দেহকোষ	somatic cell

ধ	
ধাপ	stage
ন	
নিয়ামক	factor
নিরক্ষীয়	equatorial
নির্ধারক	determinants
নিষিক্ত	fertilized
নিষেক	fertilization
নিঃসরণ	secretion
প	
পতঙ্গ	insect
পরজীবী	parasite
পর্ব	node
পর্যায়	stage
পশ্চাদ্‌গামী	regressive
পশ্চান্ত্র	hindgut
পরিত্যক্ত	diffused
পরিব্রাজ	migration
পরিস্ফুটন	development
পাতী	deciduous
পিড়ক	papillae
পুনর্গঠন	reconstitution
পুনরুৎপত্তি	regeneration
পুনর্বিভেদন	redifferentiation
পূর্ণতা	maturation
প্যাঁচানো	spiral
প্রতিসম	symmetrical
প্রতিসমতা	symmetry
প্রজনন	reproduction
প্রবেশ কোণ	entrance cone
প্রবেশ পথ	entrance path
প্রত্যঙ্গ	appendage
প্রাক্‌কার্য	prefunctionate
প্রাক্‌সৃষ্টি	preformation
প্রাক্‌স্থি	prelocalization
প্রাথমিক	primary
প্রাণী মেরু	animal pole
ফ	
ফুলকা	gill
ফ্লাজেলীয়	flagellated
ব	
বলবিদ্যা	mechanics
বলয়িত	zonary
বহুকোষী	multicellular
বহুশুক্রাণুজ	polyspermy
বামাবর্তী	sinistral
বিপাক	metabolism
বিপাকীয়	metabolic
বিবর্তন	evolution
বিভেদ হার	gradient
বিভেদন	differentiation
বিশ্লেষী, বিশ্লিষ্টকারী	lytic
বীজপত্রিক	cotyledonary
বৃক্ক	kidney
বৃদ্ধি	growth
বৃদ্ধিশীল, বর্ধনশীল	developing
বৃন্ত	stalk
ব্যক্তিজনি	ontogenic
ব্যাঙাচি	tadpole
ব্যবধায়ক	septa
ব্যাধিজ	pathological
ভ	
ভাগ্য-মানচিত্র	fate map
ভাঁজ	fold
ভ্রূণ	embryo
ভ্রূণতত্ত্বীয়	embryological
ভ্রূণবিদ্যা	embryology
ভ্রূণবিজ্ঞানী	embryologist

ভ্রূণীয়	embryonic
ভ্রূণীয় স্তর	germ layer
ভেজিটাল মেরু	vegetal pole
ভেদ্যতা	permeability
ম	
মধ্যান্ত্র	midgut
মধ্যরেখীয়	meridional
মেরু	spindle
মাংসাশী	carnivorous
মিলন পথ	copulation path
মুখ্য	primary
মেরুত্ব	polarity
য	
যকৃৎ	liver
র	
রঞ্জক	pigment
রঞ্জন রশ্মি	X-ray
রূপান্তর	metamorphosis
শ	
শাবক থলে	brood pouch
শারীরবৃত্তীয়	physiological
শুক্রাণু	sperm, spermatozoon
শুক্রাশয়	testis
শ্বসন	respiration
স	
সংকোচী	contractile
সংগঠক	organizer
সংযুক্ত	conjugated
সংশ্লেষ	synthesis
সংস্থাপন	implantation
সমসংস্থ	homologous
সরীসৃপ	reptile
সর্পিল	spiral
সহায়ক	accessory
সূত্র	filament
স্তন্যপায়ী	mammal
স্নায়বিক	nervous
স্বচ্ছেদ	autotomy
স্বাদচ্যুত	denatured
হ	
হৃৎপিণ্ড	heart
ক্ষ	
ক্ষতপূরণীয়	reparative
ক্ষারাকর্ষী	basophilic
ক্ষুদে মানব	homunculus